শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব ॥

বা

সাধন-রহস্য ॥

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।

এড্‌ভোকেট্(Advocate)

প্রকাশক

শ্রীবটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গরলগাছা—গ্রাম,

চণ্ডীতলা—পোঃ আঃ

জেলা—হুগলী।

সন ১৩৪২ সাল

ডাক মাশুল তন্ত্র।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক

শ্রীবটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,

গরলগাছা—গ্রাম,

চণ্ডীতলা—পোঃ,

জেলা—হুগলী।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,

প্রিণ্টার—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়,

৭১।১, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ—পত্র।

ওঁ হ্রীং নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥

মহামায়া!

তোমার করুণার ফল-স্বরূপ, তোমার **"শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব"** (প্রথম খণ্ড) তোমারই অভয় পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত হইলাম। মা! জগৎজননি! প্রসন্না হও মা! তোমার শ্রীচরণে, তোমারই দান,—এই গ্রন্থ—সন্তর্পণে রাখিয়া, তোমার শ্রীচরণ ধারণ করিয়া আমি তোমারই মুখের দিকে তাকাইয়া আছি মা! গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজার মত, তোমারই দান-সামগ্রী দিয়া তোমারই পূজা করিতেছি মা!

দেবি! তোমার অকৃতী সন্তানের অন্তরের পূজা ও প্রণাম গ্রহণ কর মা!

ওঁ শরণাগত দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি! নারায়ণি! নমোঽস্তুতে ॥

শুভ ১লা বৈশাখ সন ১৩৪২ সাল
কলিকাতা।

প্রণত শরণাগত সন্তান
গ্রন্থকার।

ওঁ হ্রীং নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥

ভূমিকা

মহামায়ার অহেতুকী কৃপায় "শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব" গ্রন্থের 'প্রথম খণ্ড' প্রকাশিত হইল। বহুকালের সাধনা ও আশা এতদিনে ফলবতী হইল। ব্রহ্মময়ী মা এতদিনে ব্যাখ্যারূপে আত্ম-প্রকাশ করিলেন! স্বপ্নে দেবীর দর্শন-দান ও আদেশ,—সত্যে পরিণত হইয়া সার্থক হইল!

এই প্রথম খণ্ডে দেবী-মাহাত্ম্যের "দেবীসূক্ত" ও "অর্গলা-স্তোত্র" বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইল। যে ভাব লইয়া শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ ও আলোচনা করিলে, ভক্ত তত্ত্বতঃ মহামায়াকে বুঝিতে পারিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারে, করুণাময়ী মা আমার, আমাকে উপলক্ষ করিয়া. সেই ভাব—সেই রহস্য—এই ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। মাতৃ-তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক সাধক মাত্রেই এই গ্রন্থ পড়িয়া মনে পরমাশান্তি পাইবেন ও হৃদয়ে জ্ঞানের পবিত্র আলোক—সম্পাত অনুভব করিতে পারিবেন। যেহেতু তত্ত্ব-জ্ঞান হইতেই দিব্য দর্শন ও মুক্তিলাভ হয়।

এইবার আমরা মাতৃ-কৃপায় 'দ্বিতীয় খণ্ড' প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। সেই গ্রন্থে—"কীলক স্তব", "দেবী-কবচ", ও শ্রীশ্রীচণ্ডীর 'মধুকৈটভ-বধ' পর্য্যন্ত—সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বপূর্ণ বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইবে। এইরূপে খণ্ডে খণ্ডে, আমরা সমগ্র দেবী-মাহাত্ম্যের রহস্য-প্রকাশিকা বিশদ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দেবী-কৃপায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

এই ব্যাখ্যা-গ্রন্থের একটা ইতিহাস আছে। প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে, বৈশাখ মাসের দারুণ গ্রীষ্মে, কলিকাতা-সহরে একদিন ঠিক মধ্যাহ্নকালে, হঠাৎ কোর্টে কাজ করিতে করিতে আমার সর্দ্দিগর্ম্মি হয়। আমি ছয় ঘণ্টাকাল মৃতবৎ পড়িয়া থাকি। জীবনের শেষ হইল ভাবিয়া অজ্ঞানমত অবস্থায় ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতে থাকি। দৈবী কৃপায় সেই সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করি। কিন্তু চিকিৎসকদিগের সিদ্ধান্ত হয় যে এই প্রবল বায়ুরোগ সন্ন্যাসরোগের (Heat Appoplexy) পূর্ব্ব লক্ষণ এবং এই রোগের দ্বিতীয় আক্রমণ মারাত্মক হইবে। সমস্ত বৈষয়িক কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া, জীবনে হতাশ হইয়া এবং আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের নিকট চির-বিদায় লইয়া অবিমুক্ত বারানসী ধামে দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছায়, সস্ত্রীক ৺কাশীধাম যাত্রা করিলাম। সেখানে, মৃত্যু শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে, ইহা চিন্তা করিয়া নিত্য গঙ্গাস্নান ৺শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ, ৺শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবতা দর্শন, সাধু মহাত্মাদের দর্শন ও সঙ্গ, নানা প্রকারের তপস্যা, বেদ ও দর্শনশাস্ত্রাদির চর্চ্চা, মঠে মঠে সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গ ও সর্ব্বক্ষণ স্থায়ী সাত্ত্বিক ভাব—অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম। মৃত্যু-চিন্তা আমায় ক্রমশঃ ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন করিল। মৃত্যু দেবতা আমার বন্ধুর কাজ করিল—আমায় অমরত্ব-লাভ করিবার যোগ্যতা আনিয়া দিতে লাগিল। বেদের সেই প্রসিদ্ধ সত্য বাণী, আমার তখন মনে পড়িল—

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

শ্রুতিঃ।

(আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারাই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার অপর কোন পথ বা উপায় নাই।)

স্থান—মাহাত্ম্যে এবং দেবতা ও সাধু মহাত্মাগণের কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে আমার আত্ম-সাক্ষাৎকারের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। তদনুরূপ সাধনা ও তপস্যা চলিতে থাকে।

সে অনেক দিনের কথা। ১৯২৭ সালে বৈশাখ মাসে দার্জ্জিলিংএ আমি যাই। সেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ আমাকে সর্ব্বপ্রথম "শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব" সম্বন্ধে —একটী বক্তৃতা করিতে বলেন। স্বামীজীর অন্তর্দৃষ্টি থাকায় তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আমি তখন "গীতা ও চণ্ডীর"—সমন্বয় তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিলাম। আমার বক্তৃতা শুনিয়া স্বামীজী আমাকে খুব উৎসাহিত করেন। তাঁহার অনুরোধে আমি কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার স্থাপিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ—বেদান্ত সমিতিতে' নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে "শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব" আলোচনা প্রায় চারি বৎসর ধরিয়া করিয়াছিলাম ও তাঁহার "বিশ্ববাণী" নামক মাসিক পত্রিকাতে প্রবন্ধাকারে আমার দেবীসূক্তের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা 'শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। মায়ের মহিমা প্রচার হইবার পরই সাধারণের এই ব্যাখ্যা শুনিতে ও পড়িতে খুব আগ্রহ দেখা গিয়াছিল।

আজ তিন মাস পূর্ব্বে, আমি হুগলী জেলার গরলগাছা নামক গ্রামে, কার্য্যোপলক্ষে যাই। সেখানে মাতৃ-কৃপায়, মহাপ্রাণ ও সদাত্মা শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ "বিশ্ববাণী" পত্রিকায় প্রকাশিত "শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব" গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে বিশেষ আগ্রহ দেখান। তাঁহাদের চেষ্টায়, যত্নে ও সাহায্যে শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্বের এই প্রথম খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইঁহারা তিনজন মহাশয় ব্যক্তি আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। মহামায়া! ইঁহাদের প্রতি প্রসন্না হউন!

বেদের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার পূজ্যপাদ ভগবান সায়নাচার্য্যের টীকা, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতপ্রবর মহাত্মা শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী কৃত "তত্ত্ব-প্রকাশিকা" —টীকা, মহারাষ্ট্রদেশ প্রচলিত পরম জ্ঞানী নাগোজী ভট্ট কৃত টীকা, বঙ্গদেশ প্রচলিত প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মত প্রধান টীকা, দর্শন ও ভক্তি—শাস্ত্রের উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ সিদ্ধান্তী মত প্রধান টীকা, এবং আরও অনেক মহাপুরুষ ও পণ্ডিতদিগের কৃত টীকা—আমার অবলম্বন হইয়াছে এবং মহামায়া যে ভাবে এই সব গৌরবময় টীকার সার ও সমন্বয় তত্ত্ব আমার বুদ্ধিতে অবস্থিতা হইয়া, আমায় বুঝাইয়াছেন, আমি মায়ের প্রেরণার বশে, অবশ হইয়া, সেই সকল তত্ত্ব লিখিয়াছি মাত্র। মা আমার যন্ত্রী—আমি তাঁহার হস্তের যন্ত্র মাত্র। মহামায়ার নিজের মহিমার কথা, তিনি যেভাবে ভাল বুঝিয়াছেন, এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্য মায়ের গ্রন্থ মাকেই উৎসর্গ করিয়াছি। ত্রিভুবনে এই গ্রন্থ সমর্পণ করিবার মাতৃচরণ ছাড়া আর অন্য কোথায়ও স্থান নাই।

এই গ্রন্থ একটী প্রধান ভক্তিগ্রন্থ। আমার বিশ্বাস ইহার প্রচারে ঘরে ঘরে অমৃত ফলিবে। ভক্ত! মায়ের বাণী শুনিবে? এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া শোন, মায়ের মধুর বাণী, আকাশ-বাতাস ধ্বনিত করিয়া তোমার পবিত্র হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ!"

(হে বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ! তোমরা আমার মুক্তিপ্রদা বাণী শোন।)

ওঁ শান্তিঃ ওঁ।

শুভ ১লা বৈশাখ সন ১৩৪২ সাল
কলিকাতা।

মাতৃ-পাদপদ্ম-আশ্রিত
গ্রন্থকার

শ্রীশ্রীমহামায়া জয়তু

প্রকাশকের নিবেদন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর কৃপায় **শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব** (**প্রথম খণ্ড**) প্রকাশিত হইল।

লেখক—প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-বক্তা, পরম জ্ঞানী ও ভক্ত দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর, সাধক শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী—"শাস্ত্রী" "চণ্ডী-তত্ত্ব—বিনোদ" "এড্‌ভোকেট", (Advocate, High Court) (Retired)।

শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবী-মাহাত্ম্য গ্রন্থের, নূতন, মধুর, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, ও মৌলিক গবেষণাপূর্ণ অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এ যাবৎ বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ উচ্চাঙ্গের প্রাণস্পর্শী অথচ দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। এই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা বেদ-সম্মত ও ঋষিগণ-প্রদর্শিত; সর্ব্ব ধর্ম্ম- সমন্বয়-ভাব লক্ষ্য করিয়া, সাধনার অনুভূতির সহিত মিলাইয়া ও সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া, আবেগময়ী ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

এই প্রথম খণ্ডে সম্পূর্ণ "দেবী-সূক্তের" ও "অর্গলাস্তোত্রের" বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইল। দেবী-সূক্ত ঋগ্বেদের অংশ ও শ্রীশ্রীচণ্ডীর মূলভিত্তি। পরমাত্মার মাতৃভাবে জগৎ—সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসের কথা, —আটটী মাত্র মন্ত্রময় এই দেবীসূক্তে আছে। বেদের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার পূজ্যপাদ ভগবান সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা অবলম্বন করা হইয়াছে। জ্ঞানীর সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব-বিচার, যোগীর যোগমার্গের কথা, ও ভক্তের উচ্ছ্বাসময়ী কাতর প্রার্থনা—এই গ্রন্থ ভরিয়া আছে। সেইজন্য এই গ্রন্থের স্থান অতি উচ্চে।

গুণের আদর গুণবানের কাছে চিরকালই আছে। এই যুগোপযোগী গ্রন্থেরও আদর যোগ্য ব্যক্তির নিকট হইবে। সমগ্র চণ্ডীগ্রন্থের ব্যাখ্যা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। এই প্রথম খণ্ডে ২৮১ পৃষ্ঠা ছাপা হইল। সমগ্র ব্যাখ্যা-গ্রন্থ প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠা হইবে।

গ্রন্থকার বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, ও যশস্বী ধর্ম্মবক্তা। তিনি উচ্চ ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যবহারজীবী হইয়াও সাধনার বলে অনেক কিছু তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব চণ্ডী ও গীতা—ব্যাখ্যা আজ দশ বৎসর যাবৎ নিয়মিত ভাবে কলিকাতাবাসীগণ শুনিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। তাঁহার উদার ও সমন্বয় ব্যাখ্যা শুনিয়া অনেক পণ্ডিত বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকার ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যাখ্যায় শক্তি-তত্ত্বের প্রতি তাঁহাদের উপেক্ষার ভাব তাঁহারা বর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় দেশে শিক্ষিত সমাজে একটা নূতন আস্তিকতার বাতাস বহিয়াছে। তিনি গুপ্ত সাধক। আমরাও তাঁহার অনেক ধর্ম্ম বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

নানা শাস্ত্রের মীমাংসা ও সিদ্ধান্তপূর্ণ এই ভাবময় গ্রন্থ পাঠ করিলে পাষাণ-হৃদয় নাস্তিকেরও ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি আসিবে। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সাম্প্রদায়িকতাশূন্য সরল ভাষায় তত্ত্ব-বিচার পাঠ করিলে বুদ্ধি নির্ম্মল ও চিত্ত প্রশান্ত হয়। দেশে কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; এরূপ সময়ে এই গ্রন্থের মত সৎ সাহিত্যের প্রচার হইলে দেশের কল্যাণ হইবে। বিপথগামী নরনারী এই গ্রন্থ যদি ভাগ্যবশতঃ একবার পাঠ করে, তবে তাহাদের মনের ভাব নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত হইবে। তাহাদের ধর্ম্ম-ভাব জাগিয়া উঠিবে। পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁহার নিকট আমরা আরও অনেক নূতন নূতন অপূর্ব্ব ধর্ম্মগ্রন্থ-প্রচার আশা করি। 'শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের' স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার,

গরলগাছা নিবাসী মহাপ্রাণ, সদাত্মা শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—ইঁহাদের সাহায্য ও উৎসাহ না পাইলে আমি একাকী এই মহৎ ভক্তি-গ্রন্থকে জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারিতাম না।

"শশী-স্মরণ",
গরলগাছা
পোঃ আঃ চণ্ডীতলা
জেলা হুগলী
শুভ ১লা বৈশাখ, সন ১৩৪২ সাল।

বিনীত
শ্রীবটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

॥ ওঁ হ্রীং ওঁ ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব ॥

বা

সাধন-রহস্য ॥

প্রথম খণ্ড।

ওঁ হ্রীং নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥ ওঁ বেদব্যাসায় নমঃ ॥

বোধন

প্রশ্ন—দেবী—মাহাত্ম্য-গ্রন্থে **শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব** যে ভাবে ফুটিয়াছে আমাকে সেইটী কৃপা পূর্ব্বক বলুন।

উত্তর—**শ্রীশ্রীচণ্ডী কে?**—এই প্রশ্নের উত্তর আগে না জানিলে তুমি তত্ত্বটী কিরূপে বুঝিবে? দেবী—মাহাত্ম্যে শ্রীশ্রীচণ্ডীর স্বরূপের কথা সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বা ভগবান বাদরায়ণ বেদকে সাম, যজুঃ, ঋক ও অথর্ব্ব, এই চারভাগে বিভক্ত করিয়া এবং মহাভারত, অষ্টাদশ মহাপুরাণ, শ্রীমৎ-ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র (বা উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্তদর্শন) রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন ও ভারতবর্ষকে জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত করিয়া অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া দিয়াছেন। **শ্রীশ্রীগীতা** যেমন মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত, **শ্রীশ্রীচণ্ডী**ও সেইরূপ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। গীতায় সাত শত শ্লোক

আছে এবং চণ্ডীতেও সাত শত মন্ত্র আছে, সেইজন্য গীতা ও চণ্ডী উভয়কেই **সপ্তশতী** বলে। চণ্ডীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পরে বলিব; আগে 'চণ্ডী' বলিলে কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সেইটী ধারণা করিবার চেষ্টা কর।

প্রশ্ন—কে তিনি? কে সেই শ্রীশ্রীচণ্ডী?

উত্তর—ঋষি-প্রদর্শিত ধ্যান অবলম্বনে সেই **চণ্ডিকা দেবীকে** ধারণা করিবার চেষ্টা কর।

"যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদলনী, যা মাহিষোন্মূলিনী;
যা ধূম্রেক্ষণচণ্ড-মুণ্ড-মথনী, যা রক্ত-বীজাশনী।
শক্তিঃ শুম্ভ-নিশুম্ভ-দৈত্য-দমনী, যা চ সিদ্ধিঃ লক্ষ্মীঃ পরা
সা দেবী নবকোটি-মূর্ত্তি-সহিতা, মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী॥"

তিনিই সেই চণ্ডিকা দেবী, যিনি ব্রহ্মাকে রক্ষা করিবার জন্য মধু ও কৈটভ নামে দুইটী অসুরকে দলন করিয়াছিলেন; যিনি আর এক যুগে দেবগণের রক্ষার্থ মহিষাসুরকে বধ করেন; যিনি অপর এক যুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয়ের অনুচরগণ ধূম্রলোচন, চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ ইত্যাদি বধ করিয়া শেষে শুম্ভ ও নিশুম্ভকেও দমন করিয়াছিলেন; দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবার জন্য বহুবার যিনি এই প্রকারে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন; যিনি ভক্তগণের সর্ব্বকার্য্যের সিদ্ধি-প্রদায়িনী, যিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপিনী, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, যিনি অষ্টশক্তি-সমন্বিতা, যিনি বহুরূপী হইয়াও নবদুর্গার রূপ ধারণ করিয়া জগতে খ্যাতা হইয়াছেন, যিনি বিশ্বের ঈশ্বরী;—তিনিই আমায় রক্ষা ও পালন করুন।—এইটী ধারণা কর।

প্রশ্ন—পারিলাম না। আরও খুলিয়া বলুন, শ্রীশ্রীচণ্ডী কে? কোন্ কোন্ ভাবে ইঁহাকে চিন্তা করিব?

উত্তর—সাবধানে শ্রবণ করিয়া ধারণা করিবার চেষ্টা কর। শ্রীশ্রীচণ্ডী বলিলে তাঁহাকেই বুঝায় **যিনি বেদের ব্রহ্ম ও পুরাণের মহামায়া**; যিনি জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম, যোগীর নিকট পরমাত্মা ও ভক্তের নিকট ভগবান; যিনি ব্রহ্মশক্তি; যিনি ব্রহ্মময়ী; যিনি অব্যক্তাবস্থায় তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্ম, আবার ব্যক্তাবস্থায় ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি; যিনি জীবদেহে ব্যষ্টিভাবে আত্মা, আবার সমষ্টিভাবে বিশ্বাত্মা, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট; যিনি নিজের স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমকালে নির্গুণ, সগুণ, অবতার ও আত্মা; যিনি নিশ্চল অবস্থায় নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ ও নিরুপাধি ব্রহ্ম, আবার সচল অবস্থায় সবিকার, সবিশেষ, সৃষ্টিস্থিতিভঙ্গকারিনী ব্রহ্মশক্তি; যিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; যিনি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থার সাক্ষী; যিনি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী; যিনি জীবদেহে সর্ব্বভাবময়ী, সর্ব্ব-প্রবৃত্তিময়ী, সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়-স্বরূপিনী, আবার চিৎবস্তু আত্মারূপে সংস্থিতা; যিনি অনন্ত নাম ও রূপ ধারণ করিয়া জড় ও চিৎ স্বরূপে প্রকাশিতা; যিনি ভক্তগণকে বরাভয়দান ও অভক্তগণকে মরণ-ভীতি প্রদান করেন; যিনি ভক্তগণকে সমকালে ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করেন; যিনি লীলাময়ী; যিনি অবিদ্যা—মূর্ত্তিতে জীবকে সংসারে বদ্ধ করেন, ভোগে আসক্ত করেন, আবার বিদ্যামূর্ত্তিতে বদ্ধজীবকে আসক্তির বন্ধন হইতে মোচন করেন, এবং তাঁর স্বরূপে অবস্থিতি করান; যিনি তাঁর আশ্রিত ভক্তগণকে মৃত্যুর কবল হইতে:উদ্ধার করিয়া অমরত্ব প্রদান করেন বলিয়া মহাকালের সহিত "**বিপরীত-রতাতুরা**"; যিনি ভক্তগণের অভীষ্ট-পূরণের জন্য অতি সৌম্যমূর্ত্তি হইয়াও প্রয়োজন-মত

অতিভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তগণকে ভীষণ অস্থরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন; যিনি সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা; যিনি "শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণা"; যিনি দেবগণের (বা সাত্ত্বিক-ভাবযুক্ত ভক্তগণের) উপকারিনী; যিনি জগতের কল্যাণের জন্য **নিত্য** হইতে **লীলায়** অবতরণ করেন; যাঁহার একাংশে অবিদ্যাপাদে সবিকার ভাব, মায়ার খেলা, এবং অপর তিন অংশে বিদ্যাপাদে, নির্ব্বিকার ভাব, অপ্রাকৃত পরম ধাম; যিনি নিজে জন্ম-রহিত, কিন্তু যাঁহা হইতে সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ-কার্য্য হইতেছে; যিনি জগতের নিমিত্ত-কারণ হইলেও আবার উপাদান-কারণ; যিনি সৎ ও অসৎ, নিত্য ও অনিত্য, অবিনশ্বর ও নশ্বর হইয়াও দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব; যাঁহার অপেক্ষা বড় আর কোন বস্তু বা শক্তি বা তত্ত্ব বা সত্ত্বা নাই; যিনি সর্ব্বকারণ-কারণ; যিনি ভক্তগণের প্রয়োজন—অনুসারে কখন পুরুষ, কখন নারী, এবং কখন ক্লীব হইয়া আবির্ভূত হন, অথচ **যিনি পুরুষ, নারী বা ক্লীব, কিছুই নহেন ;**—ধারণা হইতেছে ত ? স্পষ্ট বল।

প্রশ্ন—পূর্ণভাবে ধারণা হইতেছে না। আমি হতবুদ্ধি হইতেছি। আমার জন্য আরও সরল করিয়া বলুন। দেবীর সম্বন্ধে আমার ধারণা যেন ঠিকঠিক হয়।

উত্তর—মনকে স্থির কর। ধারণা ঠিক ঠিক না হইলে এই সব আলোচনায় ফল হয় না। শোন। তিনিই সেই চণ্ডিকাদেবী যিনি সত্যযুগে মহিষাস্থর বধ করিবার জন্য **শ্রীদুর্গা** মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। যিনি শুম্ভ ও নিশুম্ভ প্রভৃতি অস্থরগণকে ' বধ করিবার জন্য শ্রীকৌষিকী—মূর্ত্তিতে বা অম্বিকাদেবীমূর্ত্তিতে বা **শ্রীকালী** মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন; আবার যিনি ত্রেতাযুগে **শ্রীরামচন্দ্র**রূপে আবির্ভূত হইয়া রাবণ বধ করিয়া এবং যিনি

দ্বাপর যুগের শেষভাগে **শ্রীকৃষ্ণ**রূপে আবির্ভূত হইয়া কংসাদি বধ করিয়া ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-রক্ষা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন; যিনি কখন **বুদ্ধ** মূর্ত্তিতে ও কখন **শঙ্করাচার্য্য** মূর্ত্তিতে, আবির্ভূতা হন; যিনি জীবের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম-সমষ্টি বা অদৃষ্টরূপিনী আবার জীবের পুরুষকার-রূপিনী; যিনি স্বরূপে নির্গুণ, সমষ্টিভাবে সগুণ, বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা; ব্যষ্টিভাবে জীবাত্মা ও যুগে যুগে অবতার। যিনি প্রসন্ন হইলেই বরদান করেন ও জীবের পুরুষার্থ লাভ হয়; যিনি ইচ্ছা করিলে ভক্তকে ব্রহ্মা করিতে পারেন অথবা শাস্ত্রোজ্জ্বলা-বুদ্ধিসম্পন্ন করিতে পারেন; যাঁহার কৃপায় অযোগ্য, যোগ্য পাত্র হয়, সাধারণ ব্যক্তি, অসাধারণ বলিয়া গণ্য হয় এবং পার্থিব ও অপার্থিব সকল অভাব জীবের পূরণ হয় ও বিদ্যা, যশঃ, ধন, প্রতিষ্ঠা আবার ভক্তি, বৈরাগ্য, তপস্যার শক্তি ও মুক্তিলাভ,—সকলই সুলভ হয়। **এই আমাদের মা!** এই শ্রীশ্রীচণ্ডী! সংক্ষেপে বলিলাম। কেমন! ধারণা ঠিক হইতেছে?

প্রশ্ন—আহা! কি সুন্দর! আপনার কৃপায় এবারে ধারণা অনেকটা ঠিক ঠিক হইয়াছে। প্রাণে এখন একটা আনন্দ-উচ্ছ্বাস উঠিতেছে, জীবনে কখন সেরূপ অনুভব করি নাই। ইনিই আমাদের মা? ইনিই শ্রীশ্রীচণ্ডী? আমার মাথা যে সেই দেবীর উদ্দেশে আপনিই নত হইয়া আসিতেছে! একি!

উত্তর—আশ্চর্য্য হইও না। ঠিকই হইয়াছে। ক্রিয়ার যেমন প্রতিক্রিয়া আছে, ধারণা ঠিক হইলেই ধ্যানের পথ সহজ হইয়া যায়, ভাবের উৎস খুলিয়া যায়। এখন সেই সচ্চিদানন্দময়ী মহামায়াকে এই ভাবাবস্থায় একবার প্রাণ ভরিয়া প্রণাম কর।

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি! নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥

দেবি! চণ্ডিকে! আমার প্রণাম গ্রহণ কর মা! আহা! মা! আমায় কিছু দাও। আমার চারিদিক শূন্য, ভিতর বাহির সব শূন্য।

বৎস! এই মাহেন্দ্রক্ষণে, এই শুভ-অবসরে, এই সমাহিত অবস্থায় প্রার্থনা কর। আমার স্বরে স্বর মিলাইয়া মার কাছে ভিক্ষা চাও। বল—"মা! করুণাময়ি! প্রসন্ন হও মা! সতত অপরাধী আমি! তুমি যে জগতের সব রূপের অন্তরালে আছ মা! তুমি যে আমার মধ্যে, আত্মারূপে, অহং-রূপে, আছ মা!—এই সত্যটা বুঝিয়ে দাও মা! দেখিয়ে দাও মা! জানিয়ে দাও মা! আমায় অজ্ঞানের কবল থেকে উদ্ধার কর মা! আমায় সংস্কারের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা কর মা! মহামায়া! ব্রহ্মময়ি! প্রসীদ! প্রসীদ।"—আবার প্রণাম কর।

প্রশ্ন—**ভিতরে বারবার প্রণাম করিতেছি**। কি আনন্দ! আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই ভাবে প্রণাম করা আমার জীবনে কখন বন্ধ না হয়।

উত্তর—এইবার তুমি শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব শুনিবার অধিকারী হইলে। এই শ্রদ্ধাভাবটী না আসিলে তোমার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার পণ্ডশ্রম হইত। এখন অবহিত হইয়া শুন। শ্রীশ্রীচণ্ডী কে?—এই প্রশ্নের উত্তর মোটামুটিভাবে শুনিয়াছ, পরে সবিস্তারে আরও বলিবার ইচ্ছা রহিল। এখন 'চণ্ডী' নামটীর সার্থকতা কি? এবং চণ্ডীর কথা বা দেবী-মাহাত্ম্য আলোচনা করিলে, বক্তা ও শ্রোতার কি লাভ?—এই দুইটী প্রশ্নের উত্তর দিব, তুমি সাবধানে ধারণা কর।

প্রশ্ন—বলুন।

উত্তর—'চণ্ডী' কথার অর্থ 'ক্রুদ্ধা; উগ্রা।' চণ্ডের স্ত্রী চণ্ডী। দুষ্ট দৈত্যদলন কার্য্যের জন্য ব্রহ্মস্বরূপা ব্রহ্মশক্তিকে যখন শান্তভাব ত্যাগ করিয়া ক্রোধের পূর্ণ মূর্ত্তি বা চণ্ডভাব ধারণ করিতে হয়; যখন অবতার-প্রয়োজনে মা ব্রহ্মময়ীকে মধুকৈটভ-অসুরদলনী তামসী যোগনিদ্রারূপে আবির্ভূতা হইতে হয়, তখনই তিনি 'চণ্ডী' নাম ধারণ করেন। অসুরদলন-কার্য্য রজোগুণের, সেইজন্য তিনি 'চণ্ডী' বা কোপনা সাজেন। ব্রহ্মময়ী অতি স্নিগ্ধ, অতি সৌম্য। কিন্তু শরণাগত দেবগণকে বা ভক্তগণকে, অসুর-পীড়ন বা সংস্কারের প্রবল অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য, দেবগণের বা সাধকের হিতার্থে, তিনি প্রয়োজন-মত অতি ভীষণ ভাব ধারণ করেন। পরমাত্মা যখন দেখেন তাঁর সন্তানেরা নানা আসুরিক ভাবের নিকট পরাজিত, লাঞ্ছিত ও পীড়িত হইয়া দুঃখের প্রতীকারের জন্য তাঁর শ্রীচরণে প্রপন্ন হইয়াছে, তখনই তিনি আর্ত্ত ও প্রপন্ন সন্তানগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য স্বয়ং যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া 'চণ্ডী' মূর্ত্তিতে অসুর নাশ করিতে আসেন। করুণায়-ভরা চিত্ত লইয়াও তিনি তাঁর আশ্রিত ভক্তগণকে নির্ভয় করিবার জন্য চণ্ডীমূর্ত্তিতে তাঁর কুপুত্রগণকে বা অসুরগণকে নিষ্ঠুর হইয়া বধ করেন এবং অসুরদের জড় দেহের সহিত তাহাদের দুষ্ট সংস্কার-রাশি ধ্বংস করিয়া তাহাদের প্রতি কৃপা করিয়া তাহাদের অমৃতময় জীবন দান করেন। ইহাই মার চণ্ডী-লীলা।

প্রশ্ন—অতি সুন্দর কথা! শুধু 'চণ্ডী' নামের এত রহস্য? আরও কত ভাব এই নামে আছে, কৃপাপূর্ব্বক বলুন।

উত্তর—শোন। অসুরদিগের নিকটে তিনি চণ্ডী—মূর্ত্তিতে ও আচরণে। দেবগণ চণ্ডী স্মরণ করেন, দেবীর বর ও অভয় পাইবার

জন্য। তিনি চণ্ডী-লীলায় এক হস্তে ভক্তগণের জন্য বরাভয় দান করেন ও অপর হস্তে অভক্তগণের জন্য শাণিত খড়্গ ও রক্ত-প্লুত অসুর মুণ্ড ধারণ করেন। ভক্তগণ মায়ের বরাভয় দেখিয়া মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া মাকে বড় সুন্দর, বড় স্নিগ্ধ ও বড় সৌম্য দেখেন। অভক্তগণ মায়ের হাতে ভীষণ অস্ত্র ও কর্ত্তিত মুণ্ড দেখিয়া মায়ের মুখ পানে তাকাইয়া মাকে ভীষণা, ভয়ঙ্করা ও অতি উগ্রা দেখে। চণ্ডী উপাসকের ভরসা এই যে, মা আমাদের "ভীষণং ভীষণানাম্" অর্থাৎ সমস্ত ভয়ের কারণ সকলও মার চণ্ডী-মূর্ত্তির সম্মুখে ভীত হয়। মা এমন ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন, যাহার অপেক্ষা ভীষণা মূর্ত্তি আর কল্পনায় পর্য্যন্ত করা যায় না। ভক্তগণের বিপদের জন্যই মার চণ্ডী-লীলা। ভক্তগণের যখন বিপদাপদ থাকে না, তখন মাকে চণ্ডী হইতে হয় না। কিন্তু ভক্তগণের সে সুদিন ঘটে না। যতক্ষণ না মাকে দর্শন করা হয় ততক্ষণ অশান্তির মধ্যে, আমরা থাকি। সুতরাং ততদিন আমাদের সাধনা থাকে, ও ততদিন আমরা বিপদের মধ্যে থাকি। কাজেই মাকে আমাদের সকলের জন্য এখনও চণ্ডী সাজিতে হয়। জীব সংস্কারের অত্যাচারে সর্ব্বদাই পীড়িত। কেন? জীব-সংস্কার ভগবৎ বিরোধী—কাজেই জীব সংস্কার-অধীন বলিয়া সাধনার পথে স্বয়ং যাইতে পারে না। যখন জীব মুক্তি পথে যাইবার চেষ্টা করে, তাহার দুষ্ট সংস্কার তাহাকে বাধা দেয়। কত কোটি সন্তান মায়ের, কত ভাবে, আপন আপন দুষ্ট সংস্কারের কাছে নিয়ত নিগৃহীত হইয়া, আপন আপন দেবত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় ভ্রমন করিতেছে, কে তাঁহার সংখ্যা করিবে? সেই অগণিত আসুরিক ভাবাপন্ন ইন্দ্রিয় বশীভূত জীবগণের কি গতি হইবে সহজেই অনুমান করা যায়। তাহাদের মধ্যে ভাগ্যবান্ যিনি, তিনিই পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি-বশে বুঝিতে

পারিবেন যে, তিনি বিষয়াভিমুখী হইয়া ভগবৎরাজ্য হইতে দূরে পড়িয়াছেন; সঙ্গ ও শিক্ষা তাহাকে অন্তর্মুখী না করিয়া বহির্মুখী করিয়াছে; সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র তাহাকে ঠিক পথে চলিতে প্রবুদ্ধ করিলেও তাহার দুষ্ট সংস্কার তাহার আত্ম-দর্শনের চেষ্টাকে বারবার ব্যর্থ করিতেছে। তিনি আরও বুঝিতে পারেন যে, জীবকে পুরুষার্থ লাভ করিতে হইলে আত্মশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া পরমাত্মার শরণাগত হইতে হইবে। সৌভাগ্যবান্ ভক্ত জীবত্বের গ্লানি দূর করিয়া বিশ্ব-জননীর শান্তিময় কোলে চির-বিশ্রান্তি লাভ করিবার জন্য, আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় মনে করিবে এবং আত্মা-রূপিনী মহামায়ার নিকট বরাভয় প্রার্থনা করিবে। মহামায়া তখনই সেই ভাগ্যবান্ সাধকের মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং যুদ্ধবেশে চণ্ডীরূপে আবির্ভূত হয়েন ও ভক্তের সমস্ত আসুরিক সংস্কার নাশ করিয়া তাঁহাকে নির্ভয় করেন। সাধকের নিকট সাধনার অন্তরায় যাহা কিছু সমস্তই বিপদ। কাজেই যতদিন না সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইতেছে, ততদিন সাধক বিঘ্ন-নাশের জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপাসনা করিবে। মাও আমাদের শরণাগতবৎসলা বলিয়া চণ্ডীমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সাধকের কাম-ক্রোধাদি রিপুগণকে চূর্ণ করিয়া তাহাকে মুক্তিদান করেন। ধারণা করিতে পারিতেছ?

প্রশ্ন—'চণ্ডী' নামে এত তত্ত্ব? 'চণ্ডী' নামের এত সার্থকতা এতদিনে কতকটা বুঝিলাম। 'চণ্ডী' নামে মাকে ডাকিলে আমরা নির্ভয় হইতে পারিব! আমাদের সকল ভয় দূর করেন বলিয়া তাঁর একটী নাম 'চণ্ডী'। বড় মধুর! আর কোন ভাব 'চণ্ডী' নামের সঙ্গে আসে?

উত্তর—আর একটা ভাবের কথা শুন। কালকে গ্রাস করেন বলিয়া যেমন মায়ের একটি নাম 'কালী', সেইরূপ 'চণ্ড'কে (বা 'উগ্র'কে

বা রজতমগুণকে বা চণ্ড-মূর্ত্তি মহিষাসুরকে বা শুম্ভনিশুম্ভকে) গ্রাস করেন বলিয়া তাঁর আর একটী নাম 'চণ্ডী'। যত বড়ই চণ্ডভাব হউক না কেন, চণ্ডী তাহাকে চূর্ণ করেন। এখন উপাখ্যান ছাড়িয়া ব্যক্তিগত সাধনার আলোচনা করা যাক্। সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে রজতমগুণকে সরাইয়া একমাত্র সত্ত্বগুণ ধরিয়া থাকিতে হয়। সাধকের কাছে সত্ত্বগুণই প্রার্থনার বস্তু ; চণ্ডভাব বা চঞ্চলতা, সাধনার প্রধান অন্তরায়। সাধক মনের সেই চণ্ডভাব বা স্বভাব-সুলভ চঞ্চলতা মায়ের সাহায্যে দূর করিবার জন্যই, মাকে চণ্ডী বলিয়া আরাধনা করিবে।

এখন, অনেক মিষ্ট নাম থাকিতেও মাকে কেন উগ্র নামে 'চণ্ডী' বলিয়া ডাকা হয়, তাহার তত্ত্বটা কিছু বুঝিলে ?

প্রশ্ন—সুন্দর বুঝিলাম। যে ভাবে ধীরে ধীরে আপনি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম তত্ত্বে বিচার দ্বারা উঠিতেছেন তাহাতে আমার মনের সকল সন্দেহ দূর হইয়া যাইতেছে ; আমার হৃদয় জ্ঞানের আলোকে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কৃপাপূর্ব্বক আরও জ্ঞানদান করুন।

উত্তর—শোন। গ্রন্থের নাম শ্রীশ্রীচণ্ডী, আবার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ও শ্রীশ্রীচণ্ডী। 'চণ্ডী'র কথা বা দেবী-মাহাত্ম্য যে গ্রন্থে আছে, সে গ্রন্থকেও 'চণ্ডী' বলে। চণ্ডীর পূজার যেমন বিধি আছে, চণ্ডীগ্রন্থেরও সেইরূপ পূজাবিধি আছে। **চণ্ডীগ্রন্থ যেন চণ্ডীদেবীর প্রতীক্**। মা চণ্ডী যেমন আমাদের শ্রদ্ধার বস্তু, চণ্ডীগ্রন্থও সেইরূপ আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। চণ্ডীগ্রন্থ-পূজা বিধিমত করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতে হয়, তবে চণ্ডীপাঠের ফল পাওয়া যায়। চণ্ডীগ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় দেবী-মাহাত্ম্য। গ্রন্থের সঙ্গে গ্রন্থের বিষয় অভিন্নভাবে 'চণ্ডী' নামে গাঁথা আছে। 'চণ্ডী' নাম উচ্চারণ করিলেই 'চণ্ডী'গ্রন্থ ও 'চণ্ডিকা' দেবী,—দুটি ভাবই হৃদয়ে ভাসিয়া ওঠে।

সংসারী বদ্ধজীবের শত শত কামনা পূরণের জন্য এই 'চণ্ডী'-আরাধনা ও চণ্ডীপাঠ বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে। তাহার নিদর্শন, পল্লীগ্রামে প্রতিগৃহে এখনও 'চণ্ডী'-মণ্ডপ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

'চণ্ডী' নামের একটা উন্মাদকারী শক্তি আছে। মৃতপ্রায় জীবও এই নামে নিরাশার মধ্যে আশার আলোক পায়। আবার, সাধকের পক্ষে ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগের পথে যাইবার রাজপথের সন্ধান এই 'চণ্ডী' নামেতেই আছে।

আবার একটী ভাবের কথা শোন ও ধারণা কর। সমকালে ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করেন যিনি, সেই ব্রহ্মময়ীকে 'চণ্ডী' বলা হয় কেন? দেবতাদের স্বর্গভোগের বাধাদানকারী অসুরদের বধ করিয়া মা আশ্রিত দেবগণকে স্বর্গভোগ প্রদান করেন। সুরথ রাজার মত রাজ্য-ভ্রষ্ট ভোগাকাঙ্ক্ষী সাধক চণ্ডীর কৃপায় শত্রুনাশ করিয়া নষ্টরাজ্য ফিরিয়া পায় ও দীর্ঘকাল ভোগ করে। আবার মায়ের হস্তে নিহত হইয়া অসুরগণ আসুরিক সংস্কার বর্জ্জিত হয় ও সর্ব্বোচ্চগতি বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। সাধক প্রবৃত্তিমার্গে থাকিলে ভোগ অব্যাহত রাখিবার জন্য এই চণ্ডীর আশ্রয় লয়; আবার নিবৃত্তিমার্গে থাকিলেও সমাধিবৈশ্যের মত মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য এই চণ্ডিকাদেবীরই আশ্রয় লইয়া থাকে। যে দিক্ দিয়াই দেখনা কেন, ভক্তের জীবভাব দূর করিবার জন্য, সাধকের অভীষ্ট পূরণের ও কল্যাণের জন্য, প্রপন্ন উপাসকের সমস্ত বিঘ্ন দূর করিয়া তাঁহাকে নির্ভয় করিবার জন্য, মা ব্রহ্মশক্তিকে "চণ্ডী" সাজিতেই হইবে।

বুঝিয়াছ? ধারণা না হইয়া থাকে, জিজ্ঞাসা কর।

প্রশ্ন—অপূর্ব্ব তত্ত্ব! আমার আর প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে না।

আমি যাহা শুনিতেছি তাহা জীবনে কখন শুনি নাই। আমার মন ও শরীর ভাবের আবেশে বিকল হইয়া পড়িতেছে; আপনাকে প্রশ্ন করিবে কে? আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমায় যে জ্ঞানের আলোক দিতেছেন, তাহাতে আমি হতবুদ্ধি হইয়া যাইতেছি। আপনি আমার হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া 'চণ্ডীতত্ত্ব' বলিয়া যান, আমায় শুনিয়া ধন্য হইবার অবসর দিন। আপনার আলোচনা নিপুণভাবেই হইতেছে।

উত্তর—ও কথা যাক্। এখন শোন। আমরা এইবার একটী তত্ত্বের আলোচনা করিব;—চণ্ডীতত্ত্ব আলোচনা করিলে, বক্তাও শ্রোতার বা আমার ও তোমার, উভয়ের কি লাভ হইবে? চণ্ডিকা-দেবীর মাহাত্ম্য আলোচনায় যদি কোন ফল না হইত, তবে দেবীর কথা আর মানুষের কথা সমান হইত। চণ্ডী-কবচে আছে যে, "মহামায়া! তোমার ভক্তেরা তোমায় স্মরণ করেন বলিয়া তুমি তাহাদের রক্ষা কর।"

"যে ত্বাম্ স্মরন্তি দেবেশি! রক্ষসি তান্ ন সংশয়ঃ।" অর্থাৎ যাহারা তোমাকে স্মরণ করেন, হে দেবেশি! তুমি তাহাদের রক্ষা কর, এ বিষয় কিছুমাত্র সংশয় নাই। চণ্ডীতত্ত্ব আলোচনা করিতে যাইলেই দেবীকে স্মরণ করিতে হইবে। সুতরাং স্মরণেই লাভ হইবে।

দেবী—মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণের কি ফল, শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বাদশ অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণনা করা আছে। সে সব কথা দেবীর নিজের শ্রীমুখের কথা। বিশ্বাস করিলেই ফল পাওয়া যায়। **শাস্ত্র বিশ্বাসীর জন্য, অবিশ্বাসীর জন্য নহে**—এই কথাটি মনে রাখিবে।

দেবী নিজে নিজের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেছেন। তাঁর কথা আলোচনা করিলে, বক্তা ও শ্রোতার কি লাভ, তাহা দেবী ব্যতীত আর কেহই সম্যক্ জানে না। সেইজন্য দেবীর কথাগুলি আমাদের বেদবাক্য ও একমাত্র অবলম্বন। **সত্যস্বরূপা তিনি,**

সুতরাং দেবীর কথাও মূর্ত্তিমান সত্য। **জ্ঞান-স্বরূপা তিনি,** সুতরাং দেবীর কথাও জ্ঞানময়। **আনন্দস্বরূপা তিনি,** সুতরাং দেবীর কথাও আনন্দের মূর্ত্তি, আনন্দের খনি।

দেবী বলিতেছেন—"আমার এই মাহাত্ম্য সর্ব্বদাই অতি সমাহিত চিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ ও পাঠ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু ইহা অতীব কল্যাণজনক।"

"পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ" ॥১২।৬

শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন বা উৎকৃষ্ট মাঙ্গলিক কথা, এই চণ্ডীর কথা। আমাদের উভয়ের নিশ্চিতই অতীব কল্যাণ হইবে। বুদ্ধিমান লোক নিজের কল্যাণ চায়। সহজে ও বিনা অর্থব্যয়ে কল্যাণ পাইবার উপায় এই দেবী-মাহাত্ম্য আলোচনা। দেবীর কথা আলোচনা করিলে আমাদের কি লাভ এখন দেখা যাক্।

প্রথম লাভ—কল্যাণ, (ঐহিক ও পারত্রিক।)

দ্বিতীয় লাভ—পাপনাশ ও পাপজনিত আপদ-নাশ।

তৃতীয় লাভ—দারিদ্রনাশ।

চতুর্থ লাভ—বন্ধুজনের সহিত বিয়োগ-নাশ।

পঞ্চম লাভ—শত্রু, দস্যু, রাজা, শস্ত্র, অগ্নি, ও জলবেগ হইতে সমস্ত ভয়নাশ।

ষষ্ঠলাভ—মহামারী জনিত নানা প্রকার উপসর্গ ও ত্রিবিধ উৎপাত দমন।

সপ্তম লাভ—দেবীর প্রসন্নতা ও সন্নিধি।

অষ্টম লাভ—নির্ভীকতা

নবম লাভ—শত্রুক্ষয়।

দশম লাভ—বংশবৃদ্ধি।

একাদশ লাভ—শান্তিকর্ম্মে সিদ্ধি।

দ্বাদশ লাভ—গ্রহশান্তি।

ত্রয়োদশ লাভ—দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নে পরিণতি।

চতুর্দ্দশ লাভ—বালগ্রহ দ্বারা অভিভূত বালকগণের রক্ষাবিধান।

পঞ্চদশ লাভ—বৈরভাব দূরীকরণ ও মিত্রতা স্থাপন।

ষোড়শ লাভ—রাক্ষস, ভূত ও পিশাচগণের বিতাড়ন।

সপ্তদশ লাভ—আরোগ্য।

অষ্টাদশ লাভ—তত্ত্ব-জ্ঞান-সাধিকা-বুদ্ধি।

ঊনবিংশ লাভ—সর্ব্বসঙ্কট হইতে মুক্তি।

এতগুলি লাভ আমাদের হইবে। ইহা দেবীর শ্রীমুখের বাণী। যদি কোন ব্যক্তি ইহলোকের যাবতীয় উন্নতি চায়, তবে তাহার এই চণ্ডীতত্ত্ব আলোচনা করা কর্ত্তব্য। রোগ-শান্তি, গ্রহপীড়াশান্তি, আপদ-বিপদ-নাশ,—কলির সকল জীবেরই প্রয়োজন। ভক্ত ও জ্ঞানী যাহারা, তাহারা চায় মুক্তি, জন্মান্তর নিবারণ। কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, সকলেরই চণ্ডীতত্ত্ব আলোচনায় লাভ আছে। যদি তুমি বিশ্বাস করিতে পার যে, অতীন্দ্রিয় বস্তুকে (বা ব্রহ্মকে) আমাদের ঋষিরা লাভ করিয়াছিলেন, তবে সেই ব্রহ্মকে অনুভূতিতে আনিবার জন্য ঋষি-প্রদর্শিত পথেই যাইতে হইবে; তাহা হইলেই তুমি এই দেবী-মাহাত্ম্য আলোচনা করিয়া ফল পাইবে। বিশ্বাস এত বড় জিনিস এবং তাহার শক্তি এতই আশ্চর্য্য যে, তুমি তাহা তোমার অবিশ্বাসী প্রাণে ধারণা করিতেই পারিবে না। আস্তিক হইয়া দেবীতত্ত্ব আলোচনায় কি ফল বুঝিতে পারিলে?

প্রশ্ন—বুঝিলাম প্রভু! আর কোন ভাবের কথা বলুন। আমার জন্য যখন প্রথম হইতেই প্রত্যেক তত্ত্বটি নানাদিক দিয়া দেখাইয়া

সরলভাবে বুঝাইতেছেন, তখন এই দেবীতত্ত্ব আলোচনার ফলস্বরূপ তত্ত্বটীও আর এক ভাব ধরিয়া বলুন।

উত্তর—ভাল কথা। চণ্ডীতত্ত্ব আলোচনার প্রত্যক্ষ ফলের কথা শোন। চণ্ডীতত্ত্ব আলোচনা করিলে তুমি বুঝিবে যে, এই চণ্ডীই—জগতের রাষ্ট্রী ও জননী। আমরা এই মহামায়ার হাতের পুতুল। **তিনিই যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র।** তিনিই কর্ম্মফলদাতা। তিনিই জীবের অদৃষ্ট। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের বা বিশ্বসংসারের কাহারও একগাছি তৃণও স্থানচ্যুত করিবার শক্তি নাই। এই সংসার—মহামায়ার বিরাট মায়া। তিনিই আসল কর্ত্তা, আমরা নিমিত্ত মাত্র। তিনিই জীবকে সংসারে বন্ধন করেন, আবার তিনিই বদ্ধ জীবকে মুক্তি দেন। তিনি প্রসন্ন হইলেই বরদায়িনী হয়েন। **কল্পতরু তিনি,** সেইজন্য জীবকে ভোগ ও মোক্ষ, কামনা অনুসারে, দান করেন। তিনি তাঁহার নিজের চরিত্রের কথা বা এই দেবী-মাহাত্ম্য শুনিলে অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

এখন, চণ্ডীতত্ত্ব আলোচনা করিয়া যখন তুমি এই সব তত্ত্ব ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, তখন আর নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে না। এই সব তত্ত্বকথা আলোচনার ফলে যদি তোমার সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, বল দেখি, ইহাই কি তোমার শ্রেষ্ঠ লাভ নহে? তুমি যদি—'ভাবের ঘরে চুরি' করা ভুলিয়া যাও, তোমার কত বড় লাভ হইল জান? অবলম্বনহীন, তোমার এই শুষ্কজীবন, যদি তত্ত্ব-আলোচনার ফলে সরস হইয়া উঠে, লক্ষ্যহীন জীবনে তোমার যদি লক্ষ্য স্থির হয়, অজ্ঞানের অন্ধকার হইতে যদি জ্ঞানের বিমল আলোকে তুমি আসিতে পার, সংশয়ের জ্বালা হইতে যদি তুমি মুক্ত হইয়া বিশ্বাসের শান্তিময় ঘরে আসিয়া বাস করিতে পার; তোমার এই দোষদৃষ্টি নষ্ট

হইয়া যদি তোমার দিব্য দৃষ্টি জন্মায়; যদি তুমি জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে রহস্যের কথা জানিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে পার, বল, তুমি কি আপনাকে ভাগ্যবান বোধ করিবে না? দেবীর কৃপায় তোমার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে—ইহা কি অস্বীকার করিতে পারিবে? বল, যে চণ্ডীতত্ত্ব আলোচনার ফলে জীব 'শিব' হইয়া যায়, সে আলোচনা কি নিরর্থক? বল? কথা কহিতেছ না কেন? শাস্ত্রকথা নয়, সাধারণ যুক্তির কথা, আমি বলিতেছি। সন্দেহ করিতেছ?

প্রশ্ন—না প্রভু! আপনার অপূর্ব্ব কথা। শ্রীমুখের বাণী আমায় ভাবের রাজ্যে লইয়া গিয়াছে। আমি চেষ্টা করিয়াও তাই কথা কহিতে পারিতেছি না। আপনি ভাবের মানুষ। আমায় ভাব দিন। চণ্ডীতত্ত্বই আমার অবলম্বন হউক। লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, আমার জীবন, শূন্য আমার প্রাণ। **আমায় ভাবে পূর্ণ করিয়া দিন**। আমার 'অহং' জ্ঞান চলিয়া যাউক, **মায়ের কর্ত্তৃত্ব ফুটিয়া উঠুক**। আমার জীবন ধন্য হউক। মায়েরই জয় হউক।

উত্তর। তবে বল—

"জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি! রম্যকপর্দ্দিনী শৈলসুতে ॥"

প্রশ্ন—(করযোড়ে) "জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্য কপর্দ্দিনী শৈলসুতে ॥"

আবাহন ॥

ওঁ হ্রীং নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ।

শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থ ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগ—দেবী মাহাত্ম্যের উপক্রমণিকা। দ্বিতীয় ভাগ—মূলগ্রন্থ। তৃতীয় ভাগ—রহস্যত্রয় (পরিশিষ্ট)।

প্রথমভাগে আবার চারিটী বিষয় আছে যথা—(১) দেবীসূক্ত, (২) অর্গলা স্তোত্র, (৩) কীলক এবং (৪) চণ্ডীকবচ। এই চারিটী স্তোত্র না পড়িয়া চণ্ডীপাঠ করা নিষেধ। চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিতে হইলে, অথবা চণ্ডীপাঠ সফল ও সার্থক করিতে হইলে, এই চারিটী স্তোত্র অগ্রে পাঠ ও ধারণা করা প্রয়োজন।

দেবীসূক্ত—ঋগ্বেদের অন্তর্গত আটটী মন্ত্র। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্‌দেবী ব্রহ্মজ্ঞানযুক্তা হইয়া পরমাত্মাভাবে কথা কহিতেছেন। ইহাতে উক্ত দেবীকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বগত পরমাত্মা দেবতারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থের মূল উপাদান এই দেবীসূক্ত। পৌরাণিক চণ্ডীগ্রন্থের ভিত্তি—ঋগ্বেদের এই দেবীসূক্ত। দেবীসূক্তের পরমাত্মাই মূল চণ্ডীগ্রন্থে মহামায়ারূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং বেদের ব্রহ্ম বা পরমাত্মা এবং পুরাণের মহামায়া অভিন্ন, এক বস্তু। **দেবীসূক্তে যাহা আত্মা, চণ্ডীগ্রন্থে তাহাই মহামায়া।** দেবীসূক্তে **পরমাত্মার মাতৃভাব** বিশেষভাবে ফুটিয়াছে। পরমাত্মার পিতৃভাব ও মাতৃভাব জীবের উপাসনার বিষয়। দেবীসূক্ত আলোচনা করিলে

ব্রহ্মাদি দেবগণ ও স্বর্গাদি-লোক-সকল-প্রসবিনী ব্রহ্মস্বরূপিনী মায়ের স্বরূপ কথঞ্চিৎ ধারণা হয়।

অর্গলা—চণ্ডীপাঠের বিঘ্ন নাশ করিবার জন্য, অভীষ্ট সিদ্ধির প্রতিবন্ধক দূর করিবার জন্য এবং বহির্মুখ মনকে অন্তর্মুখী বা মাতৃমুখী করিবার জন্য, এই অর্গলাস্তুতি পাঠ করিতে হয়। অর্গল কথার অর্থ খিল বা হুড়কো। যেমন দ্বারে অর্গল (বা খিল দ্বারা) বদ্ধ করিলে বাহিরের বস্তু ঘরে আসিতে পারে না, সেইরূপ এই অর্গলা স্তোত্র পাঠ করিলে কোনও বিঘ্ন বা বিপদ আসিতে পারে না, এবং বাহ্য বিষয় চিত্ত-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। এই স্তোত্রে মাতৃমহিমার কথা খুব বেশী আছে। সেইজন্য ইহাতে সিদ্ধি-প্রতিবন্ধক-রূপপাপ নাশ হয়।

কীলক—কীলক কথার অর্থ শাপ। দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থের উপর মহাদেব-কৃত শাপ আছে। এই কীলক স্তুতি সেই শাপের উদ্ধার মন্ত্র। গায়ত্রী-মন্ত্রেও ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এই তিনজনের শাপ আছে—আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই শাপের উদ্ধার বিধান বা মন্ত্রও আছে। এই কীলক পাঠ করিয়া চণ্ডীপাঠ করিলে মহাদেবের শাপের উদ্ধার করা হয় এবং সেইজন্য পাঠকের অভীষ্টসিদ্ধি হয় এবং চণ্ডীপাঠের ফল ফলে। এই কীলক পাঠ না করিয়া যিনি চণ্ডীপাঠ করিবেন, তিনি চণ্ডীপাঠের ফল পাইবেন না, পূর্ণকাম হইবেন না। সুতরাং চণ্ডীপাঠের অধিকারী হইতে হইলে এই কীলক পাঠ করিতে হইবে। 'কীলক' কথার আর একটী অর্থ 'চাবি'। দ্বারবদ্ধ ঘরের চাবি খুলিয়া যেমন ঘরের ভিতর প্রবেশ করা যায়, সেইরূপ গহন চণ্ডীতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে কীলক পাঠ করিয়া চাবি খুলিতে হইবে। চণ্ডী-রহস্য সাধারণের নিকট সহজে যাহাতে

প্রকাশিত না হয়, তজ্জন্য মহাদেব তাহা চাবি দিয়া অতি সঙ্গোপনে রাখিলেন। যে ভক্ত চণ্ডীরহস্য জানিতে চায়, তাহাকে এই মহাদেবের চাবি খুলিতে হইবে। চাবি খুলিবার উপায় কি? মহাদেব-কৃত এই কীলক-স্তবই চাবি। এই কীলক পাঠ করিলে সেই চাবি খুলিয়া যায়। সুতরাং পাঠকের নিকট চণ্ডী-রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কীলক কথার আর একটী অর্থ খোঁটা। যেমন যাঁতার মধ্যস্থানে খোঁটার বা গোঁজার গোড়ায় যে সকল মটর বা ছোলা থাকে সেগুলি যাঁতার পেষণে চূর্ণ হয় না, সেইরূপ যে সকল ভক্তেরা ভগবানের পাদপদ্মরূপ 'কীলক' অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহারা সংসারের পেষণে, শোকে ও দুঃখে চূর্ণ হইয়া যায় না। এই 'কীলক'-স্তব পাঠ করিলে মহামায়ার আশ্রয় লাভ করা যায়।

যেমন অর্গলায় বিঘ্ননাশ হয়, তেমনি কীলকে অভীষ্টসিদ্ধি হয়।

কবচ—'কবচ' কথার অর্থ, 'বর্ম্ম' বা 'অঙ্গত্রাণ'; যাহা পরিয়া থাকিলে শত্রুনিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি অঙ্গে লাগে না। কবচের দ্বারা শরীর আবৃত রাখিলে শত্রুর আঘাত হইতে দেহ-রক্ষা হয়। চণ্ডী-কবচ পাঠ করিলে আত্মরক্ষা করা যায়। নিজের স্থূল দেহকে দশদিক হইতে আগত বিপদ সমূহ হইতে রক্ষা-কার্য্য এই কবচ পাঠে হয়। কি প্রকারে দেবীকে নিজ স্থূলদেহের বিভিন্ন অংশে ন্যাস করিতে হয়, কি প্রকারে নিজের সূক্ষ্ম দেহকে, অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারকে রক্ষা ও চালনা করিবার ভার মা চণ্ডীকে দিতে হয়, কি প্রকারে নিজের যশ, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, সন্তান-সন্ততি, গৃহপালিত পশুপক্ষী, ধর্ম্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার দেবী চণ্ডিকাকে দিতে হয়; কি প্রকারে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ পুরুষার্থ কেবলমাত্র ব্রহ্মশক্তির শরণাগত

হইলে লাভ করা যায়—এই চণ্ডীকবচে তাহাই বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া যেমন যুদ্ধ করিতে যাইলে আত্মনাশের সম্ভাবনা থাকে, সেইরূপ চণ্ডীকবচ পাঠ না করিয়া চণ্ডীগ্রন্থ পাঠ করিলে আমাদের ইষ্টলাভ হওয়া দূরে থাকুক, ইষ্ট নাশেরই সম্ভাবনা বেশী। চণ্ডীকবচ পাঠ করিলে আমাদের অরক্ষিত দেহের রক্ষা বিধান করা হয়। এই দেবীকবচ আশ্রয় করিলে জীব ইহলোকে যাবজ্জীবন বিবিধ প্রকার ভোগসুখ পায় ও জীবনান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

দেবীসূক্তে চণ্ডিকাদেবীর **স্বরূপের কথা** পাওয়া যায়। অর্গলায় চণ্ডীপাঠ কর্ম্মের **বিঘ্ননাশ** হয়; কীলকে পাঠকের **অভীষ্টসিদ্ধি** হয়। কবচে দেবীর **আশ্রিত** হইয়া জীব নির্ভয় হয়।

এই আমাদের চণ্ডী-আরাধনার উদ্যোগ পর্ব্ব। যে যত বিধিমার্গে থাকিয়া আয়োজনের সম্ভার করে, ঐকান্তিক চেষ্টা করে, দেবীকে লক্ষ্য রাখিয়া ভক্তিনম্র-হৃদয়ে সাধনা করে, সে ততশীঘ্র পূর্ণকাম হইতে পারে।

দ্বিতীয় ভাগ—মূলগ্রন্থ

শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থে ৫৭৮ শ্লোক আছে, তাহাই ৭০০ মন্ত্রে বিভক্ত। এক একটী মন্ত্রে হোম করিবার বিধি আছে। মন্ত্র সংখ্যার হিসাবে শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থের আর একটী নাম সপ্তশতী। কাত্যায়নী তন্ত্রে এই মন্ত্রবিভাগরহস্য আছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। মা চণ্ডীর তিনটী চরিত্রের কথা লইয়াই—চণ্ডীগ্রন্থ। প্রথম অধ্যায়ে মায়ের মধুকৈটভ-

বিধ্বংসী ব্রহ্মার স্তবে আবির্ভূতা তামসী যোগমায়া-রূপিনী অপ্রকট আবির্ভাবের কথা আছে। মহামায়ার এই প্রথম চরিত্র। ইহাকে **ব্রহ্মগ্রন্থি-ভেদ** বলে। মধুকৈটভ-বধের আধ্যাত্মিক ভাব—**লোভ নামক রিপুর দমন**।

মায়ের দ্বিতীয় বা মধ্যম চরিত্র—মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তির আবির্ভাবের কথা। চণ্ডীগ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই তিনটি অধ্যায়ে মায়ের দুর্গামূর্ত্তির আবির্ভাব, সসৈন্য মহিষাসুর বধ ও দেবতাগণের মাতৃস্তুতি এই বিষয়গুলি আছে। ইহাকে **বিষ্ণুগ্রন্থি-ভেদ** বলে। **মহিষাসুর-বধ বা ক্রোধদমন** ইহার কার্য্য।

মায়ের তৃতীয় চরিত্র—শুম্ভ-নিশুম্ভদমনী—কৌষিকী বা কালীমূর্ত্তির আবির্ভাবের কথা। পঞ্চম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অংশে মায়ের তৃতীয় চরিত্রের কথা বর্ণিত আছে। শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরের অত্যাচারে পীড়িত, লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত দেবতাদের—দেবী চণ্ডিকাকে স্তব, অম্বিকা দেবীর কৌষিকী মূর্ত্তিতে আবির্ভাব, দেবীদূত-সংবাদ, ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ ও শুম্ভ প্রভৃতির সহিত দেবীর যুদ্ধ ও তাহাদের বধ, দেবতাগণের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশক **নারায়ণী-স্তুতি,** দেবীর প্রসন্নতা ও দেবতাগণকে বরদান, দেবীর ভবিষ্যৎ বিবিধ অবতার গ্রহণের বিবরণ ও দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণের ফল-চণ্ডীগ্রন্থের পঞ্চম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভাগে বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। শেষ বা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মেধস্ মুনির উপদেশে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের দেবী-আরাধনা ও সিদ্ধিলাভ বর্ণিত হইয়াছে। মায়ের এই চরিত্রকে **রুদ্রগ্রন্থি-ভেদ** বলে। **শুম্ভবধ বা কামরিপু—জয়** ইহার কার্য্য।

রাজ্যভ্রষ্ট ভোগাকাঙ্ক্ষী সুরথ রাজা চণ্ডী আরাধনার ফলে দেবীর বরে ভোগের চূড়ান্ত লাভ করিয়াছিলেন আবার—সেই একই ক্ষেত্রে, একই উপাসনায়, ত্যাগী সমাধি বৈশ্য মোক্ষের সাধনভূত তত্ত্বজ্ঞান, দেবীর বরে লাভ করিয়াছিল। ভোগ ও মোক্ষ সমকালে প্রদান করিতে পারেন বলিয়া এই চণ্ডিকাদেবী কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, কি ভোগী, কি ত্যাগী, সকলেরই অবলম্বনীয়।

চণ্ডীগ্রন্থে চারিটী উৎকৃষ্ট স্তব আছে। প্রলয়-সলিলোপরি শয়ান ভগবান বিষ্ণুর নাভিকমলেস্থিত ব্রহ্মা বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূত মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়ের ভয়ে ভীত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপিনী নারায়ণের যোগনিদ্রারূপিনী যোগমায়ার উদ্দেশে প্রথম স্তব করিয়াছিলেন। এই সুন্দর স্তব প্রথম অধ্যায়ে আছে। ইহা তত্ত্ব-কথায় পরিপূর্ণ।

দ্বিতীয় স্তব চতুর্থ অধ্যায়ে আছে। দেবতাগণ ও দিব্যমহর্ষিগণ মহিষাসুর—বধের পর মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গাদেবীকে এই স্তব করিয়াছিলেন। এই স্তবের বিশেষত্ব এই যে, এই স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবতাদের প্রার্থনায় দেবী চণ্ডিকা এই বর দেন যে, যে মনুষ্য এই চতুর্থ অধ্যায়ের এই স্তবের দ্বারা দেবীকে স্তব করিবে, দেবী তাহার প্রতি সতত প্রসন্না থাকিয়া জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি, ধনদারাদি তাহাকে প্রচুর পরিমাণে দিবেন। চতুর্থ অধ্যায়ে—দেবীর এই বরদানের কথা না থাকিলে আমরা কেহই শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের ফল পাইতাম না। দেবতাদের হিতার্থে মায়ের দুর্গামূর্ত্তিতে যে এই অসুর-দলনলীলা, ইহার সহিত মর্ত্তবাসী মনুষ্যগণের কোন সংস্রব নাই। কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ের এই স্তবের ফলে দেবীর বরে—মর্ত্তবাসীর সঙ্গে দেবগণের ও দেবীলীলার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এই স্তব অতি মনোরম, ভক্তির বিমল উচ্ছ্বাস।

তৃতীয় স্তব, পঞ্চম অধ্যায়ে আছে। শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচারে ইন্দ্রাদি-দেবতা-সকল স্বর্গরাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া হিমালয় শিখরে একত্র মিলিত হইয়া দেবীর পূর্ব্বদত্ত বর স্মরণপূর্ব্বক বিপদের ও দুঃখের প্রতিকারের জন্য দেবী চণ্ডিকাকে এই স্তব করিয়াছিলেন।

চতুর্থ স্তব, একাদশ অধ্যায়ে, আছে। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ হইবার পর ইন্দ্রাদি দেবগণ অভীষ্ট পূর্ণ হওয়ায় হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এই কাত্যায়নী স্তব করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই চারিটি স্তব আলোচনা করিলে চণ্ডীতত্ত্ব কতকাংশ ধারণা করা যায়। বেদান্তের গূঢ়তত্ত্ব এই সকল স্তবে অনেক জায়গায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানী যোগী ও ভক্ত—তিন প্রকারের সাধকের রুচি অনুযায়ী ভাবের কথা এই সকল স্তবে দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীগ্রন্থের মধ্যে এই চারিটি স্তব যেন চারখণ্ড বহুমূল্য রত্নবিশেষ। চণ্ডীতত্ত্বের উজ্জ্বলতা ও গভীরতা এই সকল স্তবেই বিশেষ ভাবে উপলব্ধি হয়। তাই স্তবগুলি সাধকের কণ্ঠহার-স্বরূপ।

চণ্ডীগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান এই যথাঃ—সুরথরাজার শত্রুর নিকট পরাজিত হইয়া মনের দুঃখে বনে গমন; ক্রমে মেধস্ মুনির আশ্রমে অবস্থান; তথায় স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয়বর্গ কর্ত্তৃক গৃহ হইতে দূরীভূত ধনশালী সমাধি নামক বৈশ্যের সঙ্গে মিলন; সুরথ ও সমাধির মায়া-রহস্য সম্বন্ধে মেধস্‌মুনিকে প্রশ্ন; মেধস্‌মুনির মহামায়ার স্বরূপ কথন ও বহু অবতারের মধ্যে মায়ের তিনটি অবতারের বিবরণ কথন; মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ, ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ—মায়ের তিনটি অবতারের তিনটি কার্য্য; দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মেধস্‌মুনির উপদেশে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের অভীষ্ট পূরণার্থে দেবীর তিনবৎসর ব্যাপী পূজা ও আরাধনা; দেবীচণ্ডিকার আবির্ভাব ও সুরথ রাজাকে নষ্টরাজ্য-পুনঃপ্রাপ্তি

এবং মৃত্যুর পর সাবর্ণি নামে অষ্টম মনু হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন,—এই বরদান এবং সমাধি বৈশ্যকে মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্তভূত তত্ত্বজ্ঞান-রূপ-বরদান।

তৃতীয় ভাগ—পরিশিষ্ট

রহস্যত্রয়—শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থের শেষভাগে চণ্ডীপাঠ-ফল ও সপ্তশতী রহস্যত্রয় আছে। প্রাধানিক রহস্য, বৈকৃতিক রহস্য ও মূর্ত্তি রহস্য—এই তিনটী রহস্যকে রহস্যত্রয় বলে। ইহাতে যথাক্রমে মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহা-সরস্বতী মূর্ত্তির রহস্যের কথা আছে। দেবী চণ্ডিকাই ঐ তিনটী মূর্ত্তিতে আবির্ভূর্তা হন। তিনি স্ত্রীও বটে আবার পুরুষও বটে।

"মাতুলিঙ্গং গদাং খেটং পানপাত্রঞ্চ বিভ্রতী।
নাগং লিঙ্গঞ্চ যোনিঞ্চ বিভ্রতী নৃপ মূর্দ্ধনি ॥"
"এবং যুবতয়ঃ সদ্যঃ পুরুষত্বং প্রপেদিরে।
চক্ষুষ্মন্তোঽনুপশ্যন্তি নেতরেঽতদ্বিদো জনাঃ ॥"

(প্রাধানিক রহস্য)

দেবী চণ্ডিকা সাকারা এবং নিরাকারা—দুইই, সমকালে। তাঁর অনেক রূপ ও অনেক নাম।

"নিরাকারা চ সাকারা সৈব নানাভিধানভৃৎ।
নামান্তরৈ-র্নিরূপ্যেষা নাম্না নান্যেন কেনচিৎ ॥

(প্রাধানিক রহস্য)

মধুকৈটভ-বধ জন্য হরির যোগনিদ্রারূপিনী দেবী চণ্ডিকার নাম তমগুণময়ী **মহাকালী**।

সমস্ত দেবতার শরীরের তেজ সমষ্টি হইতে যে মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা মূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, সেই দেবী চণ্ডিকাই ত্রিগুণময়ী **মহালক্ষ্মী**। তিনি ক্রমে ক্রমে অষ্টভুজা, দশভুজা, অষ্টাদশভুজা এবং সহস্রভুজা হইয়াছিলেন।

সর্ব্বদেবশরীরেভ্যঃ যাবির্ভূতামিতপ্রভা।
ত্রিগুণা সা মহালক্ষ্মীঃ সাক্ষান্মহিষমর্দ্দিনী॥
অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা সতী।"

(বৈকৃতিক রহস্য)

ধূম্রলোচন, চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভাদি অসুরদলন করিবার জন্য যে **কালী মূর্ত্তিতে** দেবী চণ্ডিকা আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, সেই চণ্ডীকাদেবীই সত্ত্বগুণময়ী **মহাসরস্বতী**।

দেবী চণ্ডিকার অনেক অবতার ও অনেক রূপ। যখন যখন দানবেরা দেবতাদের স্বর্গভোগে বাধা দিয়াছে,—তখন তখন দেবী চণ্ডিকা আশ্রিত দেবগণের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনমত মূর্ত্তিধারণ করিয়া অসুরকুল সংহার করিবার জন্য আবির্ভূতা হইয়া থাকেন।

"শাকম্ভরী শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা।
উমা গৌরী সতী চণ্ডী কালিকা সা চ পার্ব্বতী॥"
"ইত্যেতা মূর্ত্তয়ো দেব্যা ব্যাখ্যাতা বসুধাদিপ।"
জগন্মাতুঃশ্চণ্ডিকায়াঃ কীর্ত্তিতাঃ কামধেনবঃ॥"

(মূর্ত্তি রহস্য)

বিশ্বজগতে যত রূপ আছে, সমস্তই দেবী চণ্ডিকারই রূপ। সমস্ত জগৎ দেবীময়। তিনিই বিশ্বমূর্ত্তি। অতএব তাঁহাকে প্রণাম।

সর্ব্বরূপ-ময়ী দেবী সর্ব্বং দেবীময়ং জগৎ।
অতোঽহং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীম্ ॥"
(মূর্ত্তি রহস্য)

এই আমাদের সমগ্র শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইল। এইবার বিশদ আলোচনা আরম্ভ হইবে।

আমরা দেবীস্থক্ত আলোচনা আরম্ভ করিব।

প্রার্থনা—দেবী প্রসন্ন হউন। আমাদের শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি দান করুন। তাঁর সুগভীর তত্ত্বে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য দিন। আলোচনা কালে তিনি ক্ষণকালের জন্যও যেন আমাদের ত্যাগ না করেন। আমাদের সকলের বাহ্যইন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় যেন তাঁর নামে আপ্যায়িত হয়। আমাদের সকলকে তিনি সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করুন। আমরা যেন তাঁর তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি। কোনদিক হইতে যেন কোন বাধা আসিয়া আমাদের এই শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব আলোচনা পণ্ড না করিয়া দেয়। আমরা যেন মাতৃ-আহ্বান-ধ্বনি শুনিতে পাই। আমরা যেন মাতৃমুখী হইতে পারি। আমরা যেন প্রকৃতই অমৃতের পুত্র হই। মহামায়ার সন্তান আমরা-একথা যেন না ভুলিয়া যাই।

ওঁ শান্তি !! ওঁ শান্তি !! ওঁ শান্তি !!!

দেবী-সূক্ত।

ওঁ হ্রীং নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

মন্ত্র।

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥১॥

অনুবাদ।

আমি (সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা) একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি। আমিই মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় নামে দেবতাগণকে ধারণ করিয়া আছি।

আলোচনা

দেবী-সূক্তের এই অহং'টি কে? **এই 'আমি' কথাটীর বক্তা কে?** অম্ভৃণ নামে এক মহর্ষির বাক্ নামে একটী কন্যা ছিলেন। সেই বাক্ নামে কন্যাটী ব্রহ্মবিদুষী হইয়াছিলেন। ব্রহ্মকে জানিয়া অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার সহিত নিজ আত্মার সম্পূর্ণ অভিন্নতা উপলব্ধি করিয়া স্বমুখে তিনি যে আত্মস্বরূপ প্রকাশিত, বা আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, ঋগ্বেদে তাহাই দেবীসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। সুতরাং **বাক্‌দেবী এই দেবীসূক্তের বক্তা।**

পূজ্যপাদ সায়নাচার্য্য বেদের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার। তিনি এই দেবীসূক্তের ভাষ্য লিখিয়াছেন। আমরা এই দেবী-সূক্ত আলোচনায় তাঁর ব্যাখ্যা অবলম্বন করিব। কারণ এই দেবীসূক্তের নানাপ্রকারের ব্যাখ্যা সম্প্রদায়-বিশেষে আছে। আমরা সকল সম্প্রদায়ের মত বজায় রাখিয়া সর্ব্বধর্ম্ম-সম্প্রদায়-সমন্বয় লক্ষ্য রাখিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসুর অধিকার অনুসারে সাধনার সকল স্তরের অনুভূতির কথা, সার্ব্বজনীন ভাবে, এই দেবীসূক্ত আলোচনা কালে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

দেবীসূক্ত নাম কেন ?

পরমাত্মার পিতৃশক্তির পরিচয় বেদের যে কয়টী মন্ত্রে আছে, সেই কয়টী মন্ত্রকে যেমন **পুরুষসূক্ত** বলে, যথা—

"ওঁ সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ—ইত্যাদি"। সেইরূপ ঋগ্বেদের এই আটটী মন্ত্রে **পরমাত্মার মাতৃশক্তির** বা **মাতৃভাবের কথা** পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে দেবীসূক্ত বলে।

মহামায়া ব্রহ্মশক্তি নিজের মুখে নিজের স্বরূপের কথা এই দেবীসূক্তে বলিতেছেন। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি' ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি নিজেই ব্রহ্ম হইয়া যান। সুতরাং বাক্‌নাম্নী উক্ত ঋষিকন্যা যখন ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন তখন নিজেই ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানযুক্তা ঋষিকন্যা বাক্‌নিজেও ত্রিকালজ্ঞ ঋষি হইয়া গিয়াছিলেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—সমস্ত দৃশ্যবস্তু ব্রহ্মময়, এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া সেই বাক্‌দেবী নিজ আত্মাকেই বিশ্বব্যাপী সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাস্বরূপে জানিয়াই যে কয়টী **অনুভূতির কথা** বলিয়াছিলেন, তাহাই দেবীসূক্ত। **জগজ্জননী ব্রহ্মময়ী ভক্তগণের হিতার্থে, এই ঋষিকন্যা বাক্ স্বরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।** ব্রহ্মময়ী উক্ত বাক্‌দেবীর আধার অবলম্বন করিয়া জগতে অপৌরুষেয় বেদের সনাতন তত্ত্ব প্রচার করেন। দেবী

মহামায়া নিজেই নিজের বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের কথা বা আত্মতত্ত্ব, এই দেবীসূক্তে প্রকাশ করিয়াছেন। দেবীসূক্তের 'অহং' তাহা হইলে আর কেহই নহেন, সেই চির-প্রসিদ্ধ সচ্চিৎসুখাত্মক সর্ব্বগত পরমাত্মা, যিনি ব্যষ্টিভাবে, প্রতি জীবে, জীবাত্মা, আবার সমষ্টিভাবে, বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা।

জীবের যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন সে নিজেকে ও জগতকে ব্রহ্মময় দেখে। গীতায়ও এই ব্রহ্মজ্ঞানের পর জীবের 'অহং' সম্বন্ধে কথা আছে—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতেপরাম্ ॥"

"সোঽহং" ভাবে সিদ্ধ হইলে, সাধক আপনাকে ব্রহ্মবোধ করে এবং উপলব্ধি করে যে তাঁরই আত্মার এত প্রসার হইয়াছে যে তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে সেই আত্মারই সন্ধান পাইতেছেন। যে অহং বা আত্মা বা চৈতন্য ওত-প্রোতভাবে এই জগতের প্রতি অণু-পরমাণুতে রহিয়াছেন, সেই অহং এর বা আত্মার সাক্ষাৎ অগ্রে নিজহৃদয়ে সাধক অনুভব না করিলে, সেই অহংকে সর্ব্বব্যাপী দেখিবে কিরূপে?

'আমি'কে জানিলেই সব জানা হইয়া যায়। কিরূপে? জগতের রহস্য ভেদ করিতে পারেন তাঁহারাই, যাঁহারা প্রকৃতি-পুরুষ-রহস্য, বা দেহ-দেহী-রহস্য, অগ্রে ভেদ করিতে পারেন। জীবদেহ একটী ক্ষুদ্র বিশ্ব। বাহিরে চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, ভিতরে সমস্তই ক্ষুদ্রাকারে ও **তত্ত্বভাবে** আছে। যে চিৎবস্তু সর্ব্বব্যাপী, আমার দেহও বিশ্বের মধ্যে বলিয়া আমার দেহেও সেই চিৎবস্তু আছেন।

বহির্জগত আমার দেহের তুলনায় অনেক বড়। আমার দেহের

মত এমন কত কোটি জীবের দেহ এই বিশ্বের মধ্যে আছে। সেইজন্য আমার একটী দেহের মধ্যের যে চিৎবস্তু তাহাকে জীবাত্মা বলে; আর বিশ্বব্যাপী বিরাট দেহ-মধ্যস্থিত চৈতন্যের নাম পরমাত্মা। এই জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপে অভিন্ন। জীবাত্মা নাম ওরূপ অর্থাৎ উপাধিযুক্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞতা থাকিতেও মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপিনী শক্তিবশে অল্পজ্ঞের অভিনয় করে। ব্রহ্মচৈতন্য অখণ্ড হইয়াও যেন খণ্ড চৈতন্যমত জীবাত্মারূপে অনুভব হয়। যখন মায়ার শক্তি দূরে যায়, তখন রাহুগ্রাস-মুক্ত নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের মত জীবাত্মার স্বরূপ অনুভূত হয়। অন্তর্জগতে আত্মার এই স্বরূপ দর্শন হইলে, তবে এই আত্মাকেই বাহিরে সর্ব্বত্র সর্ব্বপদার্থের অন্তরালে দেখিতে পাওয়া যায়। সেজন্য আত্মদর্শন ও ব্রহ্মদর্শন একই বস্তু—শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে এই কথা বহুস্থানে আছে।

জগতে একটীমাত্র সত্তা আছে, তাহা চৈতন্য বা আত্মা। এই চৈতন্য নিত্যবস্তু, শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধ, নির্লেপ, নির্ব্বিকার।

"সত্যং একম্ অনন্তং ব্রহ্ম"

সত্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অনন্ত, ব্রহ্মই এই চৈতন্য। সৃষ্টির আদিতে এই চৈতন্যই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। এই অহম্ই সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় 'বহু' হইয়াছিলেন। এই 'অহম্' হইতে 'বহুর' উৎপত্তি—ইহাকে বলে সৃষ্টি। আবার এই 'বহুর' লয় হয়এই 'অহম্' এতে—ইহাকে বলে প্রলয়। সুতরাং সৃষ্টির আদিতে অহম্, আবার সৃষ্টির লোপে, মহাপ্রলয়ে, থাকে কেবল এই অহম্। সেইজন্য অহম্ নিত্যবস্তু অবিকারী—আর সৃষ্টি যাহা কিছু সব অনিত্য।

এই অহং-তত্ত্বের বক্তা কে? দেবীসূক্তের আত্ম-দ্রষ্টী, **বাক্দেবী**

স্বয়ং পরমাত্মাভাবে জীবজগৎ উপলব্ধি করিয়া, 'সোঽহং' ভাবে কথা কহিতেছেন। **অহম্ই অহম্তত্ত্বের বক্তা**।

দেবীসূক্তের 'অহম্' জিনিষটী বুঝা একটু শক্ত। আরও সহজভাবে আলোচনা করা যাক্। ভূতাবেশের দৃষ্টান্ত দেখা যাক্।

যখন কোন স্ত্রীলোককে ব্রহ্মদৈত্যতে পায়, ব্রহ্মদৈত্যের ভর হইলে, সেই স্ত্রীলোকের মুখ দিয়া ব্রহ্মদৈত্য কথা কয়। তখন বক্তা হন সেই ব্রহ্মদৈত্য, কিন্তু তিনি অদৃশ্য থাকেন। যখন সে স্ত্রীলোকটী আবার সহজ অবস্থা পায় তখন তাহার ঐ সব ব্যাপারের কিছুই মনে থাকে না। ভরের সময় যে দেবতা বা অপদেবতা বা উপদেবতার ভর হয়, তিনিই বক্তা। যখন ভরের সময় স্ত্রীলোকটী কথা কয়, তখন সে যতবার 'আমি' বলে, ততবারই তার কথা শুনিয়া বেশ বুঝা যায়, সেই 'আমিটী সেই স্ত্রীলোকটী নয়, কিন্তু সেই ব্রহ্মদৈত্য। সেইরূপ ব্রহ্মবিৎ বাক্ নামে ঋষিকন্যার মুখ দিয়া যে সকল তত্ত্বকথা নির্গত হইয়াছিল, সেই কথাগুলির বক্তা **বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বা ব্রহ্মস্বরূপা 'অহং'**। 'অহং' শব্দে বাক্দেবী কাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন? যে 'অহং' একাদশ রুদ্ররূপে, অষ্টবসুরূপে, বিচরণ করিতে পারেন, তিনি কখনই বাক্দেবীর দেহ হইতে পারেন না। তিনি নিশ্চয়ই আত্মা। কিন্তু বাক্দেবীর আত্মা কিরূপে হইবে? বাক্দেবীর যখন আত্মদর্শন হইয়া গেল, তখন তিনি বুঝিলেন, যে, তাঁর আত্মাই সর্ব্বত্র বিরাজমান। একাদশরুদ্র মূর্ত্তিতে বা অষ্টবসু মূর্ত্তিতে যে চৈতন্য ফুটিয়াছে সেই চৈতন্যই তাঁর আত্মা।

গীতায় আছে—**"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র।"** অর্থাৎ যে আমাকে বা পরমাত্মাকে "সর্ব্বত্র দেখে।"

এখন সিদ্ধা বাক্‌দেবী সেই অহংকে বা চৈতন্যকে সর্ব্বত্র দেখিয়া বলিয়াছেন, আমি সর্ব্বত্র আছি।

অম্ভৃণ—ঋষিকন্যার অহম্‌' বস্তুটী সর্ব্বভাব-বিনির্মুক্ত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা। **এই আমিই সাধকের ইষ্টদেবতা।** এই আমিতে যুক্ত হইয়া অম্ভৃণঋষি-কন্যা বাক্‌দেবী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই দেবীসূক্ত। সুতরাং এই দেবীসূক্ত আলোচনা করিলে আমরা এই **'আমি'র সন্ধান** পাইব।

এই আমি **স্বগত, স্বজাতীয়** ও **বিজাতীয়** এই তিন প্রকারের ভেদ বর্জ্জিত। এই 'আমি' কি বস্তু তাহা জানিলেই মানুষ জীবন্মুক্ত হয়; তাহার মনুষ্য জন্ম সার্থক হয়। অদ্বিতীয় সত্তা এই আমি। ইহার তুল্য আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। ইহা অপেক্ষা মহৎ বস্তুও আর নাই। এই আমিকে যাহারা না জানে তাহারা অজ্ঞানী, তাহারা মানব হইয়াও পশু।

এই 'আমি'র লক্ষণ যাহা, ব্রহ্ম বস্তুরও লক্ষণ তাহাই। এই 'অহং' কোন্ 'অহম্‌'? 'সোঽহম্‌,—সেই অহম্ অর্থাৎ ব্রহ্ম অহম্‌। সেইজন্য শ্রুতির মহাবাক্য **'অহম্ ব্রহ্ম অস্মি।'** আমি ব্রহ্ম হই।

এখন এই 'অহম্‌' বা ব্রহ্ম, স্বগত স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ বর্জ্জিত। এই তিন প্রকারের ভেদ বুঝা যাক্‌। একটী গাছ একটী মানুষ হইতে ভিন্ন। গাছ ও মানুষ এক জাতীয় নহে ভিন্ন জাতীয়। সুতরাং এই ভেদটী বিজাতীয় ভেদ। একটী কলা গাছ আবার একটি বকুল গাছ হইতে ভিন্ন। যদিও দুইটীই গাছ, তথাপি উহারা সম জাতীয় নহে। এই যে ভেদ, ইহার নাম স্বজাতীয় ভেদ। আবার একটী গাছের ফুল, ফল, পাতা, ডাল সমস্ত, ভিন্ন প্রকারের।

এই যে একটী বৃক্ষের ফুল হইতে সেইই গাছের পাতা ভিন্ন, এই ভেদকে স্বগত ভেদ বলে।

পৃথিবীতে যত বস্তু আছে, সমস্তই এই তিন প্রকারের ভেদ-যুক্ত। কেবলমাত্র এই 'অহম্' এমন একটী বিচিত্র পদার্থ যে ইহার স্বজাতি নাই, বিজাতি নাই, স্বগতও কিছু নাই। অদ্বিতীয় একটীমাত্র সত্তা, এই 'অহম্' ইহার উপমা দিবার মতও কোন বস্তু নাই। সেইজন্য সেই 'অহম্' স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ বর্জ্জিত। দেবীসূক্তের 'অহম্‌টী তাহা হইলে কে?

এই অহম্‌টীই বেদের ব্রহ্ম বস্তু। উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মার স্বরূপের কথা যেখানে যেখানে আছে, সেখানেই আত্মাকে বা ব্রহ্মকে সর্ব্বব্যাপী, দুর্জ্ঞেয়, বৃহত্তম বস্তু হইতেও বৃহৎ, আবার ক্ষুদ্রতম হইতেও সূক্ষ্ম, নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার ও সর্ব্বকারণ-কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দেবীসূক্ত নিজেই ঋগ্বেদের অংশ। ইহাতে এই 'অহম্‌কে' সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা ভাবেই বলা হইয়াছে। সকল উপনিষদে আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঈশ, কেন, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, প্রশ্ন, প্রভৃতি উপনিষদগুলির মধ্যে এই 'অহম্' এর স্বরূপের কথা প্রচুর পরিমাণে আছে এবং সেই সব কথা অভ্রান্ত সত্য কথা; কারণ বেদ অপৌরুষেয়। বেদের উৎপত্তির ইতিহাস ভাবিলেই বেদ যে নিজেই নিজের প্রমাণ এবং তাহাতে সনাতন তত্ত্ব সম্বন্ধে যে ভ্রমশূন্য সত্য কথা আছে, ইহা সহজেই ধারণা হয়। বেদ আমাদের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের পথ-প্রদর্শক বলিয়া তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

"শ্রুতি মাতেব হিতকারিনী।"
শ্রুতি মাতার মত হিতকারী।

মা যেমন নিঃস্বার্থ ভাবে পরম প্রীতির সহিত সন্তানের কল্যাণের জন্য ব্যবস্থা করেন, শ্রুতি বা বেদ জীবের সেইরূপ হিতকারী। বেদে আমরা এই অহম্ এর সন্ধান ব্রহ্মভাবে অনেক স্থলেই পাই। এখন শাস্ত্রে এই অহম্ এর সন্ধান করা যাক্।

একটী তন্ত্র বলিতেছেন—"আত্মা এবাসি মাতঃ।"

অর্থাৎ, হে বিশ্ব-জননি! হে ব্রহ্ম-শক্তি! হে ব্রহ্ম-স্বরূপিনী! তুমিই জগতরূপে আবির্ভূত হইয়াছ। আবার জীবের আত্মা বা অহম্‌ই তুমি। যাহাকে আমি অজ্ঞানে 'আমি' বলি, দিব্য জ্ঞান হইলে আমি দেখিব ও বুঝিব, আমার ছোট আমি নাই, সর্ব্বত্রই সেই একই আমি বা **মা** বিরাজ করিতেছেন। সেইজন্য 'এব' কথা দেওয়া হইয়াছে। **মা! তুমিই আমার আত্মা। তুমিই আমার 'অহম্'**। এখন মা যদি আমার 'অহম্' হন, তাহা হইলে মা যে বস্তু আমার অহম্‌ও সেই বস্তু হইবে। বহুতন্ত্রেই মাকে ব্রহ্মস্বরূপিনী বলা হইয়াছে। মা যদি ব্রহ্ম-শক্তি বা ব্রহ্ম হন, তাহা হইলে এই 'অহম্'ও ব্রহ্ম হইল। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব-আলোচনা আছে। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে নিরাকার ব্রহ্ম-উপাসনায় যাহা ফল, সাকার-উপাসনায় সেই একই ফল! শক্তিমানের উপাসনা ও শক্তির উপাসনা একই বস্তু। **মূলাধার পদ্মের কুলকুণ্ডলিনীই জীবের ইষ্টদেবতা।** সহস্রার পদ্মের পরম **শিবই শক্তিমান ব্রহ্ম**। কুণ্ডলিনী শক্তিকে সুষুম্না পথে ষটচক্র ভেদ করিয়া পরম শিবের সঙ্গে মিলিত করিতে পারিলেই সুধাক্ষরণ হয় ও জীব ধন্য ও কৃত-কৃতার্থ হয়; জীবের

মুক্তি হয়। সুতরাং তন্ত্রের কুণ্ডলিনীই আমাদের দেবীসূক্তের অহম্।

সাংখ্য দর্শনে এই অহম্ বা আত্মার সন্ধান লওয়া যাক্। ২৪টি তত্ত্বকে **প্রকৃতি** বলে। প্রকৃতি জড়। আর ২৪টীর অতিরিক্ত একটি তত্ত্ব আছে, তাহাকে পুরুষ বলে। পুরুষ চিৎবস্তু। তাই পুরুষ নির্লিপ্ত, উদাসীন, সাক্ষী, দ্রষ্টা, **এই পুরুষই দেবীসূক্তের 'অহম্'**।

বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টী পদাথের মধ্যে 'দ্রব্য' বলিতে নয়টী পদার্থকে বুঝায়; যথা—(১) ক্ষিতি (২) অপ্ (৩) তেজঃ (৪) মরুৎ (৫) ব্যোম (৬) কাল (৭) দিক (৮) মন এবং (৯) আত্মা। এই নয়টী পদার্থের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ **আত্মাকে** অক্ষয় জীবাত্মা বলে। এই আত্মাই দেবীসূক্তের অহম্।

ন্যায়দর্শনে প্রমাণ প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, ইত্যাদি ষোলটী বিষয়ের উল্লেখ আছে। সেইগুলি সম্পূর্ণ বোধগম্য হইলে এবং এবং সেই জ্ঞানোপযোগী জীবন যাপন করিলে মোক্ষদ্বারে যাওয়া যায়। আত্মা, দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বাদশটী বিষয়কে প্রমেয় কহে। যে সমস্ত বিষয় আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি তাহাকে প্রমেয় বলে। প্রমেয়গুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয় আত্মা, এই আত্মাই দেবীসূক্তের অহম্।

মহর্ষি জৈমিনির **পুর্ব্বমীমাংসা দর্শনে** বেদের কর্ম্মকাণ্ডের সার আছে। এই দর্শনের মতে কর্ম্ম তিন প্রকার; যথা,—(১) মন্দকর্ম্ম বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম (২) সৎকর্ম্ম বা সকাম কর্ম্ম (৩) ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত কর্ম্ম বা নিষ্কাম কর্ম্ম। নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল নরকাদি দুঃখভোগ। সৎকর্ম্মের ফল,—স্বর্গাদি সুখভোগ, এবং নিষ্কাম কর্ম্মের ফল, মোক্ষলাভ। নিষ্কাম কর্ম্মের সাধকের আত্মাই এই দেবীসূক্তের অহম্।

পাতঞ্জল দর্শনে যোগের সাহায্যে আত্মার মুক্তি কিরূপে ঘটে

তাহারই বিবরণ আছে। জীবাত্মা যখন চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া, বা প্রবৃত্তির বিনাশ করিয়া, পরমাত্মার সহিত একীভূত হয়, সেই অবস্থাতেই মানবত্বে ও ঈশ্বরত্বে সংযোগ হয়। আত্মা দর্শক ; বুদ্ধি দৃশ্য। ক্রমেক্রমে বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া সপ্তম অবস্থায় বুদ্ধি আত্মার সহিত একীভূত হইয়া যায়। সেই সময়েই চিত্তবিমুক্তি ঘটে, আত্মার মোচন হয়। সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ, ও কৈবল্যপাদ এই চারিখণ্ডেই আত্মার কথা আছে। এই মুক্ত আত্মা অবিনাশী দেবী সূক্তের অহম্।

বেদান্ত দর্শনে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। ব্রহ্ম দৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূলীভূত কারণ। বেদান্তের ব্রহ্ম ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। বেদান্তের মায়ার শক্তি সর্ব্বত্র, মায়াই দুঃখের কারণ। ব্রহ্ম যাদুকর, ব্রহ্মের শক্তি মায়া। মায়ায় মিথ্যাকে সত্য দেখায়, রজ্জুতে সর্প ভ্রম করায়। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা অজ্ঞান বা ভ্রান্তি দূর হইয়া যায়। মায়াকে মায়া বলিয়া বুঝিতে পারিলেই মায়ার কার্য্য আর থাকে না। জীব তখন নিজ আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারে। **বেদান্তের আত্মা ও দেবীসূক্তের অহম্ একই বস্তু।**

মহাভারতেও আত্মাকে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম ভাবে বহু স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে।

গীতায় আত্মার কথা রাশি রাশি আছে। আত্মার লক্ষ্মণ যাহা কিছু দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে, সেগুলি সমস্ত ব্রহ্মেরই লক্ষণ। দশম অধ্যায়ে (বিভূতি যোগ) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা ভাবে কথা কহিতেছেন।

অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥

"বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ॥ ৩৭॥
"যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন॥
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাৎ ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯॥
"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥৪২॥

এই বিভূতি যোগ অধ্যায়ের অহম্ ও দেবীসূক্তের অহম্ অভিন্ন। গীতার একাদশ অধ্যায়ের **বিশ্বরূপ** ও দেবীসূক্তের **অহম্** একই বস্তু। অর্জ্জুন বলিতেছেন—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেব-দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূত বিশেষ সঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫॥

আবার অর্জ্জুন ভগবানকে নমস্কার করিতে করিতে যাহা বলিতেছেন তাহা পরমাত্মার স্বরূপের কথা।

"ত্বমাদিদেব! পুরুষঃ পুরাণ
স্ত্বমস্য বিশ্ব পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম।
ত্বয়া ততঃ বিশ্বমনন্তরূপ!॥ ৩৮॥

ভগবান বলিতেছেন যে, সকল রূপের অন্তরালে তাঁর একটী **পরম ভাব** আছে। সেই পরম ভাবটী যে ধরিয়া পূজা, জপ, তপ করিতে

পারিবে, তারই সিদ্ধি নিশ্চিত। বিশ্বরূপ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের অহং যে বস্তু দেবীসূক্তে অহম্‌ও সেই বস্তু।

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্‌ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু—যঃ স **মামেতি** পাণ্ডবঃ! ॥৫৫॥

গীতায় ব্রহ্মভাবে ভগবানের উক্তি অনেক আছে। সুতরাং দেবীসূক্তের 'অহম' এর সন্ধান আমরা গীতায় সহজে এবং প্রচুর পরিমাণে পাই।

এই আত্মাই সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর, সমস্ত রূপের অধিষ্ঠান চৈতন্য। তাই আত্মা ষড়ভাব বিকার বর্জ্জিত—সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, শীত উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অতীত বস্তু। আনন্দ ব্যতীত নিরানন্দ—এই অহম এর ধারে আসিতে পারে না। **ইনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ**।

রুদ্রেভি :—

আমি একাদশ রুদ্র রূপে প্রকাশিত হই। এইরূপে প্রকাশ হওয়াই **আত্মার কার্য্য**। প্রতিকল্পে, প্রতিসৃষ্টিতে, আত্মার কার্য্যই এই। এই অহম্ জগৎ সৃষ্টি করিয়া জড় সৃষ্ট বস্তুর প্রতি অণুপরমাণুতে সূক্ষ্মভাবে প্রবিষ্ট হইলেন সেইজন্য সৃষ্টিকার্য্য সফল হইল।

রুদ্র কে? রুদ্র অর্থে ভীষণ কালকে বা শিব মূর্ত্তিকে বুঝায়। পূজ্যপাদ সায়নাচার্য্য বলেন **যিনি অন্তকালে সকলকে রোদন করাইয়া থাকেন তিনিই রুদ্র**। সুতরাং বিশ্বজগতে সংহার কার্য্য-সাধন ব্যাপারে বাস্তবিক যে একাদশটী রুদ্রের আবশ্যক, সেই একাদশ রুদ্র মূর্ত্তিতে, এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাই প্রকটিত হইয়াছেন। যতক্ষণ মায়ার আবরণে থাকেন ততক্ষণ আমরা রুদ্র ভাবেই রুদ্রকে দেখিব। কিন্তু রুদ্রের স্বরূপটী যখন মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া

দেখিব তখন দেখিব রুদ্র মূর্ত্তিতে এই পরমাত্মাই বিরাজ করিতেছেন। রুদ্রকে **অজ্ঞানে রুদ্র** দেখিব কিন্তু **জ্ঞানে সেই এক অদ্বৈতসত্তা** বা চৈতন্যকেই দেখিব। যাহা সত্য তাহাই দেবীসূক্তে বলা হইল; আমরা সেই সত্য উপলব্ধি করিতে পারি বা না-পারি। ভাগ্যে থাকিলে একদিন এই দেবীসূক্তের 'অহম্' এর সন্ধান আমরা পাইব। **সত্যের সন্ধান পাওয়া সত্যস্বরূপা মা ব্রহ্মশক্তির কৃপাসাপেক্ষ**। বহির্জগতে একাদশ রুদ্রের আবির্ভাব আলোচিত হইল। এখন অন্তর্জগতে একাদশ রুদ্রের সন্ধান করা যাক্। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, এই এগারটী **একাদশ রুদ্র**। রুদ্রের যাহা কার্য্য তাঁরা তাহা বেশ ভালভাবেই করেন। ইঁহারা জীবকে কাঁদাইতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না। জীবকে কিরূপে কাঁদান? এই দশটী ইন্দ্রিয় ও মন জীবকে বিষয়ে আসক্ত করিয়া বার বার জন্ম মৃত্যু পথে তাহাকে ভ্রমণ করায়। যতদিন পর্য্যন্ত এই একাদশটীর অধীনে জীব থাকে তার মুক্তি ততদিন অসম্ভব। সুতরাং ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। যখন জীব ধারণা করিতে পারে যে অন্তরের এই এগারটী বস্তু একাদশ রুদ্র নয়, খণ্ড চৈতন্য নয়, সেই অদ্বিতীয় অখণ্ডচৈতন্যই নাম ও রূপের অন্তরালে রহিয়া এই অভিনয় করিতেছেন, তখনই ভ্রম দূরে যায়, এই দশ ইন্দ্রিয় ও মনের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে। গীতায় আছে—এই 'অহম্'ই মন—

"ইন্দ্রিয়ানাম্ **মনশ্চাস্মি**—" ১০।২২ ॥
ইন্দ্রিয় গণের মধ্যে আমি (পরমাত্মা) মন।

'অহম্' এর সন্ধানে আমরা আজ জিজ্ঞাসুর ভাবে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ আলোড়ন করিব। এই 'অহম্' 'বহু' হইয়াছেন, আমরা সেই

'বহু' ধরিয়া অহম্- তত্ত্বে স্থিতিলাভ করিব, এই আমাদের সাধনা। শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রসন্ন হউন।

বসুভি ঃ—

অষ্টবসু। আমি (পরমাত্মা) অষ্টবসু দেবমূর্ত্তিতে বিচরণ করি। চিরকুমার জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা ভীষ্মদেব বসুগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। শান্তনু ও গঙ্গার উপাখ্যানে ভীষ্মের জন্মের কথা আছে। বেদে বসুগণের যে মূর্ত্তির কথা আছে তাহাতে বসুগণকে দেবতা-শ্রেণীর এক জাতীয় বলিয়া আমরা জানি। আমরা বসুগণের নাম ও মূর্ত্তিতে তাহাদিগকে অন্যান্য দেবতা হইতে বিভিন্ন মনে করি ; কিন্তু অষ্টবসুগণের নাম ও রূপের অন্তরালে যে অধিষ্ঠান চৈতন্য আছেন, তিনিই এই দেবীসূক্তের অহং। অষ্টবসুগণের স্বরূপ যদি আমরা দিব্যচক্ষুতে দেখিতে পাই তাহা হইলে দেখিব যে এই অহং বা আত্মা বসুগণের নাম ও মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। যেমন সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা একাদশ রুদ্ররূপে প্রকাশিত হন সেইরূপ সেই আত্মাই আবার অষ্টবসুরূপে প্রকাশিত হন। জগতে নাম ও রূপ অনন্ত ও বিভিন্ন; কিন্তু সকল নাম ও রূপের বিভিন্নতার মধ্যে একটি অদ্বিতীয় বস্তুকে (আত্মাকে) স্বরূপে অভিন্নরূপে পাওয়া যায়। কোটি কোটি বিভিন্ন মূর্ত্তির আধার স্বরূপে যে চৈতন্য বিরাজমান সেই চৈতন্যই এই দেবীসূক্তের অহং। সুতরাং স্বরূপে আমি (জীব) যে বস্তু, একাদশ রুদ্র যে বস্তু, অষ্টবসুও সেই বস্তু। সেই অবিকারী নিত্যবস্তুটী কি যাহা সর্ব্বত্র রহিয়াছে ? সেই নিত্যবস্তুটী এই দেবীসূক্তের অহং।

এখন **আধ্যাত্মিক রাজ্যে** এই **অষ্টবসুর** সন্ধান লওয়া যাক। **বসু** কথার অর্থ **ধন** বা 'ঐশ্বর্য্য।' সুতরাং সাধন-রাজ্যে অষ্টবসু

কথার দ্বারা যোগমার্গের অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি প্রভৃতি **অষ্ট-বিভূতিকে** ইঙ্গিত করা হইতেছে। এই অষ্টবিধ যোগৈশ্বর্য্যের মূলে সেই অখণ্ড চৈতন্য বা এই দেবীসূক্তের অহং আছেন। চৈতন্যই—অষ্টাঙ্গযোগের বিভূতিরূপে প্রকাশ হন। **যোগৈশ্বর্য্যগুলি আত্মারই**, জড়ের নহে। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমান যেরূপ অভিন্ন, আত্মা ও তাঁহার প্রকাশ শক্তি স্বরূপ উক্ত যোগৈশ্বর্য্যগুলিও সেইরূপ অভিন্ন। **অহমূই অষ্টবিধ যোগৈশ্বর্য্যরূপে প্রকাশ পান**।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে **'বসুদেব'** কথার অর্থে **শুদ্ধ সত্ত্বগুণকে** বলা হইয়াছে। সুতরাং সাধকের অষ্টবসুর উদয় হইলে বা স্বেদ, অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি **অষ্টপ্রকারের সাত্ত্বিকভাবের বহির্লক্ষণ** প্রকাশ হইলে তবে সাধকের আত্মার ঐশ্বর্য্যরূপে আমরা উক্ত সাত্ত্বিকভাবগুলিকে গ্রহণ করিয়া থাকি। **অহংই সাত্ত্বিক-ভাব সকলরূপে প্রকাশিত হন।**

আদিত্যৈঃ—

আমিই দ্বাদশ আদিত্যরূপে প্রকাশ হই। দ্বাদশটি আদিত্যের স্বরূপ এই অহম্। দ্বাদশটী সূর্য্যের অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাই আছেন। সূর্য্যকে আমরা জড় দেখি। কিন্তু ঐ জড় সূর্য্যদেহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তিনি জড় নহেন, তিনি চিৎবস্তু বা আত্মা। এই অহম্ বা আত্মাই সমস্ত জড় বস্তুর মধ্যে নিত্যভাবে আছেন।

আধ্যাত্মিক অর্থ—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার—এই অন্তঃকরণ চারিটি সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণ ভেদে দ্বাদশপ্রকারের হয়; যেমন, সত্ত্ব-

গুণাত্মক মন, রজোগুণাত্মক মন ও তমোগুণাত্মক মন; এই তিন গুণভেদে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার দ্বাদশভাবে খেলা করে। **গুণভেদে ইহারাই দ্বাদশ আদিত্য রূপে প্রকাশিত**।

স্থূল জগতে দ্বাদশ আদিত্য জড় সূর্য্যমণ্ডল কিন্তু তাহাদের অধিষ্ঠান চৈতন্য এই অহম্ বা পরমাত্মা। ধ্যানে, "সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী **নারায়ণ**" আর কেহই নহেন, এই **'অহম্' পরমাত্মা**। যেমন **বহির্জগতে** জড় দ্বাদশ আদিত্যের প্রকাশ, এই 'অহম'এর কার্য্য, সেইরূপ **অন্তর্জগতে** মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহংকার ত্রিগুণে গুণিত হইয়া যে দ্বাদশ প্রকার ভাবে প্রকাশিত হয়, তাহাও চিৎস্বরূপ এই 'অহম্'এর কার্য্য।

বিশ্বদেবৈঃ—

আমি বিশ্বদেবগণের স্বরূপে বিচরণ করি। বিশ্বরূপে প্রকাশিত যে চৈতন্য তাহাই বিশ্বদেব। বহুনাম রূপ ও প্রকাশ ভেদে ঐ চৈতন্যের অসংখ্য ভেদ অনুভূত হয়; সেইজন্য বিশ্বদেব সংখ্যায় অনেক। এই বহু নাম ও রূপে অর্থাৎ বিশ্বদেব মূর্ত্তিতে (আত্মাই) প্রকাশিত হইয়াছে। 'অহম্'ই একমাত্র সৎবস্তু। **বিশ্বজগৎরূপে এই আমিই ব্যক্ত**। সুতরাং **আমি-ময় এই সৃষ্টি 'আমি'রই মত সত্য**। জগৎ প্রপঞ্চের উপাদান কারণ এই 'অহম্' আবার নিমিত্ত কারণও এই 'অহম্'। 'অহম্' ইচ্ছা করিলেন 'বহু' হইব, অমনি সৃষ্টি প্রকাশ। বিশ্বজগতের **সৃষ্টিকর্ত্তা এই 'অহম্'** আবার বিশ্বজগৎ সৃষ্টি কার্য্যের **উপাদানেও এই 'অহম্'** যখন তিনি ব্যতীত সৃষ্টির আদিতে কিছুই ছিল না, তখন সৃষ্টির উপাদান ক্ষিতি, অপ, তেজাদি পঞ্চভূত আসিল কোথা

হইতে? পরমাত্মার অজ্ঞাতসারে সৃষ্টির উপাদান আসিতে পারে না। তিনি সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য। বিশ্বজগৎ তাঁর সত্তায় পূর্ণ রহিয়াছে। এমন স্থান নাই যেখানে তাঁর সত্তা নাই। তিনি-ময় জগৎ।

উপনিষদের প্রাণস্পর্শী বাণী এই সর্ব্বগত পরমাত্মারই কথা বলেন—

"পূর্ণস্য পূর্ণামাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

এই অহম্ই বিরাট দেহের বা বিশ্বজগতের অধিষ্ঠান চৈতন্য আবার বিশ্বজগৎরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। 'অহম্'ই অদ্বিতীয় সত্তা। জড়ের অন্তরালে জড়কে ধারণ করিয়া একটী চৈতন্য আছে। সেই চৈতন্যটীই 'অহম'। আবার যে জড়কে এই 'অহম্' ধরিয়া আছে সেই জড় পদার্থটী কি বস্তু? সেই জড়টী একটী নাম ও রূপ। কাহারও নাম ও রূপ? **এই অহম্ই বা চৈতন্য নামও রূপ ধরিয়া ঐ জড়রূপে ব্যক্ত হইয়াছে**। শ্রীশ্রীগীতায় ভগবানের যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত মূর্ত্তি বা অপরা ও পরা প্রকৃতির কথা আছে, তাহা এই অহম্এরই নাম ও রূপে প্রকাশ হওয়ার কথা। জগৎকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতে হইলে, সত্য বা চৈতন্য জগতরূপে ভাসিয়াছে, এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ইহাকেই শাস্ত্রে **সত্যপ্রতিষ্ঠা** বলে। এই **সত্য প্রতিষ্ঠাই সাধনার মূল,** সিদ্ধির অগ্রদূত।

উপনিষদ বলেন,—

"যদিদং কিঞ্চ তৎসত্যম্।"

(যাহা কিছু জগতে দেখা যায় তাহাই সত্য)।

মিত্র ও বরুণ নামক দেবতাদ্বয়কে 'আমি' ধারণ করিয়া আছি। **সূর্য্যের একটী নাম 'মিত্র'**। সুতরাং জড় সূর্য্যকে সামর্থ্য

প্রদান বা রক্ষা করা এই অহম্ এরই কার্য্য। আমি সাধারণ ভাবে দ্বাদশ সূর্য্য স্বরূপে আছি আবার সেই বারটী সূর্য্যের মধ্যে যে সূর্য্যটী প্রধান তাহার নাম 'মিত্র'। সেই প্রধান সূর্য্যরূপেও এই অহম্‌ই ব্যক্ত হইয়াছেন। 'মিত্র' নামক সূর্য্যের অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে এই অহম্‌ই আছেন।

আবার কোন কোন টীকাকার, **ধর্ম্মকেই মিত্র** বলেন। যেহেতু ধর্ম্ম মৃত্যুর পরও জীবের সঙ্গে পরলোকে যান ও আনন্দ দান করেন; যেহেতু ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে কখনই পরিত্যাগ করেন না, যথার্থ বন্ধুর যাহা কার্য্য ধর্ম্মই তাহা করিতে পারেন, সেইজন্য ধর্ম্মই বন্ধু। 'অহম্'ই **জীবকে শান্তিময় রাজ্যে লইয়া যায়।**

বরুণ—জলাধিপতি। বেদে "মিত্রাবরুণৌ" কথার অর্থ "ধর্ম্মাধর্ম্মৌ" আছে। যদি 'মিত্র' শব্দে ধর্ম্মকে বুঝায়, তবে **'বরুণ শব্দে অধর্ম্মকে** বুঝাইবে।

চৈতন্যই কোন আধারে ধর্ম্মরূপে ফুটেন আবার অন্য আধারে অধর্ম্মরূপে ফুটেন। ধর্ম্মই হউক আর অধর্ম্মই হউক, তাহাদের মূলে একমাত্র এই অহম্ তত্ত্বই আছেন এবং সেই অহম্‌ই ঐ দুই বিপরীত গুণ বিশিষ্ট হইয়া ব্যক্ত হইয়াছেন।

দেবীমাহাত্ম্যে আমরা **ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে বিদ্যা ও অবিদ্যা মূর্ত্তিতে** দেখিতে পাইব এবং সেখানে আলোচনা কালে এই অহম্ এর কথা আরও বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

আমিই বরুণরূপে ব্যক্ত। মনুসংহিতায় আছে—

"**অপ**্এব সসর্জ্জাদৌ" জলই প্রথম সৃষ্টি। পরমাত্মা বহু হইবার ইচ্ছায় জলমূর্ত্তিই প্রথমে ধরিয়াছিলেন। জল জড় তাহার দেবতা

চৈতন্য। বরুণ জলদেবতা সুতরাং চৈতন্য। আমিই জলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বা চৈতন্য।

ইন্দ্রাগ্নী—আমি ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। ইন্দ্র ও অগ্নি নাম ও রূপে পরস্পর ভিন্ন কিন্তু স্বরূপে চৈতন্য বা 'অহম্' বলিয়া তাহারা অভিন্ন। ইন্দ্র দেবরাজ। অগ্নিমুখে দেবতারা হোমের সময়ে আহার করেন। এই ইন্দ্র ও অগ্নি দুইটী খুব বড় দেবতা।

আবার 'ইন্দ্র' কথার অর্থ **সুখ** ও 'অগ্নি' কথার অর্থ **দুঃখ**। সুতরাং ইন্দ্রাগ্নী কথায় 'সুখ দুঃখ' বুঝায়। আমি **স্থূলে ইন্দ্র ও অগ্নি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবতা হই; আবার সূক্ষ্মে জীবের সুখ দুঃখ রূপে প্রকাশ পাই**। যখন জীব সুখী হইয়া থাকে, তখন 'আমি'ই তাহাকে সুখরূপে দেখা দিই আবার যখনজীব দুঃখী হয়, তখন 'আমি'ই তাহাকে দুঃখরূপে দেখা দিই।

অশ্বিনৌ—অশ্বিনীকুমারদ্বয়। স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবতারূপে 'আমি'ই প্রকাশিত। উভয়াত্মক দেবতা।

সূক্ষ্মে, অশ্বিনীকুমার অর্থে 'প্রাণ ও অপান' বায়ুকে বলে।

অহমই সাধকের নিকট 'প্রাণ ও অপান' বায়ু মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়। **প্রাণই যে অহম্**—একথা ছান্দোগ্য উপনিষদে খুব বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে। প্রাণ ও অপান বায়ুর সমতার উপর যোগ মার্গের সমস্ত নির্ভর করিতেছে। শ্রীগীতায় আছে "**প্রাণাপানৌ সমেকৃত্বা**—" যে প্রাণ ও অপান বায়ু যোগীর বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় সেই প্রাণ ও অপান বায়ুরূপে 'আমি'ই জীবের মঙ্গলের জন্য প্রকাশিত হই। প্রাণ ও অপান বায়ুর স্বাভাবিক কার্য্য জীব-দেহ-রক্ষা। **আমিই প্রাণ ও অপান বায়ুরূপে জীবকে রক্ষা করি**। জীব

আমার সংবাদ রাখে না। আমি তার নিশ্বাস প্রশ্বাস রূপে থাকিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিলেও সে এই 'অহম্' এর দিকে দৃষ্টি করে না। আবার যখন যোগের সাহায্যে জীব এই প্রাণ ও অপান বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তদ্বারা যোগৈশ্বর্য্য লাভ করে, তখন এই অহমই তাহার নিয়ন্ত্রিত প্রাণ ও অপান বায়ুরূপে ব্যক্ত হইয়া জীবের অভীষ্ট পূরণ করে।

এই দেবীসূক্তের 'অহম্' নানারূপ ও নানা নাম ধরিয়া 'এক' হইতে 'বহু' হইয়াছেন। আমরা এই 'বহুর' মধ্যে বিরাজিত একটী মাত্র অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মারই সন্ধান পাইব। নাম ও রূপ ধরিয়া সাধনার প্রথম স্তর গঠিত। উপাসনায় সিদ্ধি হইলে সকল নাম ও রূপের অন্তরালে এই একটী মাত্র সত্তা বা এই অহম্‌কে দেখিব। **অহম্ নাম ও রূপে ভাসিয়াছে** আবার **সমাধিতে নাম ও রূপ ডুবিয়া যাইলে এই অহম্ই একমাত্র ভাসিয়া থাকে।**

মন্ত্র

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্ম্যহং ত্বষ্টারমুত
পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে
যজমানায় সুন্বতে ॥২॥

অনুবাদ

আমি (পরমাত্মা) বেদোক্ত রীতি অনুযায়ী অভিষবনীয় সোমযাগকে বা শত্রুহন্তা সোম দেবতা, ত্বষ্টা, পূষা ও ভগ (সূর্য্য) নামক

দেবতাগণকে ধারণ করিয়া আছি। যে যজমানের উত্তম ও প্রচুর আহুতির উপযুক্ত দ্রব্য আছে, যে ব্যক্তি দেবগণকে উত্তম আহুতি দ্রব্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে, এবং যজ্ঞে বিধি অনুসারে সোমরস প্রস্তুত করে, যেই যজমানের যজ্ঞফল আমি ধারণ করি (পরিপুষ্ট করি)।

আলোচনা

বেদে অনেক প্রকার যজ্ঞের কথা আছে। যে যজ্ঞের যেরূপ বিধি বেদে আছে সেই বিদি অনুসারে সেই যজ্ঞ সম্পাদন হইলে তবে যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞেব ভিন্ন ভিন্ন ফল বেদে বর্ণিত আছে। যজ্ঞের ফলে পুণ্য হয়, সেই পুণ্যে মৃত্যুর পর জীবের স্বর্গে বাস হয়; কিন্তু সেই পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে আবার মর্ত্তলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে অনুরূপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সেইজন্য যজ্ঞকে সকাম কর্ম্ম বলে। সকাম কর্ম্মের ফল নশ্বর, অস্থায়ী ও অনিত্য। নিষ্কাম কর্ম্মের ফল স্থায়ী, নিত্য ও অবিনশ্বর। সকাম পুণ্যকর্ম্মের ফল কিছুকালের জন্য স্বর্গবাস। **নিষ্কাম কর্ম্মের ফল, মোক্ষ**।

সোম—সোম নামক যজ্ঞকে আমি (পরমাত্মা) ধারণ করিয়া আছি। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্‌দেবী আত্মদর্শন করিয়া পরমাত্মাভাবে বলিতেছেন। বেদবিধি অনুসারে সোমরস প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা সোমযাগ অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞমূর্ত্তি আমি। সুতরাং সোমযাগকে আমি চৈতন্যরূপে ধরিয়া থাকি। আমি যখন আমার সৃষ্টির প্রতি অণু পরমাণুতে আধাররূপে থাকিয়া সৃষ্টি ধরিয়া আছি, তখন সোমযাগও আমার সৃষ্টি বলিয়া আমার আধারে সেই যজ্ঞ দাঁড়াইয়া আছে। বিশ্বজগতের নিমিত্ত কারণও আমি এবং উপাদান কারণও আমি।

সৃষ্টবস্তু যাহা কিছু সমস্তই আমাকে অবলম্বন করিয়া বজায় আছে। আমার সৃষ্টি মধ্যে উৎকৃষ্ট পদার্থ সমূহে আমার বেশী 'বিভূতি বা আমার সত্তার বিশেষ প্রকাশ আছে। শ্রীশ্রীগীতার 'বিভূতিযোগ' অধ্যায়ে এই তত্ত্বটি বেশ ভাল করিয়া বুঝান আছে। এখন সাধারণ জীবসমূহের মধ্যে বেদজ্ঞ নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য ব্রাহ্মণ নারায়ণ। ভগবান নিজে শ্রীমুখে বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণঃ মামকী তনুঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আমার শরীর। **সকাম কর্ম্মের মধ্যে যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য ভগবান যজ্ঞমূর্ত্তি।** সোমযাগের ফল প্রচুর পুণ্য। সেইজন্য সোমযাগকে আমি ধারণ করি বা পুণ্য উৎপাদনে সামর্থ্য প্রদান করি।

সোম—'সোমের' যজ্ঞের নাম ব্যতীত আর একটি অর্থ আছে তাহা চন্দ্র দেবতা'। আমি সোমকে ধারণ করিয়া আছি। কিরূপ সোম? স্বর্গলোকবাসী দেবতা। আর কিরূপ? শত্রুহন্তা। চন্দ্রদেব যে স্বর্গের দেবতা হইয়া বাস করিতেছেন, তাহা কেবলমাত্র আমারই শক্তিতে। তিনি যে আবার এক সময়ে যুদ্ধে জয়ী হইয়া দেবতাদের শত্রু অসুরদের নিধন করেন, তাহাও চন্দ্রের নিজের শক্তিবলে নহে, কেবল আমারই শক্তিতে তাহা চন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। যে সোম এখনও অসুর বিজয়ী বলিয়া খ্যাত, সেই সোমকে আমি শক্তি-সঞ্চার করিয়াছিলাম। পবমান সোম, অত্রির ঔরসে অনুসূয়ার গর্ভে উৎপন্ন। ইনি **বৈদিক দেবতা**।

বিভর্ম্মি—(১) ধারণ করি বা (২) সামর্থ্য প্রদান করি, বা (৩) রক্ষা করি। এই তিন প্রকারের অর্থই দেবীসূক্তের ব্যাখ্যায় প্রয়োজন।

আধ্যাত্মিক অর্থ

সোম—চন্দ্র। মনের অধিপতি দেবতা। কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে যখন এই মন দমন করে, তখন সেই মন শত্রু-হন্তা হন। জীবের মনকে আমিই ধারণ করিয়া আছি। শ্রীগীতায় আছে "ইন্দ্রিয়াণাম্ মনশ্চাস্মি" (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি (পরমাত্মা) মন। মনকে সূক্ষ্ম জড় বলে। একদিকে স্থূলদেহ ও ইন্দ্রিয়াদি (জড়) আর একদিকে নির্ব্বিকার আত্মা (চিৎবস্তু)। এই চিৎ ও জড়ের মাঝখানে আছেন এই মন। ইনি জড় ও চিৎ উভয়েরই প্রকৃতি কিছু কিছু কম বেশী পাইয়াছেন। সেইজন্য **মনকে সূক্ষ্ম দেহ** বলে। স্বপ্নে এই মনেরই তাণ্ডবলীলা আমরা দেখিতে পাই। ন্যায়শাস্ত্রে মনকে একটী অনির্ব্বচনীয় বস্তু বলিয়াছে। মনের অদ্ভূত ক্ষমতা। পরমাত্মার বিশেষ শক্তিতে শক্তিমান হইয়া মন জড় হইয়াও চৈতন্যের মত প্রকাশিত হয়। স্বপ্নের সৃষ্টি মনের কার্য্য। স্বপ্নে সূক্ষ্ম জগৎ দর্শন হয়। স্বপ্নের স্রষ্টা এই মন; আবার দৃশ্যও এই মনের সৃষ্টি। মন জীবের সংস্কারের আধার। উপনিষদ বলেন—**"মনঃ এব মনুষ্যানাম্ কারণম্ বন্ধ-মোক্ষয়োঃ"** অর্থাৎ মনই মানুষের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। মন যদি ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়া নিত্য বহির্মুখ থাকে, তবে সেই মন জীবকে আসক্তির বন্ধনে বদ্ধ করিয়া সংসার-চক্রে ঘুরাইয়া বারবার জন্মমৃত্যু ভোগ করায়। আবার এই মন যদি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া আত্মাভিমুখী বা অন্তর্মুখী হয়, তবে সেই বিষয়সঙ্গ-বর্জ্জিত মন জীবকে মোক্ষ প্রদান করে।

যখন এই মন জীবের বন্ধনের কারণ হয়, তখন সে অশুদ্ধ মন। ঐ মন ইন্দ্রিয়ের দাস হয় বলিয়া আসুরিক ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে।

আবার যখন এই মন অন্তর্মুখী হয় তখন সে দেবভাবাপন্ন হয় ও জীবের মোক্ষের কারণ হয়। মন তখন সংযমী হইয়া ইন্দ্রিয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করে; সেইজন্য তাঁহার নাম শুদ্ধমন। শুদ্ধমন কামক্রোধাদির অধীন হয় না পরন্তু তাহাদের দমন কর্ত্তা; সেইজন্য তাহাকে "শত্রুহন্তা সোম" বলে।

শুদ্ধমন, দেবতা। অশুদ্ধমন, অসুর।

ত্বষ্টা—কশ্যপ ঋষির ঔরসে অদিতির গর্ভে উৎপন্ন। কশ্যপের ষষ্ঠ পুত্র। **বিশ্বকর্ম্মার আর একটি নাম ত্বষ্টা**।

যে চৈতন্য বিশ্ব-জগৎ নির্ম্মাণ করেন, তিনিই ত্বষ্টা। ইনি আবার হিরণ্যগর্ভরূপে নাম ও রূপ ফুটাইয়া সমস্ত সৃষ্টিকার্য্য সফল করেন। আমি (পরমাত্মা) ত্বষ্টারূপে বিশ্ব গঠন করি। আমার ত্বষ্টা মূর্ত্তির সন্ধান পাইলে, সেই মূর্ত্তির অন্তরালে আমারও সন্ধান, জীব পাইবে, এইজন্য বলিতেছি আমি ত্বষ্টাকে ধারণ করিয়া আছি।

পূষা—কশ্যপ ঋষির সপ্তম পুত্র। অদিতির গর্ভে উৎপন্ন। বৈদিক দেবতা। চৈতন্য যে নাম ও রূপ ধরিয়া পুষ্টিসাধন করেন, তিনিই পূষা। যে চৈতন্য জীবের **দেহের মনের পুষ্টিরূপে** প্রকাশিত হয়, তিনিই **পূষা** দেবতা।

জীবে পুষ্টিরূপে **আমিই** প্রকাশিত। পোষণ কর্ত্তা আমি ছাড়া আর কেহ নাই!

ভগ—অদিতির গর্ভে কশ্যপের দ্বাদশ পুত্র। বৈদিক দেবতা। ভগ শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য বা শ্রী। ভগবানকে সেইজন্য শাস্ত্রে বলে ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ ভগবান। ভগ+বতুপ্=ভগবান।

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইত্যঙ্গনা॥"

ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টী ভগ বা ঐশ্বর্য্য যাহার আছে, তিনিই ভগবৎ-পদ-বাচ্য। যে **চৈতন্য ঐশ্বর্য্যরূপে প্রকাশিত** হন, তিনিই ভগ দেবতা।

অহং যজমানায় দ্রবিণং দধামি—আমিই যজমানের যজ্ঞ-ফল পরিপুষ্ট করিয়া থাকি। বেদবিধি অনুসারে নিষ্ঠাবান কর্ম্মী হবিঃ প্রভৃতি উপচারের দ্বারা দেবতাদের উদ্দেশে যে সমস্ত যজ্ঞ, হোম, পূজাদি কর্ম্ম করেন, ঐ সকল বিহিত কর্ম্মের ফলরূপে আমিই প্রকাশিত হই। সকাম কর্ম্মের ফল স্বর্গভোগাদিরূপে আমিই প্রকাশ পাই। আবার নিষ্কাম কর্ম্ম যাঁহারা করেন, তাঁহাদের "মুক্তি" ফলরূপেও **আমি** প্রকাশিত।

পূজ্যপাদ সায়নাচার্য্য ব্রহ্মের কর্ম্মফল-দাতৃত্বই ব্যাখ্যায় সমর্থন করিয়াছেন। জীবের কর্ম্মের ফলদাতা **আমিই**। আমি সব সাজিয়াছি। যজ্ঞ আমারই একটা মূর্ত্তি-বিশেষ। যজ্ঞের ফল আমিই জীবকে দিই। জীবের কর্ম্মানুসারে তাহার ভবিষ্যৎ গতি হয়। পুণ্যকারীর সুখভোগ হয় আবার পাপীর দুঃখভোগ হয়। জীব সকাম বা নিষ্কাম, নিষিদ্ধ বা বৈধ, যে কোন প্রকার কার্য্য করুক না কেন, তাহার ভাবী ফল তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে। অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটী জীব আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিতে জন্ম লইতেছে আবার মরিতেছে। ভূ র্ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোকে ভ্রমণ করা জীবের বন্ধ হইতেছেনা। এই কোটী কোটী জীবের কর্ম্মফল-বিভাগের কর্ত্তা কে? কে এই অসংখ্য জীবকুলকে কর্ম্মানুসারে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন? পুণ্যবানকে কে স্বর্গভোগের ব্যবস্থা করিতেছেন? পাপীর জন্য যাতনাময় নরকে বাস কাহার ব্যবস্থা? কে তিনি? কেমন তিনি? চক্ষুর অগোচরে

থাকিয়া কি আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় তিনি ফলদাতারূপে দিতেছেন! এই ফলদাতা ভগবানের সন্ধান করিতে কত সাধক আজীবন প্রাণপণ করিতেছেন। সেই চৈতন্যের সংবাদ শাস্ত্রমুখে, ও গুরুমুখে শুনিয়া সাধক সচ্চিদানন্দের সত্তা উপলব্ধি করিতে একাগ্র হইয়া থাকেন। তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার বহু উপায় আছে। অনেক ভাব ধরিয়া তাঁহাকে ধরা যায়। শ্রীগীতায় আছে—

"কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্তোঽসি ভগবন্ ময়া।"

ফলদাতা-রূপে তাঁহাকে চিন্তা করা, তাঁহাকে ধরিবার নানা উপায়ের মধ্যে একটী উপায়। সাধনার রহস্য এই ভাব ধরিয়া থাকার অভ্যাসে প্রকাশ পায়।

শ্রীশ্রীচণ্ডী আমাদের সাধন-মার্গের সহায় হউন।

মন্ত্র

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা
যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরি স্থাত্রাং ভূর্য্যা-
বেশয়ন্তীম্ ॥৩॥

অনুবাদ

আমিই জগদীশ্বরী। আমিই ধনদায়িনী। আমিই ব্রহ্ম-চৈতন্য-স্বরূপা বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকাররূপা জ্ঞানময়ী। যজ্ঞের প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলির মধ্যে আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এইরূপ গুণশালিনী আমি প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে আছি। আমি ভূরিভাবে অনন্ত জীবগণে প্রবিষ্টা হই। দেবতাগণ এইরূপে আমাকে বহুভাবে উপাসনা করিয়া থাকে।

আলোচনা

রাষ্ট্রী—ঈশ্বরী। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা সিদ্ধা বাক্‌দেবী পরমাত্মাভাবে কথা কহিতেছেন। পরমাত্মাই জগতের কর্ত্রী। শ্রীগীতায় এই **অহম্‌ই** পরমাত্মাভাবে ঠিক এই কথাই বলিতেছেন:—

"গতির্ভর্ত্তা **প্রভুঃ** সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্।" (৯ম অধ্যায়।) **পরমাত্মাই প্রভু** বা নিয়ন্তা বা ঈশ্বর। এই ঈশ্বরের অন্য নাম সগুণ ব্রহ্ম। সৃষ্টি রক্ষা করিতে হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণিকুল জড় পদার্থ সমুদয়কে ঠিক নিয়মে চালাইবার জন্য পরমাত্মাকে নিয়ন্তাভাবে লীলা করিতে হয়। প্রভু থাকিলে দাসকে যেমন আদেশ দিয়া ভাল কর্ম্মসকল করাইয়া লন, এবং দাসের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করেন, পরমাত্মাও সেইরূপ সমস্ত জগতবাসীর ও জগতস্থ পদার্থের প্রভু বা নিয়ন্তা বা ঈশ্বর। জীব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকায় নিজেকেই নিজের কর্ত্তা মনে করে। পরমাত্মাই যে আসল কর্ত্তা তাহা অনুভবে আনিতে পারে না। পরমাত্মা যদি সমষ্টিভাবে সমস্ত জগতের কর্ত্তা হন, তবে জগতের মধ্যে জীব সমূহ থাকায় ব্যষ্টিভাবেও প্রত্যেক জীবের কর্ত্তা; সুতরাং তিনিই জীবের চালক বা নিয়ন্তা। **তিনিই জীবকে কর্ম্মানুসারে চালাইতেছেন।** শ্রীগীতায় তাঁর এইরূপ কর্ত্তৃত্বের কথা আছে। **জীব নিমিত্ত মাত্র**

যথা:—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" ১৮৷৬১

ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জীব বুঝিতে পারে যে, জীব ও জগতের নিয়ন্তা একজন আছেন, এবং তিনিই পরমাত্মা। বাক্‌দেবীও যথন

ব্রহ্মজ্ঞানযুক্তা হইলেন তখন তিনিও এই সত্যটী দেখিয়া ও বুঝিয়া বলিলেন, **পরমাত্মাই জগতের ঈশ্বর**।

জীব ভগবানের সৃষ্ট বস্তু। **মহামায়ার দৈবী মায়ায় জীব সৃষ্টিকর্ত্তার কথা ভুলিয়া যায়**। ভ্রান্ত হইয়া জীব নিজেকেই নিজের কর্ত্তা মনে করে। কিন্তু জীবের এইরূপ ভ্রমের ফলে ভগবানের সর্ব্বকালের কর্ত্তৃত্ব মুছিয়া যায় না। তিনিই সর্ব্ব-কারণ-কারণ,—এই সকল কথা শাস্ত্রেরই উপদেশ। তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাষ্ট্রী। পরমাত্মাকে দেবীভাবে বা মাতৃভাবে বলা হইতেছে বলিয়া "স্ত্রীলিঙ্গ" রাষ্ট্রী শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

বসূনাম্ সংগমনী—ধনানাম্ সঙ্গময়িত্রী, উপাসকানাং প্রাপয়িত্রী। আমি (পরমাত্মা) আমার উপাসককে প্রার্থনা অনুসারে ধন প্রদান করি। ধনদায়িনী আমিই। সমস্ত জগতের অধীশ্বরী বলিয়া জগতস্থ সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক একমাত্র আমিই প্রসন্না হইয়া যতক্ষণ না জীবকে আমার অক্ষয় ধন ভাণ্ডার হইতে ধন প্রদান করি, ততক্ষণ জীব সহস্র চেষ্টা করিয়াও ধন পায় না। আমি যখন জীবের নিয়ন্তা, তখন কাহার ভাগ্যে ধন মিলিবে কাহার ভাগ্যে ধন মিলিবে না, এ বিচারও ব্যবস্থা একমাত্র আমিই করিয়া থাকি। কোটি কোটি জীব সংসারে ধন লাভের আশায় কত প্রকারের কর্ম্ম করিতেছে, কিন্তু সকলে কি সফল মনোরথ হইতেছে? ভ্রান্ত জীব বলে, "স্ত্রীভাগ্যে ধন"। চক্ষের সম্মুখে জীব যখন মূল কারণ আমাকে দেখিতে না পায়, তখন যা তা বলে। স্ত্রীর ভাগ্যেই যদি জীবের ধন প্রদত্ত হইত, তবে স্ত্রীই জীবের ধন প্রাপ্তির কারণ হইত। কিন্তু নরনারী উভয় প্রকার জীবই যখন আমার সৃষ্টি, তখন একটী নারী একটী নরের ভাগ্যবিধাতা কেমন করিয়া হইবে?

দেবীসূক্তের প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, আমিই (পরমাত্মা) অষ্টবসুরূপে প্রকাশিত। অষ্টবসু অর্থে অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য। অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি আট প্রকারের পার্থিব ধন,—স্বর্ণ, রৌপ্য, গো, ভূমি প্রভৃতি ও অপার্থিব ধন, জ্ঞান, বৈরাগ্য, মুক্তির ইচ্ছা প্রভৃতি। প্রথম মন্ত্রে আমিই পার্থিব এবং অপার্থিব ধনরূপে প্রকাশিত—এই কথা বলা হইয়াছে। এখন তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইতেছে যে সেই ধনরূপে প্রকাশিত আমিই আমার ভক্তকে সেই পার্থিব এবং অপার্থিব এই দুই প্রকারের ধন দান করি। আমার উপাসক পার্থিব এবং অপার্থিব উভয় প্রকারের ধন আমারই কৃপায় প্রাপ্ত হয়। অতএব আমিই **সর্ব্ববিধ** ধনদায়িনী।

আমি যে জগতের প্রতি বস্তুর প্রতি অণুপরমাণুতে বিরাজ করিতেছি এই সত্য-সংবাদ দেবীসূক্তের আটটি মন্ত্রের প্রত্যেক মন্ত্রেই ঘোষিত হইতেছে। আমিই রাষ্ট্রী বা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রী। আমিই **ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি** আবার জীবকে সেই ঐশ্বর্য্য **প্রাপ্ত করাই** আমিই।

চিকিতুষী—চিকিতুষী শব্দের অর্থ 'ব্রহ্মজ্ঞান।' আমিই ব্রহ্মচৈতন্য-স্বরূপা। যে জ্ঞান দ্বারা জীব আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে সেই জ্ঞানস্বরূপা আমিই (পরমাত্মা)। **জীবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য আত্মদর্শন করা**। আত্মদর্শন করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় ; যেহেতু আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মার সাক্ষাৎকার হইলেই জীবের জ্ঞান পূর্ণ হয়। সর্ব্বপ্রকার অভাব, শূন্যতা ও অপূর্ণতায় ভরা জীবের মন সমাধিতে চৈতন্য বস্তু আত্মাতে ডুবিয়া যাইলে, অহং জ্ঞান সম্পূর্ণ মুছিয়া যাইলে, জীবের সংস্কার সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইলে, জীবের হৃদয় সর্ব্বপ্রকারের পূর্ণতায় ভরিয়া যায়। আত্মার চিন্তা করিতে করিতে মন যখন আত্মার ভাবে তন্ময়

হইয়া যায়, আত্মার স্পর্শে সূক্ষ্ম জড় মন চৈতন্যরূপ আত্মার ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। **মন আত্মার উপাসনায় আত্মাময় হইয়া যায়।** যখন এইরূপে মন আত্মার ধর্ম্ম পায় বা জীবের **অশুদ্ধ মনের নাশ** হয় তখনই জীবের আত্মদর্শন হয়। শাস্ত্রে আত্মদর্শন কথার অর্থ—**আত্মা হইয়া যাওয়া।** সুতরাং যে জ্ঞান দ্বারা জীব শিব হইতে পারে সেই জ্ঞানকেই চিকিতুষী বলে। দেবীসূক্তের আমিই সেই ব্রহ্মজ্ঞানরূপা।

আমিই ব্রহ্ম, পূর্ণ, আবার আমিই সৃষ্টিলীলায় জীবচৈতন্য। **আমি পূর্ণ হইয়াও অপূর্ণরূপে জীবদেহে খেলা করি। অপূর্ণের ভাণকারী আমি উপাসক** সাজি এবং **পূর্ণ আমি উপাস্য** সাজি। অপূর্ণ আমি পূর্ণ আমির সহিত মিলিতে চায় সেই উপাস্য উপাসকের মিলন আমিই সম্পাদন করি। যতদিন সৃষ্টি থাকে ততদিন আমিই এই তিনভাবে লীলা করিয়া থাকি। যে জ্ঞানমূর্ত্তিতে আমি এই অপূর্ণ জীবকে পূর্ণব্রহ্মের সঙ্গে মিশাইয়া দিই আমার সেই ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপা চিন্ময় মূর্ত্তিকে এই মন্ত্রে চিকিতুষী বলিয়াছে। জীবের **জ্ঞানও আমি জ্ঞাতাও আমি** এবং **জ্ঞেয়ও আমি।** আমিই **ত্রিপুটী।** আমিই এই তিন মূর্ত্তিতে সাধকের সম্মুখে দাঁড়াই। সাধক আমার শরণাগত হইয়া সাধনমার্গে থাকিলে আমিই তাহাকে আমার অহেতুকী করুণার দ্বারা কৃতার্থ করিবার জন্য আমার ঐ তিন মূর্ত্তি সরাইয়া **একটী মাত্র মূর্ত্তিতে** বিরাজ করি। যতক্ষণ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বা দ্রষ্টা ও দৃশ্য থাকিবে ততক্ষণ জ্ঞানকার্য্য বা দর্শনকার্য্য থাকিবে। **সমাধিতে** যখন জ্ঞাতা (মন) জ্ঞেয় বস্তু আত্মাতে মিশিয়া যায়, একীভূত হইয়া যায়, লুপ্ত হইয়া যায় তখন জ্ঞানের কার্য্যও লোপ পায়। জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞান জন্মিবে কার? এই মন্ত্রে যে জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাতা এইরূপে জ্ঞেয় বস্তুতে

সমাধিকালে আপনাকে হারাইয়া ফেলে সেই ব্রহ্মজ্ঞান-স্বরূপাই যে আমি একথা বলা হইয়াছে।

প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্—যজ্ঞার্হানাম্ মুখ্যা। যজ্ঞের যতগুলি অঙ্গ আছে তাহাকে যজ্ঞাঙ্গ বলে। যাহা না হইলে যজ্ঞ হয় না সেই সকলের মধ্যে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। যজমান, যজ্ঞীয় দ্রব্য এবং যজ্ঞের দেবতা, আমি এই কয়টী যজ্ঞের প্রধান উপাদানরূপে বিরাজ করি। যে হেতু আমি সর্ব্বব্যাপী, আমি প্রধান অপ্রধান, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল পদার্থরূপেই প্রকাশিত হই। জগতের প্রধান বা শ্রেষ্ঠ বস্তুরূপে আমার যে প্রকাশ তাহাই আমার বিশেষ প্রকাশ। আমার এই বিশেষ প্রকাশের কথা যেমন এই মন্ত্রে বলা হইতেছে সেইরূপ শ্রীগীতায় বিভূতি যোগ অধ্যায়েও বিশদরূপে বলা হইয়াছে।

"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ" ॥

১০ম অধ্যায়।

যত প্রকারের যজ্ঞ আছে সকল যজ্ঞই পশু-বধের জন্য হিংসা-দোষ-দুষ্ট। জপরূপ যজ্ঞ কেবলমাত্র হিংসা-দোষ-দুষ্ট নহে। সেইজন্য হিংসাবহুল যজ্ঞ সমূহের মধ্যে **হিংসাদি-রহিত জপরূপ যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ**। আমিই শ্রেষ্ঠ বস্তু জপরূপযজ্ঞরূপে প্রকাশিত হই। পর্ব্বতসমূহের মধ্যে হিমালয় শ্রেষ্ঠ। আমিই সাধারণভাবে সকল পর্ব্বতে বিরাজ করিতেছি। কিন্তু আমার বিশেষ প্রকাশ শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত হিমালয়ে। সাধক আমার বিশেষ বিভূতিপ্রকাশস্বরূপ হিমালয় দর্শন করিলে আমার কথা স্মরণ করে। আমার বিশেষ প্রকাশের স্থান দর্শন করিলে আমার ভাবের **উদ্দীপনা** সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়।

"প্রথমা" কথার অর্থ 'মুখ্যা' বা 'প্রধানা' করিলে যাহা বোধগম্য হয় তাহা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিলাম।

"প্রথমা" কথার অর্থ যদি "আদি" ধরা যায় তাহা হইলে কি বুঝি এখন আলোচনা করিব। যজ্ঞাদি যত প্রকারের উপাসনা আছে সকল প্রকার উপাসনার আদিতে আমি (পরমাত্মা) বিরাজ করি। এই চিকিতুষী বা ব্রহ্মজ্ঞানই সমস্ত উপাসনার আদি। যজ্ঞাঙ্গ সমূহের মধ্যে এই জ্ঞানই প্রথম। আমির স্বরূপ সামান্যভাবে ধারণা করিয়া যজ্ঞাদি কার্য্য করিতে হয় নচেৎ সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড অবৈধ হইয়া যায়। শ্রদ্ধা ও ভক্তি না থাকিলে যজ্ঞাদি কোন উপাসনা আরম্ভ করিয়া সফলকাম হওয়া যায় না। যদি জীবের **ভক্তি ও শ্রদ্ধা আদিতে** না থাকিল তবে উপাসনা কার্য্যই পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে। সুতরাং উপাসনার আদি কর্ম্মকাণ্ডের মূলীভূতজ্ঞানরূপে আমিই বিরাজ করি। **উপাসনার আদিতে আমি** না থাকিলে জীব ধীরে ধীরে **উপাসনার অন্তে** জীবের ইষ্ট-মূর্ত্তিরূপে আমাকে পাইবে কি প্রকারে?

ভূরি স্থাত্রাং।—বহুভাবেন প্রপঞ্চাত্মনা অবতিষ্ঠমানাম্। বহুভাবে অবস্থিত আমি।

ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্।—বহুভাবে প্রবিষ্ট আমি। সমস্ত প্রাণীতে অবস্থিত আত্মাকে আমিই জীবভাবে প্রবিষ্ট করাই।

তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা—পুরুত্রা শব্দের অর্থ "বহুদেশে"। এই প্রকার গুণশালিনী আমি বহুভাবে অনন্তকোটী জীবসমূহের মধ্যে জীবভাবে প্রকাশিত হই। দেবতারা বা উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ আমাকেই এই অনন্ত বৈচিত্রপূর্ণ জীব জগতরূপে প্রকাশিত বলিয়া ধারণা করিতে পারে এবং সেই ধারণা অনুসারে বহুভাবে

আমাকেই উপাসনা করিয়া থাকে। সেই দেবগণ বিশ্বজগতে যেখানে যাহা দেখে তাহাই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকে। অতএব দেবগণ এই প্রকার উপাসনায় যাহা যাহা করেন সেই সমস্ত উপাসনাই আমাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন সাধক যখন প্রতি বস্তুতে সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে তখন তাহার আত্মাময় জগৎ দর্শন হয়। সেইভাবে জগৎ দর্শন করিলে বহুভাবেস্থিত আমাকেই দেখা হয়। **সমস্ত জগৎ আমারই মূর্ত্তি।** সেইজন্য আমাকে প্রত্যেক পদার্থের অন্তরালে জানিয়া, জগতের সকল পদার্থকে আমারই একটী বিশিষ্টরূপ বুঝিয়া, সাধক যখন এইভাবে উপাসনা কার্য্য করে তখন তাহার সকল উপাসনাই আমাকে লক্ষ্য করিয়া করা হয় বলিয়া সার্থক হয়। শ্রীগীতাতেও এই কথা আছে ঃ—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৯।২৩

সমস্ত দেবতামূর্ত্তিই পরমাত্মা। জীব যখন ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে একমাত্র পরমাত্মারই এক একটি মূর্ত্তি ধারণা করিয়া **পরম ভাবটীর** দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা করে তখন তাহার সমস্ত উপাসনাই একমাত্র পরমাত্মার উপাসনাতেই পরিণত হয়। মূর্ত্তি ভিন্ন হইলে কি হইবে? স্বরূপে দেবতাগণ সেই এক সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা। কিন্তু যাহারা সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপে লক্ষ্য না রাখিয়া দেবতাগণ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বস্তু অথবা দেবতাগণ মূর্ত্তিভেদে পরস্পর ভিন্ন এই বুদ্ধিতে উপাসনা করে তাহারাও সেই পরমাত্মারই উপাসনা

করে কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বক করে না বলিয়া তাহাদের উপাসনা অবিধিপূর্ব্বক করা হয়।

সাধক বিশ্বজগতে যখন প্রত্যেক জড়বস্তুতে চিৎস্বরূপ আত্মার সন্ধান পায় তখন তাহার সকল কর্ম্মই প্রকারান্তরে সেই পরমাত্মারই উপাসনারূপে গণ্য হয়।

শ্রীশ্রীদেবী চণ্ডিকার কৃপায় আমাদেরও সেইভাবে উপাসনার সূচনা হউক।

মন্ত্র

ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি, যঃ প্রাণিতি য ঈং
শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং
তে বদামি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ

যে জীব অন্নাদি ভক্ষণ করে, তাহার ভোজনক্রিয়া আমারই দ্বারা নিষ্পাদিত হয়। যে দর্শন করে, তাহার দর্শন কার্য্যও আমারই দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। যে প্রাণ ধারণ করে (অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করে) তাহার উক্ত কর্ম্ম আমারই দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। যে কথা শ্রবণ করে, তাহার কথা শ্রবণকার্য্যও আমারই দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। যাহারা আমাকে এইরূপভাবে না জানে (অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মের ভিতর দিয়া দেখে না ও বুঝিতে পারে না) তাহারাই সংসারে হীন-ভাবাপন্ন হয়। অতএব হে শ্রুত! (সৌম্য!) শ্রদ্ধালভ্য বিষয় আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, তুমি ইহা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ কর।

আলোচনা

ঋগ্বেদের অন্তর্গত দেবীসূক্তের এইটী চতুর্থ মন্ত্র। আমরা স্মরণ রাখিব এই দেবীসূক্তের আটটী মন্ত্রেরই বক্তা সিদ্ধা বাক্‌দেবী। ব্রহ্মজ্ঞানযুক্তা বাক্‌দেবী "সোঽহম্" ভাবে কথা কহিতেছেন।

ময়া সোঽন্নমত্তি—যে জীব অন্নাদি খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করে, সে জীব অন্ন-ভোজন কার্য্য কাহার শক্তিতে নির্ব্বাহ করিতে পারে? আমারই (পরমাত্মারই) শক্তিতে। ভোজনশক্তিরূপা আমি কৃপা না করিলে কোন জীবেরই ভোজনক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না। স্থূল দেহ রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আহারের প্রয়োজন। 'অন্ন' শব্দের অর্থ 'আহার্য্য দ্রব্য। স্থূলদেহ রক্ষা হইলে সূক্ষ্মদেহ বা মন প্রভৃতি সুস্থ থাকে। আহারের দ্বারা দেহের ও মনের পুষ্টি হয়। দেহ থাকিলে তবে মন ধ্যান ধারণাদি তপস্যা করিতে পারে। সেই জন্য উপযুক্ত আহারের দ্বারা শরীরকে রক্ষা করা হইয়া থাকে। ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার উপায় সুস্থ দেহ। সুতরাং আহারের দ্বারা ধর্ম্মসাধন দেহকে অগ্রে সুস্থ রাখিতে হইবে।

কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে তপক্লিষ্টা উমা দেবীকে ব্রহ্মচারী-বেশী ভগবান দেবাদিদেব শিব সেইজন্য বলিয়াছেন—

"শরীরমাদ্যং খলু **ধর্ম্মসাধনম্**" ॥

এখন, আহার করিবার **শক্তি জীবের নিজের নাই**। যে আহারের ফলে স্থূলদেহ রক্ষা ও সূক্ষ্মদেহ-পুষ্টি হইবে সেই আহারকার্য্য জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা আমিই নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। কতকাল হইতে আমি অসহায় জীবের জন্য তাহার সকল ভোজনক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছি, জান? অনাদিকাল হইতে আমার জীবের প্রতি এই কৃপা বর্ষিত হইয়া আসিতেছে

সৃষ্টির বয়স যত, আমারও কৃপা ততদিনের। এইজন্য আমার কৃপাকে **অহেতুকী বা স্বাভাবিকী** বলে। আমি জীবের আহারক্রিয়ার মধ্যেও আছি। যখন আমি সর্ব্বত্র বিরাজ করি, তখন আহার কর্ম্মেতেও আমি থাকিবনা কেন? এই সৃষ্টিও আমারই! জীব-জগতের মধ্যে প্রতি অণুপরমাণুতেও আমিই আছি! সুতরাং জীবের সকল কর্ম্মের মধ্যেই আমি আছি। শুধু 'আছি' নহে! **এমন ভাবে আছি যে, আমি না থাকিলে কোন কর্ম্মই হইতে পারে না।** যদি জীব থাকে এবং তাহার সম্মুখে আহারও থাকে, কিন্তু **ভোজন-শক্তিরূপে আমি না থাকি,** তাহা হইলে জীব অন্ন গ্রহণ করিতেই পারে না। ভোজন ক্রিয়া বন্ধ হইলে জীবের অন্নময় দেহের ক্ষয় ও পতন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সূক্ষ্ম দেহেরও শক্তি হ্রাস হয়।

শ্রীগীতা—

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ **পচাম্যন্নং** চতুর্ব্বিধম্ ॥" ১৫॥১৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মাভাবে অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, **আমি জঠরাগ্নি হইয়া** প্রাণিগণের দেহে প্রবেশ করিয়া প্রাণ অপান বায়ুতে সংযুক্ত হইয়া প্রাণিগণের ভুক্ত চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন **পরিপাক করি।**

ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ ও সনৎকুমার সংবাদ—খণ্ডে আমরা দেখিতে পাই সনৎকুমার বক্তা ও নারদ শ্রোতা। সনৎকুমার বলিলেন—বল অপেক্ষা অন্নই শ্রেষ্ঠ; কারণ দেখা যায়, কেহ যদি দশ রাত্রি ধরিয়া কিছুই না খায়, তবে সে মরিয়া যায়; যদি বা

বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলেও শক্তি না থাকায় গুরু বা আচার্য্য-দিগের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদের দর্শন লাভ করিতে পারে না বলিয়া তাঁহাদের মুখ হইতে উপদেশ শুনিতে পায় না। সুতরাং তাহা চিন্তার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনুষ্ঠান করিবার সুযোগও পায় না বলিয়াই কোন ফলও লাভ করিতে পারে না। আর এই ব্যক্তিই যদি ঐ দীর্ঘ উপবাসের পর চারিটী অন্ন ভক্ষণ করিতে পায়, তাহা হইলে শরীরে বল পাইলেই সে আবার গুরুর দর্শন লাভ করিতে পারে, আবার তাঁহাদের সেই উপদেশ বাণী শ্রবণ করিতে পায়, আবার তাহা মনন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ পায়; সুতরাং তাহার ফলও লাভ করিয়া থাকে। অতএব এই **অন্নকে ব্রহ্মজ্ঞানে** উপাসনা করিবে।

ভগবান সনৎকুমারের উক্ত কথাগুলি চিন্তা করিলে অন্নকে ব্রহ্মজ্ঞানে আমরা দেখিতে শিখিব। অন্ন যদি ব্রহ্ম হন। সেই অন্নকে ভোজন করিবার শক্তি আর কাহার হইবে! **অন্নও ব্রহ্ম ভোজনশক্তিও ব্রহ্ম।**

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

"তজ্জলানিতি শান্তমুপাসীত।" ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

ব্রহ্ম হইতেই এই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মেতেই সমস্ত অবস্থান করিতেছে এবং অন্তিম কালে ব্রহ্মেতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইবে। অতএব আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি, এগুলি বস্তুতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। এইজন্য যিনি উপাসক, তিনি শান্তভাবে অর্থাৎ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা অনুরাগ-ভাবাপন্ন না হইয়াই উপাসনা করিবেন।

জীব যে আহার গ্রহণ করে, আমি (পরমাত্মা) প্রচ্ছন্নভাবে ভোজনশক্তি রূপে থাকি বলিয়া আমারই শক্তিতে জীবের ভোজন কার্য্য সম্পন্ন হয়। **কোন কর্ম্মেই জীবের কর্ত্তৃত্ব নাই**। আমিই একমাত্র সমস্ত কর্ম্মেরই কর্ত্তা। আমি যন্ত্রী, জীব যন্ত্র। যন্ত্রের কর্ত্তৃত্ব কোনকালেই নাই। যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র কর্ম্ম করে। তাহাতে যন্ত্রের কোন কৃতিত্ব নাই। **যন্ত্রীরই সকল কৃতিত্ব**। যেহেতু যন্ত্রীই আসল কর্ত্তা।

ভোজনে **জনার্দ্দন**-রূপে আমায় স্মরণ করিলে জীবের ভোজন কর্ম্ম আমিই বিঘ্ন-শূন্য করি। আহারে বসিয়া জীব "ভোজনে চ জনার্দ্দনঃ" বলে। আমি যে ভোজন কর্ম্মেতেও আছি, এ কথা শাস্ত্রমুখে ও গুরুমুখে জীব শোনে। আমার শক্তি না পাইলে জীব কিছু খাইতেও পায় না। আমি যে সকলকে প্রতিপালন করি, সেইজন্য আমার একটী নাম "বিশ্বম্ভর।"

অন্নও আমি, ভক্ষকও আমি, ভোজনশক্তিও আমি—আমিই সব। **এই আমার লীলা**।

বিপশ্যন্তি—জীবের দর্শনকার্য্য আমার (পরমাত্মার) দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। চর্ম্মচক্ষুতে জীব দর্শন করে; কিন্তু কাহার শক্তিতে চক্ষু দেখিতে পায়? পরমাত্মারই শক্তিতে। **কেনোপনিষদে** আছে যে, ব্রহ্মকে চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না বরং চক্ষুর দেখিবার শক্তি ব্রহ্ম হইতে চক্ষু লাভ করে। চক্ষুর দেবতা সূর্য্য। আধিকারিক দেবতার কৃপা না হইলে জীবের কর্ম্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় কোন কার্য্য করিতে পারে না। মৃত্যুর সময় সূর্য্য চক্ষুকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান সেই জন্য জীব চক্ষে আর দেখিতে পায় না বা নিকটে আসিলেও পরিচিত লোককে চিনিতে পারে না। যে শক্তির দ্বারা

জীব দর্শন করে সেই শক্তিটী মৃত্যুর সময় চলিয়া যায়। এখন সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি তেজময় পদার্থগুলির তেজ বা দীপ্তি কোথা হইতে আসিল? একমাত্র পরমাত্মা হইতে সকল তেজের উৎপত্তি হইয়াছে। সূর্য্যের বা চন্দ্রের নিজের কোন দীপ্তি নাই। যিনি সমস্ত বস্তুর প্রকাশক সেই **সূর্য্যদেবও** আত্মভূত **ব্রহ্ম পদার্থকে প্রকাশ করিতে পারে না**। সূর্য্যাদি যতকিছু দীপ্তিমান বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ করি এই সকলগুলিই নিয়ত প্রকাশমান সেই আত্মার প্রকাশে প্রকাশিত হইতেছে। পরমাত্মার প্রকাশ শক্তিতে সূর্য্যাদি দীপ্তির দ্বারা সমস্ত বস্তুকে আলোকিত করিতে পারে। উপনিষদ বলেন,—

> "**ন তত্র সূর্য্যো ভাতি** ন চন্দ্রতারক—
> নেমা বিদ্যুৎ ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> **তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্ব**—
> ন্তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

বহিশ্চক্ষু দ্বারা দর্শন কার্য্য যেমন পরমাত্মার শক্তিতে সম্পন্ন হয় অন্তর্দৃষ্টিও সেইরূপ পরমাত্মার কৃপায় হইয়া থাকে। জ্ঞাননেত্র বা দিব্যচক্ষু, জীবের আপনাআপনি জন্মায় না। **পরমাত্মাই জীবকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেন**। শ্রীগীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইবার জন্য ভগবান তাহাকে জ্ঞানচক্ষু দিয়াছিলেন।

> "ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুম অনেনৈব স্বচক্ষুষা
> **দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ** পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥
> গীতা—১১।৮

জীবকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা কিছু দেখিতে হইলে পরমাত্মার শক্তি সাহায্য ও কৃপা ব্যতীত সেই অন্তর্দর্শন কার্য্য হইতেই পারে না। অন্তরে ও বাহিরে সূক্ষ্মভাবে ও স্থূলভাবে জীব যাহা দেখিতে পায় একমাত্র পরমাত্মারই স্বাভাবিকী কৃপায় তাহা সিদ্ধ হয়। ভগবানের কি অদ্ভুত করুণা যে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন সাধক চক্ষুর মধ্যেও এই পরমাত্মার সন্ধান পান। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন—

"য এষোঽক্ষিনি পুরুষে দৃশ্যত এষ আত্মেতি ইত্যাদি—" অর্থাৎ আচার্য্য বলিলেন—"যাঁহাদের দৃষ্টি বাহিরের বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া অন্তর্মুখী হইয়াছে তাঁহারা নয়নের মধ্যে যে পুরুষকে অবলোকন করিয়া থাকেন, তিনিই আত্মা। এই আত্মা অমৃত বলিয়া ইঁহার মরণের ভয় এতটুকুও নাই; ইনিই আবার ব্রহ্ম।" আচার্য্য উপকোসলকে এইরূপ উপদেশ দিয়া আবার বলিতে লাগিলেন যে "নির্লেপ সঙ্গহীন আত্মা এই নয়নের মধ্যে অবস্থান করেন বলিয়াই যদি কেহ ইহাতে ঘৃত কিম্বা জল নিক্ষেপ করে তবে তাহা ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট না হইয়াই একেবারে চোখের পাতা দুইটির মধ্যেই চলিয়া যায়।" বিবেকী লোকেরা নয়নাভ্যন্তরবর্ত্তী এই পুরুষকে "সংযদ্বাম" বলিয়া থাকেন কারণ এই বিপুল বিশ্বের শুভকর্ম্মগুলি ইঁহাতেই আশ্রয় করিতেছে। যিনি এই পুরুষকে পূর্ব্বোক্ত গুণে গুণবান ভাবিয়া তাঁহার উপাসনা করেন জগতের শুভকর্ম্মগুলি তাঁহাকেও আশ্রয় করিয়া থাকে। শুভকর্ম্মের ফলগুলি ইনিই সকলকে বিভাগ করিয়া দেন বলিয়া তত্ত্বদর্শীরা ইঁহাকেই "বামনী" বলিয়া থাকেন। সেইরূপ আবার ইঁহারই জ্যোতিতে সমস্ত বস্তু জ্যোতির্ম্ময় হইয়া দীপ্তি পাইতেছে বলিয়া তাঁহারা ইঁহাকে "ভামনী" বলেন। উপাসকদিগের মধ্যে যাঁহারা এই দুইটি গুণে গুণবান ভাবিয়া

তাঁহার উপাসনা করেন তাঁহারা নিজেরাও সেই সেই গুণে গুণবান হইয়া থাকেন।" কেনোপনিষদ বলেন—

"চক্ষুষচক্ষুঃ" ॥ ২ ॥

পরমাত্মা **চক্ষুর চক্ষু**। চক্ষু রূপকে প্রকাশ করে। চক্ষুর এই যে রূপগ্রহণের সামর্থ্য তাহা আত্মারই। আত্মার সহিত সংযোগ না থাকিলে চক্ষু দেখিতে পায় না। আত্মার শক্তিতে চক্ষু দর্শন করিবার শক্তি পায়। সাধারণ জীব ভ্রমে পড়িয়া ভাবে চক্ষু দেখে। কিন্তু তত্ত্বদর্শী যাঁহারা তাঁহারা জানিতে পারেন ও দেখেন **চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি চক্ষুতে নাই, কিন্তু জীবের আত্মচৈতন্যে অধিষ্ঠিত**।

যঃ প্রাণিতি—যে জীব শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করে, তাহার উক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস-কর্ম্ম আমারই (পরমাত্মারই) দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। আমিই জীবের প্রাণধারণের উপায় স্বরূপ। শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণন ক্রিয়াকে '**অজপা** বলে। অজপাজপই বহিঃ-প্রাণায়ামরূপ **জীবের আয়ু**। জীবের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অজপাজপ পূর্ণ হইলেই তাহার দেহত্যাগ হয়। শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য জীবের বুদ্ধি পূর্ব্বক করিতে হয় না। ভগবানের কৃপায় অজপাজপ নিত্য চলিতেছে। **হংস মন্ত্রে অজপাজপ** চলে। জীবের শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য পরমাত্মারই শক্তিতে চলে। জীবের প্রাণশক্তিই তিনি। আমি যে শ্বাসপ্রশ্বাস কর্ম্মে আছি, ইহা জীব কখন বুঝিতে পারে? যখন **'হংস' মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া জীব "সোঽহম্" হইয়া যায়** তখনি দেখিতে পায় ভগবানেরই শক্তিতে জীবের শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য চলিতেছে। তিনি প্রাণ ও অপান বায়ুমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া জীবকে বাঁচাইয়া রাখেন। যোগশাস্ত্রে এই অজপা মন্ত্রের বা বহিঃপ্রাণায়ামের বিশেষ তথ্য

আছে। বেদে দুই প্রকার **প্রাণের** কথা আছে। গৌণপ্রাণ ও মুখ্যপ্রাণ। শ্বাসপ্রশ্বাসকে গৌণপ্রাণ বলে। **আত্মাকে** বা চৈতন্যকে **মুখ্যপ্রাণ** বলে। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনার কথা আছে। প্রাণ যদি ব্রহ্ম হন তবে দুইপ্রকার প্রাণই ব্রহ্ম। সেইজন্য শ্বাসপ্রশ্বাস কর্ম্ম জীবের নিজের নহে উহা আমারই (পরমাত্মারই)।

কেনোপোনিষৎ বলেন, ব্রহ্ম প্রাণের প্রাণ।

"স উ প্রাণস্য প্রাণঃ" ॥২॥ কেনোপোনিষৎ।

প্রাণের প্রাণশক্তিই আত্মা। শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াকে প্রাণন ক্রিয়া বলে। শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণন ক্রিয়া আত্মারই। পরমাত্মাই জীবকে শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। পরমাত্মা শক্তি দিয়া কৃপা না করিলে জীব শ্বাসপ্রশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলিতে পারে না। যে শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর জীবের জীবন নির্ভর করে, সেই শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য জীব পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কাহারও শক্তিতে সম্পন্ন করিতে পারে না। সুতরাং যে জীব প্রাণ ধারণ করিয়া আছে তাহার সেই প্রাণ ধারণের শক্তি পরমাত্মারই শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যোগীরা এই তত্ত্বটী ভালরূপে বুঝিতে পারেন। জীব "হং" মন্ত্রে শ্বাস গ্রহণ করে বা শ্বাসগ্রহণের সময় "হং" শব্দের ন্যায় শব্দ হয়। সেইরূপ শ্বাস ত্যাগ করিবার সময় "সঃ" শব্দ হয়। প্রাণায়ামের দ্বারা এই "হংস" মন্ত্রে বা অজপা মন্ত্রে শ্বাসপ্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যোগীরা প্রাণের আয়াম বা বিস্তার করে। "হংস" যখন **বিপরীতগতি** প্রাপ্ত হইয়া "সোঽহম্" ভাবে পরিণত হয় তখনই জীব অজপা মন্ত্রে সিদ্ধ হয়। এই **অজপাই ব্রহ্ম**। সুতরাং জীবের শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ কর্ম্ম পরমাত্মারই শক্তিতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

আর এক প্রকারের সাধনা আছে তাহাকে **শ্বাসে শ্বাসে জপ** বলে। সেখানে শ্বাসপ্রশ্বাস কর্ম্মের সঙ্গে সাধক ইষ্টমন্ত্রকে উচ্চে ও নীচে লইয়া যায়। বীজমন্ত্রকে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া সাধক জপ অভ্যাস করে। এই প্রকার সাধনার কৌশল অত্যন্ত গুহ্য কথা। কেবলমাত্র গুরুগম্য।

শৃণোতি—জীব যে কান দিয়া কথা শ্রবণ করে এই শ্রবণ কার্য্য পরমাত্মারই শক্তিতে সম্পন্ন হয়। আমিই জীবের শ্রবণশক্তি-রূপিনী। আমার কৃপা না হইলে জীবের শ্রবণকার্য্য নিষ্ফল হয়। বেদ বলেন যে ব্রহ্ম **"শ্রোত্রস্য-শ্রোত্রম্"** (কেনোপনিষদ্)। কানের কান। জীবের শ্রবণ-কার্য্য পরমাত্মারই দ্বারা সম্পন্ন হয়। জীব কাণ দিয়া শুনে কিন্তু কাহার শক্তিতে শুনে? জীব কি নিজের শক্তিতে শুনিতে পারে? কখনই নহে। কর্ণ ইন্দ্রিয়ের নির্ম্মাতা জীব নহে। শ্রবণ শক্তিরও স্রষ্টা জীব নহে। জীবের যে আত্মা ইহারও স্রষ্টা জীব নহে। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ, এ সকলেরই স্রষ্টা ভগবান। যোগশাস্ত্রে **বহুদূরের শব্দ-শ্রবণ** একটা বিভূতি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। সুতরাং যে সাধক যোগের সাহায্যে অতি দূরের শব্দ শুনিতে পায় তাহার সেই সূক্ষ্ম শ্রবণশক্তিও পরমাত্মার কৃপাতে বিকশিত হইয়া উঠে। সাধনমার্গে থাকিলে **মেঘগর্জ্জন, সমুদ্রগর্জ্জন, বংশীধ্বনি, নূপুরধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, হুঙ্কারধ্বনি, অট্টহাস্য** প্রভৃতি অনেক প্রকারের শব্দ সাধক তাহার ইষ্টদেবতার কৃপায় শুনিতে পায়। অতীন্দ্রিয় পদার্থের দর্শন ও অপ্রাকৃত শব্দশ্রবণ সাধকের ভাগ্যে হইয়া থাকে। কাহার কৃপায় সাধকের এ প্রকারের সাধনায় সিদ্ধি হয়? একমাত্র পরমাত্মারই কৃপাতে ও শক্তিতে যাহা অন্যের নিকট

অসম্ভব, তাহা শরণাগত ভক্তের নিকট, সম্ভব ও সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে।

অমন্তবো—যাহারা আমাকে (পরমাত্মাকে) এইরূপভাবে অর্থাৎ অন্তর্য্যামীরূপে না জানে, তাহারা সংসারে হীনভাবাপন্ন হয়। আমার প্রকৃত তত্ত্ব যাহারা না জানে তাহারা জীবের কোন কর্ম্মেই আমার (পরমাত্মার) শক্তির খেলা দেখিতে পায় না। আমার বিষয়ে সম্যক জ্ঞান যাহাদের নাই, যাহারা আমার সর্ব্বব্যাপীত্ব অনুভব করিতে পারে না, যাহারা আমার সর্ব্বশক্তিমত্তা সর্ব্বত্র ধরিতে পারে না বা বুঝিতে চায় না সেই সকল অবিবেকী ও আত্মঘাতী জীব সংসারে আমাকে **অবমাননা** বা উপেক্ষা করার জন্য সর্ব্বপ্রকারে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় এবং লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হয়। সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে যাহারা অজ্ঞানে ধরিতে পারে না বা অহঙ্কার-বশে আমাকে মিথ্যা মনে করিয়া উড়াইয়া দেয় তাহাদের বড়ই দুর্দ্দশা হয়। আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে জীবের অপরাধ হয়, তাহাতে তাহার সংসারে সকল কর্ম্মে সিদ্ধির ব্যাঘাত হয় এবং ইহপরলোকে অকল্যাণ হয়। **অজ্ঞানের তুল্য পাপ আর কিছুই নাই**। আমার তত্ত্ব যে না জানে তাহার অপেক্ষা শোচনীয় জীব সংসারে নাই। জীব যে বার বার জন্মমৃত্যু ভোগ করে তাহার একমাত্র কারণ আমাকে অমান্য করা বা আমার **স্বরূপটীকে** না জানা।

শ্রদ্ধিবং—আত্মতত্ত্ব অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই সুতরাং সেই **তত্ত্বটী** সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে শ্রোতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উপদেশ **শুনিতে** হইবে। যেখানে **শ্রদ্ধা** নাই সেখানে **উপদেশ** পাইলেও বস্তুলাভ হয় না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বের কথা অনুভবে আনিতে হইলে অত্যন্ত **শ্রদ্ধাযুক্ত** হইয়া উপদেশ **শ্রবণ** করা

প্রয়োজন। পরমাত্মা সেইজন্য বার বার বলিতেছেন আমাকে অমান্য করিও না আমাকে পূজা কর। আমাকে উপেক্ষা করিলে তোমার বিপদ, তোমার ধ্বংস। আমাকে পূজা করিলে, আমার **স্বরূপটী** তোমার কাছে পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিবে। আমার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে।

আত্মতত্ত্বের বক্তা সিদ্ধা বাগ্‌দেবী বা মহামায়া বা স্বয়ং পরমাত্মা। সেইজন্য বিষয়ের গুরুত্ব এবং বক্তার গৌরব লক্ষ্য রাখিয়া শ্রোতাকে শ্রদ্ধাযুক্ত হইতে আদেশ করিতেছেন।

আমরা যেন শ্রীশ্রীচণ্ডীর কৃপায় তাঁহার আদেশমত শ্রদ্ধাযুক্ত হইতে পারি।

মন্ত্র

অহমেব স্বয়মিদং বদামি, জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং
তমৃষিং তং সুমেধাম্‌ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ

আমি নিজেই ইহা (অর্থাৎ নিজ-স্বরূপ-তত্ত্ব) বলিতেছি। এই তত্ত্ব দেবগণ ও মনুষ্যগণের প্রার্থিত। আমি যে যে জীবকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, তাহাদিগের কাহাকেও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী করি, কাহাকেও ব্রহ্মা করিয়া থাকি, কাহাকেও বা ঋষি, কাহাকেও বা মেধাবী করিয়া থাকি।

আলোচনা

ঋগ্বেদের অন্তর্গত দেবীসূক্তের এইটী পঞ্চম মন্ত্র। ব্রহ্মজ্ঞান-যুক্তা সিদ্ধা বাগ্‌দেবী সোহং ভাবে কথা কহিতেছেন।

স্বয়ং—আমি নিজেই নিজের স্বরূপের সম্বন্ধে তত্ত্ব-কথা বলিতেছি। ভগবানের কথা সনাতন সত্য কথা। পরমাত্মার স্বরূপের সম্বন্ধে যত লোক যত প্রকারের কথা বলে সেই সকল কথার অপেক্ষা পরমাত্মার নিজের কথাই বড় এবং সঠিক। পরমাত্মা কি বস্তু, এই তত্ত্ব আলোচনায় যদি আমরা ভাগ্যগুণে **পরমাত্মাকেই বক্তারূপে** পাই তাহা হইলে সঠিক তত্ত্বকথা আমরা পরমাত্মার মুখ হইতে শুনিতে পাই। ঈশ্বরের **স্বরূপটী** কি—এ **সম্বন্ধে** যত প্রকারের গবেষণা দেখিতে পাই, বক্তার গৌরব অনুসারে গবেষণার মূল্য ধার্য্য করা হয়। ভগবানের নিজের তত্ত্বসম্বন্ধের কথা ভগবান নিজেই বলিলে তাহা যেমত সঠিক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও অভ্রান্ত হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। **ভগবানের রহস্যের কথা ভগবান ছাড়া আর কে ঠিক ঠিক জানে**? যাঁহার জ্ঞানের সীমা নাই, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতত্ত্ব, যিনি জগতে একমাত্র সৎবস্তু, যিনি আনন্দঘন-বিগ্রহ, যিনি সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য, তিনি যখন নিজে আত্মার **স্বরূপ সম্বন্ধে** উপদেশ দিতেছেন তখন তাঁহার কথা অতি অবশ্য আমাদের মানিয়া লওয়া উচিত। পরমকারুণিক পরমেশ্বর জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া আত্মার সম্বন্ধে রহস্যের কথা বলিতেছেন। পাছে লোকে ভগবানের উপদেশ গ্রাহ্য না করে, এই জন্য তিনি বার বার বলিতেছেন যে, **আমি স্বয়ং** তোমাদের আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছি। সিদ্ধা বাগ্‌দেবী ব্রহ্মদর্শন করিবার পর ব্রহ্মভাবে কথা কহিতেছেন। এই যে তত্ত্ব-উপদেশ প্রচার ইহা শাস্ত্রের মধ্য দিয়া আপ্তবাক্য বলিয়া বলা হয় না। ব্রহ্মভূতা বাগ্‌দেবী তখন নিজেই ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছেন। তিনি আপন আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধাবস্থায় যাহা কিছু উপলব্ধি

করিয়াছিলেন তাহাই সেই ভাবের মুখে বলিয়া যাইতেছেন। **আমি** অন্যের মারফতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বের কথা প্রচার না করিয়া স্বয়ংই তাহা জীবের কল্যাণের জন্য বলিতেছি। সাধারণ জীব যখন অসাধারণ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা কয় তখন তাহা সঠিক না হইয়া ভ্রম-প্রমাদ পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু যখন সেই দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বের বক্তা ব্রহ্ম নিজেই হন, যখন ব্রহ্মসম্বন্ধে গোপনীয়, দুর্ব্বোধ্য রহস্যের কথা ব্রহ্ম নিজেই প্রকাশ করেন, তখন তাহা বেদ বাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত সত্যবাণী।

এখানে সেইজন্য সকলকে উপদেশ করিয়া বাগ্‌দেবীর মুখ দিয়া ব্রহ্ম একটী সাবধানবাণী প্রচার করিতেছেন—বলিতেছেন, "আমি নিজেই যখন নিজের রহস্যের কথা বা আত্মতত্ত্ব বলিতেছি, তখন আমার কথা অপেক্ষা সত্যবাণী আর কেহই বিশ্বজগতে বলিতে পারে না। সুতরাং এই দেবীসূক্তে যে অভ্রান্ত সত্যের প্রচার করা হইয়াছে তাহাতে যদি কেহ সন্দেহ না করিয়া, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা স্থাপন করে, তবে তাহার মঙ্গল হয়। বিশেষ সৌভাগ্য জীবের না ঘটিলে জীব পরমাত্মাকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেষ্টারূপে পায় না। সিদ্ধা বাগ্‌দেবী সমাধি অবস্থায় দেখিলেন যে তাঁহার জীবাত্মা পরমাত্মায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা লাভ করিয়া পরমাত্মা সাজিয়া পরমাত্মাভাবে তিনি এই দেবীসূক্তের মন্ত্রগুলি বলিয়াছিলেন। পরমাত্মা নিজেকে যেভাবে দেখেন, সে ভাবে কোন জীব পরমাত্মাকে দেখিতে পারে না। পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যের কথা মুখ ফুটিয়া বলিতেছেন আবার তাঁহার এই দেবীসূক্তের বাণীগুলি যে অভ্রান্ত সত্য এই কথা জীবদের বুঝাইবার জন্য বার বার সাবধান করিয়া দিতেছেন যে দেবীসূক্তের কথাগুলি সামান্য কথা নয়। যে কথাগুলির বক্তা পরমাত্মা স্বয়ং সে

কথাগুলি কত মূল্যবান, কত সারগর্ভ, কত সত্যময়। সত্য-স্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা যে বাণী উচ্চারণ করেন তাহাও সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ। সেই জন্য পরমাত্মা যেন ভ্রূকুটী করিয়া বলিতেছেন যে, আমি স্বয়ংই আমার স্বরূপের কথা যখন বলিতেছি তখন সেই সকল কথার এক বর্ণও সত্য ছাড়া মিথ্যা হইতে পারে না, **জীবন্ত ও প্রাণময়** ছাড়া মৃত হইতে পারে না, **জ্ঞানময়** ছাড়া জড় হইতে পারে না, অর্থযুক্ত ছাড়া নিরর্থক হইতে পারে না, দীপ্তিময় ছাড়া মলিন হইতে পারে না, কল্যাণময় ছাড়া অমঙ্গলের কারণ হইতে পারে না, সঠিক তত্ত্ব ছাড়া কল্পনার বস্তু হইতে পারে না। ভগবান জীবের প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা জানেন। জন্মজন্মান্তরের কর্ম্ম-সমষ্টির প্রতীক সংস্কারের অত্যাচারে জীব যে জর্জ্জরিত হয়, বুঝিলেও সংস্কারের বিরোধে জীব যে কাজ করিতে পারে না, **শতসহস্রবার সৎসঙ্গ করিলেও** প্রবল সংস্কার জীবকে যে কোন তত্ত্বের কথা ধারণা করিতে দেয় না—এ কথা ভগবান জানেন। জীবের এই প্রকার বিচিত্র সংস্কার জানিয়াই তিনি বিশেষভাবে জীবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেছেন, "হে হতভাগ্যজীব! তোমার দুষ্ট সংস্কার তোমাকে বরণীয় ভর্গের দিকে চাহিতে দেয় না। পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতির ফলে সৎসঙ্গ পাইলেও পুণ্যের মাত্রা অপেক্ষা পাপের মাত্রা বেশী থাকার জন্য পাপকর্ম্ম-সমষ্টির ফলস্বরূপ দুষ্ট সংস্কার তোমাকে শতসহস্র ভাবে জর্জ্জরিত, নিগৃহীত, লাঞ্ছিত ও বিপর্য্যস্ত করিতেছে; কিন্তু তোমার উপর যে তোমার নিজের সংস্কারের অত্যাচার চলিতেছে, এ বোধ, এ ধারণা, তোমার থাকে না। আজ আমি দেবীসূক্তের ৮টী মন্ত্রে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা তোমাকে উপদেশ করিতেছি তাহা যদি তোমার ধারণায় আসে, এবং

সেই ধারণা অনুযায়ী তোমার অনুষ্ঠান হয়, বা সাধনা চলে, তাহা হইলে তোমার জীবনে অতি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে পারে, অর্থাৎ, অত্যন্ত বদ্ধজীব তুমি, তোমারও মুক্তির ব্যবস্থা হইতে পারে। আমি **গুরুরূপে**, হে জীব! তোমার মঙ্গলের জন্য অনেক উপদেশ দিয়া দেখিয়াছি তুমি কান দিয়া শুনিলেও, তাহাতে আন্তরিক ভাবে মন দাও না; সেইজন্য **গুরুরূপী** আমার উপদেশ ব্যর্থ হয়। আমি, আবার, হে জীব! **শাস্ত্ররূপী**, আপ্তবাক্যরূপে, তোমাকে অনেক উপদেশ দিয়া দেখিয়াছি তোমার সাময়িক উত্তেজনা হয় মাত্র, সাধন-মার্গে আসিতে, বা মনকে অন্তর্মুখী করিতে, তোমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে না। আমি আবার আমার তৃতীয় মূর্ত্তি তোমার **বিবেকরূপে** তোমার মধ্যে থাকিয়া তোমাকে হিতাহিত অনেক কথা জানাইয়া দিই, তোমাকে সৎপ্রেরণা দিই, বিবেকরূপী আমার সেই বাণী শুনিয়াও শুন না, বুঝিয়াও ধারণা কর না। তুমি এতই বহির্ম্মুখ যে আমি তোমার আশে পাশে ঘুরিলে ও তুমি আমায় চাও না। তোমার গুরুরূপে, শাস্ত্ররূপে ও বিবেকরূপে আমার এই তিন মূর্ত্তিতে তোমাকে তোমার দুরন্ত সংস্কারের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তোমার কাছে যাইলে তুমি যখন আমায় উপেক্ষা কর, যখন তুচ্ছ ইন্দ্রিয় সুখভোগের লালসায় পরম শান্তির কারণ আমার উক্ত তিন মূর্ত্তির উপদেশ অগ্রাহ্য কর, যখন সামান্য নশ্বর দেহের সুখলাভের জন্য অবিনশ্বর ও প্রচুর কল্যাণকর আত্মার দিকে চাহিতে ভুলিয়া যাও, তখন আমি আমার এই চতুর্থ মূর্ত্তিতে তোমার নিকট উপস্থিত হই। আজ আমি আমার চতুর্থ মূর্ত্তিতে অর্থাৎ **পরমাত্মাভাবে** তোমাদের সকলের দিকে চাহিয়া, দুর্ভেদ্য নীরস তোমাদের হৃদয়ে আমার এই অমোঘবাণী প্রবিষ্ট

করাইবার জন্য আমি বার বার বলিতেছি যে দেবীসূক্তের তত্ত্ব কথা-গুলি তোমরা যদি ধারণায় আনিতে পার, অনুষ্ঠানে অভ্যাস করিতে পার, ও বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ঘরে সযত্নে রাখিতে পার, শরণাগতভাবে আমার পাদপদ্মে সমস্ত নির্ভর করিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের অনাদিকালের অজ্ঞান আঁধারময় হৃদয়কন্দর পুণ্যজ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। আমি নিজে স্বয়ং পরমাত্মা, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের কারণ আমি, সর্ব্বেশ্বর আমি, বিধাতা আমি, সেই আমি তোমার মঙ্গলের জন্য আজ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলিতেছি। একে ব্রহ্মতত্ত্ব পাপীর জীবনে অমৃতের কাজ করে, তায় **অমৃতময় 'আমি'** আমার মুখ দিয়া নির্গত হইতেছে, এ **মাহেন্দ্রক্ষণ,** হে পথভ্রান্ত জীব! তুমি ছাড়িও না। **শুধু** যদি একবার বুঝিতে পার যে দেবীসূক্তের বিষয় কেবল মাত্র ভগবৎতত্ত্ব আবার সেই ভগবৎ-তত্ত্বের বক্তা স্বয়ং ভগবান নিজে তাহা হইলে তুমি দেবীসূক্তের তত্ত্বগুলি ধারণায় আনিতে পারিবে ও কৃতকৃতার্থ হইতে পারিবে। তাই **আমার** দিকে চাহিতে তোমাকে বারবার উপদেশ করিতেছি। দেবীসূক্তের প্রচার কার্য্য আমি নিজে স্বয়ং বহন করিয়াছি।

আমি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ জাগাইয়া দিয়াছিলাম, ব্রহ্মার মুখ হইতে শিষ্য পরম্পরায় বেদ জগতে প্রচার হইয়াছে। **"তেনে ব্রহ্মহৃদা"** (ভাগবৎ ॥১॥)

পরমাত্মা নিজেই নিজের কথা আরও কয়েকবার বলিয়াছেন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পরমাত্মাভাবে নিজের সর্ব্বশক্তি-মত্তার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "হে অর্জ্জুন! তুমি সমস্ত ভাবনা ছাড়িয়া দাও, একমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে মুক্ত করিব, দুঃখ করিও না।" "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥”

গীতা ॥

“তেষাম্ অহম সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ”

গীতা ॥

পরমাত্মাই জীবকে মৃত্যু সংসাররূপ সাগর হইতে উদ্ধার করেন। মরণশীল জীব অমৃতত্ব লাভ করে কেবলমাত্র শ্রীভগবানের আদেশ প্রতিপালন করিয়া। দেবীসূক্তের কথাগুলি যখন জীবের পরম শ্রদ্ধার বিষয় হইবে, যখন মাথায় করিয়া তত্ত্বগুলি রাখিতে জীবের প্রবৃত্তি জাগিবে তখনই জীবের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হইবে। এখন, দেবীসূক্তকে শ্রদ্ধার চক্ষে জীব দেখিবে কেন? ইহার উত্তরে, পরমাত্মা বলিতেছেন, যেহেতু আমি স্বয়ং নিজমুখে দেবীসূক্ত প্রকাশ করিয়াছি সেইজন্য যে জীব আস্তিক অর্থাৎ আমাকে মানে, সে জীব আমাকে যে শ্রদ্ধা করে, আমার মুখ উচ্চারিত বাণীকেও সেইরূপ শ্রদ্ধা করে। পাছে সাধারণ জীব পরমাত্মাকে উপেক্ষা করিয়া নষ্ট হইয়া যায়, যেহেতু ভগবানের বাণীকে, আদেশকে, উপদেশকে অগ্রাহ্য করিলে সেই অপরাধ হয়। এখন সতত অপরাধী ভ্রান্ত জীব দেবীসূক্তের কথা শুনিয়া পাছে অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষা করিয়া অপরাধী ও নিরয়গামী হয়, এইজন্য তিনি সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন দেবীসূক্তের তত্ত্বকথা আমার নিজের মুখের উচ্চারিত কথা। যাহারা আমাকে মানে তাহারা যেন আমার প্রতিমূর্ত্তিরূপা আমার বাণীকেও মানে। **আমিই** পরমাত্মা, **পরব্রহ্ম** আর আমার বাণী **শব্দব্রহ্ম**। শব্দব্রহ্মকে ধরিয়া পরব্রহ্মকে জীব পায়। সুতরাং শব্দব্রহ্মকে, বা আমার বাণীকে বা আমার **নামকে** উপেক্ষা করিলে

পরব্রহ্মরূপী আমাকে কেমন করিয়া জীব পাইতে পারে? সেইজন্য **আমি** সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে দেবীসূক্তের কথাগুলি পরমাত্মা আমি **আমার উক্তি**। আমিও যে বস্তু আমার উপদেশও সেই বস্তু। **আমি নামী** আমার উপদেশ **নাম**। **নাম ও নামী অভিন্ন** ইহা সনাতন সত্য। সুতরাং আমার উপদেশ **আমিতে** গূঢ়ভাবে মাখা রহিয়াছে। উপদেশকে মনে প্রাণে ঠিকভাবে ধরিলে প্রকারান্তরে আমাকেই ধরা হয়। যেখানে আমি স্বয়ং বক্তা সেখানে **আমার কথা** আমারই মত **চিন্ময়,** অপ্রাকৃত ও অনন্যসাধারণ। আমি দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব বলিয়া আমাতে পৌঁছিবার সরল রাস্তা আমি নিজেই করিয়া দিয়াছি। **আমার মুখ-উচ্চারিত উপদেশই সাধন মার্গের সরল সেই রাস্তা**। ইহাই সাধনরাজ্যের **রাজপথ**। যে জীব পরমাত্মার উপদেশে স্থিতিলাভ করে তাহার অতি নিশ্চিত জন্মগ্রহণ বন্ধ হইয়া যায়। জীবের **পাঁচ** প্রকার মুক্তি এই শ্রীভগবানের বাণী ধরিয়া থাকিলে অতি অল্প আয়াসে জীবের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

'আমি'র কথা আমি' ব্যতীত আর কে বলিতে পারে? **আমার স্বরূপটি** কি, ইহা 'আমি' যেমন পূর্ণভাবে জানি, বিশ্বজগতে আমার **সৃষ্ট** দেব বা মানব কেহই তেমন ভাবে জানে না। **'আমি'**ই প্রণবের প্রতিপাদ্য বিষয়। 'আমি'র তত্ত্বই সর্ব্বশাস্ত্রের **বেদ্য**। আবার 'আমি'ই একমাত্র সেইতত্ত্বের **বেত্তা**।

বেত্তাসি-বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম!" গীতা ॥১১॥৩৮

ভগবানই **সর্ব্বজ্ঞ** বলিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় **জ্ঞাতা**। তিনিই আবার একমাত্র **জ্ঞাতব্য** বা জ্ঞেয়। কোন্ তত্ত্বটি জানিতে জীব

সহজে পারে না? সকল শাস্ত্র কোন্ তত্ত্বকে বুঝাইবার চেষ্টা করে? কোন্ তত্ত্বটী জানিলে জীবের সমস্ত জানা হয়? কোন্ তত্ত্বটী বুঝিলে জীবের সকল তত্ত্ব বুঝা হয়? **আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বই** সেই অপূর্ব্ব তত্ত্ব। কাহাকে দেখিলে অপর কিছু দেখিবার আর সাধ জীবের হয় না? কাহাকে দেখিলে সকলকে দেখার কাজ হয়? কাহার অপেক্ষা সুন্দর ও মনোরম বস্তু আর নাই? কাহাকে পাইলে মনে হয় তাহার অপেক্ষা সারবান্ মূল্যবান্ ও শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কোথাও নাই অথবা থাকিতে পারে না? সে বস্তুটী কি? **আত্মা বা ব্রহ্মই সেই অনাস্বাদিত বস্তু**।

"**যং লব্ধা** চাপরং লাভং মন্যতে **নাধিকং** ততম্"

॥ গীতা ॥

সেই আত্মা নিজেই নিজের স্বরূপের কথা, আত্মতত্ত্বের কথা, বলিতেছেন। পরমাত্মার কথা বিশ্বজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ। সেইজন্য পরমাত্মা জীবকে বিশেষ ভাবে দেবীসূক্তের মন্ত্রগুলিকে লক্ষ্য করিতে বলিতেছেন। পাছে জীব মনে করে, 'দেবীসূক্ত' বাজে কথা সেইজন্য সকলকে স্মরণ করাইয়া বলিতেছেন, যে পরমাত্মা স্বয়ংই যখন এই দেবীসূক্তের বক্তা তখন দেবীসূক্ত পরম শ্রদ্ধার বিষয়, **জীবের উপেক্ষার বিষয় নহে**।

বেদ যে অপৌরুষেয়, বেদ যে কোন ব্যক্তি-বিশেষের রচনা নয়, তাহার প্রমাণ এই মন্ত্রে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের অন্তর্গত দেবীসূক্তের বক্তা যখন পরমাত্মা স্বয়ং; দেবীসূক্ত বেদের অংশ বলিয়া বেদ পরমাত্মা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে ইহা খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

"তব নিশ্বসিতম বেদম্"।

তোমার নিশ্বাস হইতে বেদ হইয়াছে—সুতরাং জীব যদি আত্ম-তত্ত্বের সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করে, তবে এই দেব-সূক্তেই সেই সঠিক তথ্য মিলিবে।

জুষ্টম্—সেবিতম ; প্রার্থিতম্। দেবতা এবং মানব উভয়ে এই আত্মতত্ত্ব জানিতে প্রার্থনা করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবতা, দিব্যশক্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হইয়াও কাহার তপস্যা করে? তাহাদের কোন অভাব না থাকিলেও কোন্ অদ্বিতীয় বস্তুর অভাব বোধ করে? দেবতারা কাহাকে জানিতে বা পাইতে চায়? এই আত্মা বা ব্রহ্মকে প্রার্থনা করে। দেবতারা কাহার ধ্যানে থাকে? পরমাত্মার ধ্যানে। দেবতারা কাহার সেবা করে? কাহার আদেশে তাহারা তাহাদের **স্ব স্ব** অধিকারে থাকিয়া কার্য্য করে? দেবতাদের প্রভু কে? পরমাত্মাই দেবতাদের সেব্য। সেইজন্য বেদ বলেন, ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব দেবদুর্লভ বস্তু।

"ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ" গীতা ॥

দেবগণও আমায় জানে না। মানব কাহার নিত্যদাস? কাহার সেবাই মানবের পুরুষার্থ? কাহার উপাসনায় মানব ধন্য হয়? কাহার ধ্যানে মানব মোক্ষ পায়? কাহার তত্ত্ব মানব জানিতে চায়? কাহার তত্ত্ব জানিবার জন্য মানব তপস্যা করে? কাহার পদে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে জীব পরম শান্তি পায়? একমাত্র পরমাত্মার।

খণ্ড জীব অখণ্ডে মিশিতে চায়। ব্রহ্ম পূর্ণ জীবও পূর্ণ; কিন্তু যেন অপূর্ণ ও খণ্ড মত সৃষ্টিলীলায় জীব ভাসিয়া যায়।

পূর্ণ আপন অংশকে আকর্ষণ করে। অংশ অংশীর কোলে যাইয়া জুড়াইতে চায়। জীব সাধারণতঃ ঈশ্বর-পরাঙ্মুখ কিন্তু সুকৃতিবশে আত্মতত্ত্বের সন্ধানের প্রবৃত্তি জাগিলে জীব আত্মাকেই লাভ করে।

মানবের একমাত্র ঈপ্সিত ও দয়িত সেই **"শিবতমো রস"** পরমাত্মা।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর কৃপায় আমাদের আত্মতত্ত্বের জ্ঞান ফুটিয়া উঠুক।

যং কাময়ে—যং যং পুরুষং রক্ষিতুম্ অহং বাঞ্ছামি।
উগ্রং কৃণোমি—তং তং পুরুষং উগ্রং কৃণোমি সর্ব্বেভ্যঃ অধিকং করোমি।

আমি (পরমাত্মা) যে যে ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী করি।

পরমাত্মা বলিতেছেন যে পরমাত্মা যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করেন।

সংসারে জীব যখন পার্থিব উন্নতির চরম সীমায় উঠে, তখন সেই অভ্যুদয়ের কারণ কি? অজ্ঞানান্ধ জীব সূক্ষ্ম কারণ দেখিতে না পাইয়া স্থূল কারণটী ধরিয়া ভ্রমে পতিত হয়। সংসারে ভীষণ দুঃখ ও যাতনার তাড়নায় জীব যখন নষ্ট-প্রায় হয়, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদোষে দারিদ্র্যের পীড়নে সংসারীজীব যখন কাতর ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, জটিল রোগের প্রাণান্তকর যাতনায় ভুগিতে ভুগিতে জীব যখন ধ্বংসের মুখে যায়, অতি প্রিয়তম ব্যক্তির বিরহ-শোকে যখন জীব জড়প্রায় হইয়া যায়, জীবের যখন নৈতিক জীবন এতই মন্দ হয় যে পুনঃ পুনঃ পাপানুষ্ঠান করিয়া তাহার আর পাপে ভয় থাকে না,—সেই

সময় এই সকল প্রকারের জীবকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে কে সমর্থ হয়?

বদ্ধজীব হইতে মুক্তপুরুষ বিল্বমঙ্গলের সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হয়?

অত্যন্ত অপাত্র ব্যক্তি কি কৌশলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ্য পাত্রে পরিণত হয়? একমাত্র পরমাত্মার ইচ্ছায় এই অসম্ভব সম্ভব হয়। যখন লোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী হয়, তখন সাধারণ জীব তাহার এই পার্থিব উন্নতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া বলে যে, পুরুষকার দ্বারাই ঐ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। জীব যখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যশস্বী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রিয়াবান্, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যবান্ হয়, তাহার ঐ উন্নতির স্থূল কারণ ঐ জীবের পুরুষকার বলিয়া সাধারণে গণ্য করে। ভ্রান্তজীব স্থূল-কারণ ভেদ করিয়া সূক্ষ্ম কারণে পৌছাইতে পারে না বলিয়াই আসল কারণ বা সূক্ষ্ম কারণ ত্যাগ করিয়া স্থূল কারণকেই প্রধান করে। **উন্নতির স্থূল কারণ পুরুষকার কিন্তু সূক্ষ্ম কারণ বা মূল কারণ, ভগবানের ইচ্ছা।** সিদ্ধা বাগ্‌দেবী পরমাত্মাভাবে বলিতেছেন যে, আমারই ইচ্ছায় জীব সর্ব্বপ্রকার পার্থিব উন্নতি লাভ করে। আমার ইচ্ছা হইলে তবে জীবের পুরুষকারের উন্মেষ হয়। যেখানে আমার ইচ্ছা না থাকে অথচ যদি জীবের পুরুষকার কার্য্য করে, সেখানে কখন কোন প্রকারের অভ্যুদয় হইতে পারে না। রহস্যের কথা হইতেছে এই, যে, **পরমাত্মার ইচ্ছা বা কৃপা না হইলে জীবের পার্থিব বা অপার্থিব কোন প্রকারের উন্নতি হইতে পারে না।** আবার জীবের **পুরুষকার ভগবানের**

বিভূতি বিশেষ। উত্তমী পুরুষের উত্তমরূপে ভগবান প্রকাশিত হন। গীতার বিভূতিযোগ অধ্যায়ে এই তত্ত্বটী পরিস্ফুট হইয়াছে।

"দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি **ব্যবসায়োঽস্মি** সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥"
১০।৩৬ "গীতা"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মাভাবে অর্জ্জুনকে নিজ দিব্য বিভূতির কথা বলিতেছেন—"ছলকারিগণের মধ্যে আমি দ্যূত বা ছল, তেজস্বীগণের তেজ আমি, জয়ীগণের জয় আমি, **উত্তমীগণের উত্তম বা পুরুষকার আমি,** সত্ত্বগুণীলোকদের সত্ত্বগুণ আমি।" শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপাখ্যান-ভাগে যে স্থরথ রাজার কথা আছে, যাহারা স্থরথ রাজার মত রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ভাগ্য-দোষে শত্রুর উৎপীড়নে ও আত্মীয় স্বজনের চক্রান্তে মেধস্ মুনিরূপী সৎগুরুর আশ্রয়ে আসিতে পারে; যাহারা আবার, স্থরথ রাজার মত, পরমাত্মার মহিমার কথা শ্রীগুরু মুখে শুনিবার সৌভাগ্য পায়; যাহারা আবার, স্থরথ রাজার মত, মাহাত্ম্য শ্রবণের পর শ্রীভগবানের আশ্রয় লাভ করিবার জন্য শ্রীগুরুর আদেশে সাধনার অনুষ্ঠান বিধিমত করিবার স্থযোগ পায়; যাহারা আবার স্থরথ রাজার মত, গুরু বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শ্রীভগবানের সম্বন্ধে, মহিমার কথা শ্রবণ করিবার পর, তদ্বিষয়ে মনন ও নিদিধ্যাসন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারে; তাহারাই কেবল, স্থরথ রাজার মত দুর্ভাগ্যের কবল হইতে মুক্ত হইয়া সৌভাগ্যের সর্ব্ব উচ্চ শিখরে উঠিতে পারে; তাহারাই কেবল স্থরথ রাজার মত, নষ্ট রাজ্য ফিরিয়া পায় এবং পার্থিব ভোগের চুড়ান্ত মন্বন্তরের অধিপতিত্ব লাভ করিতে পারে। **মহামায়ার ইচ্ছায়** ও প্রসাদে

সুরথ রাজার এই অত্যাশ্চর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পার্থিব অভ্যুদয়। সেই জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথমেই এই মন্ত্র আছে—

"মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ।
স বভুব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ" ॥২॥

"একঃ বহুস্যাম্—পরমাত্মা **ইচ্ছা** করিলেন, **এক আমি বহু হইব**। ইচ্ছা মাত্রই সৃষ্টি কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। সৃষ্টবস্তু যত কিছু আছে, সমস্তই শ্রীভগবানের ইচ্ছার ফলস্বরূপ। তাঁহার ইচ্ছায় সূর্য্য চন্দ্র সৃষ্ট হইল। তাঁহার ইচ্ছায় দেবমানব পশু পক্ষী ও ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সৃষ্ট হইল। তাঁহার ইচ্ছায় মূর্খ, পণ্ডিত, ধনী, দরিদ্র, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, ভোগী ও ত্যাগী সৃষ্ট হইল। তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতে লাগিল। তাঁহার ইচ্ছায় জীবের কর্ম্মানুসারে উচ্চনীচ গতি হইতে লাগিল। তিনিই জীবের বিধাতা বা কর্ম্মফলদাতা সাজিলেন। তাঁহার ইচ্ছায় জীবের উন্নতি অবনতি হইতে লাগিল। তাঁহার ইচ্ছায় অতি দরিদ্র কোটিপতি হইতে লাগিল। অতি নগণ্য কাঙ্গাল সুদামা তাঁহার ইচ্ছায় ধনেশ্বর হইল। সুদামাপুরী নগরী এখনও শ্রীকৃষ্ণ-সখা সুদামার ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছায় অপূর্ব্ব পার্থিব সম্পদ লাভের ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুদামার পূর্ব্বে ধন সম্পদ ছিল না। কাহার ইচ্ছায় ও কৃপায় সুদামা প্রচুর ধনশালী হইলেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বা ব্রহ্মের বা পরমাত্মার ইচ্ছায়। কাষ্ঠের নৌকা কাহার ইচ্ছায় স্পর্শ-মাত্রে সুবর্ণের নৌকা হইয়া নাবিকের ঐহিক সম্পদ আকস্মিক ভাবে আনিয়া দেয়? একমাত্র ভগবানের ইচ্ছাতেই জীব ধনে, মানে বিদ্যায় প্রতিষ্ঠায় সকল পার্থিব বিষয়ে, অতি হীন অবস্থা হইতে অতি

উচ্চ অবস্থায় যাইতে পারে। ফকির হঠাৎ আমির হয় কেন? শ্রীভগবানের ইচ্ছায়।

মূর্খ কালিদাস কিরূপে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস হইতে পারে? দেবী সরস্বতীর বা পরমাত্মার ইচ্ছায়। 'উষ্ট্র' কথা যে কালিদাসের মুখে উচ্চারিত হইত না, হঠাৎ বিদ্যায় তিনি কিরূপে এরূপ ভূষিত হইলেন যে এখনও পর্য্যন্ত জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া কালিদাস পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এখানে কালিদাসের বিদ্যাচর্চ্চার জন্য পুরুষকার-প্রয়োগ দেখা যায় না। তাঁহার ইচ্ছায় মান, যশঃ, বিদ্যা, অর্থ প্রতিষ্ঠা সমস্ত পার্থিব সম্পদ কালিদাসের পুরুষকারের সাহায্য না লইয়া কালিদাসকে আশ্রয় করিয়াছিল। সুতরাং জগতে জীবের পার্থিব উন্নতির সূক্ষ্ম কারণ শ্রীভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

চাঁদ সদাগরের উপাখ্যান, শ্রীমন্তের মশান-কথা, কালকেতু-কাহিনী —সর্ব্বত্রই পরমাত্মার ইচ্ছায় ও প্রসাদে, জীবের দুর্ভাগ্য ঘুচিয়া সৌভাগ্য প্রাপ্তির বিবরণ পাওয়া যায়।

পরমাত্মার ইচ্ছার এত প্রাধান্য বলিয়াই তাঁহার এতই মহিমা! ভগবানকে শাস্ত্রে সেইজন্য **লীলাময়—ইচ্ছাময়—** বলিয়াছে; মহামায়াকে বা ব্রহ্মশক্তিকে লীলাময়ী, ইচ্ছাময়ী বলিয়াছে।

যখন পরমাত্মা ইচ্ছা করিলেই সাধারণ ব্যক্তিকে ধনে মানে অসাধারণ করিয়া দিতে পারেন, তখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য শ্রীভগবানের এরূপ প্রসন্নতা লাভ করা, যাহাতে তিনি আমাদের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার অমোঘ ইচ্ছাশক্তিকে আমাদের কল্যাণার্থে ও পার্থিব অভ্যুদয়ার্থে, প্রয়োগ করেন। আমরা তাঁহার শরণাগত হইয়া থাকিতে পারিলে, তাঁহার ইচ্ছায় ও কৃপায় আমরা সম্পদে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে পারি।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ান থাকিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যে অপূর্ব্ব উপদেশ দিয়াছেন, তাহা কাহার ইচ্ছায় ঘটিয়াছিল? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপন শ্রীমুখেই সেই রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান ভীষ্মদেবকে বলিলেন—"দেখ, শান্তনু-নন্দন! যুধিষ্ঠিরকে তত্ত্ব উপদেশ দিবার মত উপযুক্ত ব্যক্তি এখানে আরও কয়েকজন আছেন। বেদব্যাস অষ্টাদশ মহাপুরাণ, মহাভারত, ব্রহ্মসূত্র, ভাগবত প্রভৃতি রচনা করিয়া যে অক্ষয় যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে এ ক্ষেত্রে তিনি যে উপদেষ্টার কার্য্য খুব ভাল-রূপেই করিতে পারেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে উপদেশ দিয়া শান্তি আনিলে বেদব্যাসের অক্ষয় যশের মাত্রা বাড়িবে না। আমি শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যুধিষ্ঠিরের উপদেষ্টা সাজিব না। তুমি আমার একান্ত ভক্ত। তোমাকে ভারত ইতিহাসে **অমর করিয়া রাখিবার জন্য**,, আপদ্ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিবার জন্য তোমাকে আমি এক্ষেত্রে বক্তার পদ দিব, **ইচ্ছা করিয়াছি**। তোমার শরীরে এখন মৃত্যু-যাতনা হইতেছে বলিয়া তুমি কাতর হইয়াছ। তুমি ভাবিতেছ, মরণ-পথের পথিক হইয়া তোমার মন স্থির নাই, শাস্ত্র বিস্মৃত হইয়াছ, কেমন করিয়া যুধিষ্ঠিরের অশান্ত হৃদয়ে শান্তি আনিবে? আমি সমস্ত জানি। আমি সমস্ত দেখিয়াছি। **আমি সত্য-সঙ্কল্প। আমার ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে।** তোমাকেই উপদেষ্টা হইতে হইবে। তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। আমি আমার পদ্মহস্ত তোমার মস্তকে স্থাপন করিতেছি, তোমার সমস্ত যাতনা আমার স্পর্শ মাত্রই দূর হইয়া যাইবে; তোমার চিত্ত স্থির হইবে; তুমি প্রকৃতিস্থ হইবে। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইবে। সমস্ত

শাস্ত্রের দিব্য জ্ঞান তোমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে। তুমি যুধিষ্ঠিরের আচার্য্যের কাজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবেই করিতে পারিবে।" ভগবানের ইচ্ছায় ও কৃপায় মুমূর্ষু ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে অমূল্য উপদেশ দিয়া শান্তি দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই আমাদের ভগবান! আর এই আমাদের ভগবানের ইচ্ছা শক্তি! তাঁহার ইচ্ছায় কি না হইতে পারে? সকল অসম্ভবই সম্ভব হইতে পারে।

জগতে যতগুলি কীর্ত্তিমান্ পুরুষের কাহিনী আমরা শুনিতে পাই, সকলের উন্নতির মূলে এই ভগবদ্ ইচ্ছা আছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুনের মনে যে মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, যে মোহের ফলে অর্জ্জুনের হৃদয়ে যুদ্ধে বিরক্তি ও অনুৎসাহ জন্মিয়াছিল; সেই সাজ্ঘাতিক মোহ ও হৃদয়-দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য ভগবানের যে যুক্তিপূর্ণ উপদেশ, যে সনাতন সত্য কথা শ্রীগীতা গ্রন্থের বিষয়, তাহা পাঠ করিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, শ্রীভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অর্জ্জুন ভগবানের সখা হইয়াও দাঁড়াইতে সক্ষম হন নাই। মোহাচ্ছন্ন ক্ষত্রিয়বীর অর্জ্জুনের মনে শান্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব জাগিতে না জাগিতেই ভগবান বুঝাইয়া দিলেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ।" আরও বুঝাইয়া দিলেন, জীব আপন প্রকৃতির বশীভূত এবং সেই প্রকৃতিই ভগবানের একটী রূপ। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে না চাহিলেও, অর্জ্জুনের প্রকৃতি অর্জ্জুনকে অবশ করিয়া অর্জ্জুনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিবে। আরও বুঝাইলেন ও দেখাইলেন যে, **জীব নিমিত্ত মাত্র সকল কর্ম্মের কর্ত্তা একমাত্র ভগবান্**। কর্ণ দ্রোণাদি বীর-গণকে বহুপূর্ব্ব হইতেই নিয়তিরূপে ভগবানই বধ করিয়া রাখিয়াছেন।

অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া, উপলক্ষ করিয়া, তিনি ঐ সকল মহাবীরগণকে বধ করিবেন। সুতরাং ভীষ্ম দ্রোণাদি গুরু ও আচার্য্য বধ আশঙ্কায় অর্জ্জুনকে ভীত হইতে হইবে না। কারণ, **অর্জ্জুন, ভীষ্ম দ্রোণাদি বধের কর্ত্তা নহে। ভগবানের ইচ্ছায় অর্জ্জুন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর হইয়াছিল**। ভগবান ভক্ত-সখা অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবার জন্যই যুদ্ধে রথচক্র ধারণ করিয়া নিরপেক্ষতা ও আপন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। **নিরপেক্ষ ভগবানের এই ভক্ত রক্ষার জন্য 'নিরপেক্ষতা-ভঙ্গই ভগবানের বিশিষ্টতা—ভগবানের ভগবানত্ব**। ভগবানের ইচ্ছাতেই **সুভদ্রাহরণ** সম্ভব হইয়াছিল। আপন অংশ সাক্ষাৎ অনন্তদেব বলরাম পর্য্যন্তও সেই ভগবৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াও অর্জ্জুনের সুভদ্রা-হরণ নিবারণ করিতে পারেন নাই। কি দেহের কান্তি, কি সংযম, কি বীরত্ব, কি তপস্যা, কি চরিত্র, সকল বিষয়ে অর্জ্জুন ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন, কেবল মাত্র শ্রীভগবানের ইচ্ছায়। শ্রীভগবান দুর্য্যোধনকে আপন নারায়ণী সেনা দিয়া স্বয়ং অর্জ্জুনের রথের সারথি সাজিয়াছিলেন কেন? কেবল মাত্র ভগবান অর্জ্জুনকে মহাসমরে রক্ষা করিবার ও অর্জ্জুনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাবীর করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়া। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ বধের বৃত্তান্ত পড়িলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ভগবান কি অপূর্ব্ব কৌশলে অর্জ্জুনের প্রতিষ্ঠা ও যশ বৃদ্ধি করিবার জন্য কি সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অপরাজেয় ভীষ্মদেব শ্রীভগবানের ইচ্ছায় অর্জ্জুনের দ্বারায় পরাজিত হইলেন। ভীষ্মদেব অর্জ্জুন অপেক্ষা বীরত্বে এত বড় যে অর্জ্জুনের হস্তে ভীষ্মদেবের পরাজয় কেহ ধারণা করিতে পারে না। সরল পথে অর্জ্জুনের দ্বারা ভীষ্মের পরাজয় অসম্ভব জানিয়া, শ্রীভগবান আপন একান্ত ভক্ত অর্জ্জুনকে ভীষ্মদেবের অপেক্ষা যশস্বী করিবার জন্য,

কুটিল পথ অবলম্বন করিলেন। সেইজন্য শিখণ্ডীর আবির্ভাব। মহাবীর আচার্য্য দ্রোণ ব্রাহ্মণ হইয়াও ধনুর্বিদ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেই দ্রোণের শিষ্য অর্জ্জুনের দ্বারা দ্রোণবধ অসম্ভব জানিয়া শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর প্রতিপন্ন করিবার জন্য সরল পথ ছাড়িয়া কুটিল পথ অবলম্বন করিলেন ; সেইজন্য "অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ" এই বাক্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখে উচ্চারণ করাইয়া তিনি আচার্য্য দ্রোণকে পাতিত করিলেন ও অর্জ্জুনের যশঃ বর্দ্ধিত করিলেন। আবার সরল পথ ধরিয়া থাকিলে সূর্য্য পুত্র কর্ণকে অর্জ্জুনের বধ করা একপ্রকার অসম্ভব জানিয়া, শ্রীভগবান কুটিল পথ অবলম্বন করিলেন। দানবীর কর্ণের নিকট হইতে কৌশলে তাঁহার রক্ষা-কবচ ও কুণ্ডল সরাইয়া ফেলিলেন। সেজন্য কর্ণ-বধ হইল ও অর্জ্জুনের প্রতিষ্ঠা হইল।

ভগবান যাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাহার নাশ নাই। ভক্ত ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, সেজন্য সর্ব্বদা ভগবানের আশ্রয়ে থাকায়, ভক্ত নির্ভয়ে বাস করে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন ঃ—

"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

আমার ভক্ত নষ্ট হয় না।

অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে উত্তরার গর্ভে অভিমন্যুর ঔরস জাত সন্তান পরীক্ষিতের জীবন বিপন্ন হইয়াছিল। যখন পাণ্ডবকুলের একমাত্র বংশধর ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল, তখন এই ভগবানের ইচ্ছাতেই ও কৃপায় গর্ভস্থ বালক পরীক্ষিতের জীবন রক্ষা পাইল। পঞ্চপাণ্ডবের একমাত্র আশ্রয় দাতা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এই ভগবানই অন্ধ রাজা ধৃত-রাষ্ট্রের হিংসাপূর্ণ মারাত্মক আলিঙ্গন হইতে মধ্যম পাণ্ডবকে রক্ষা

করিবার জন্য কুটিল পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হইলে যখন পঞ্চ পাণ্ডব জয়ী হন ও কুরুকুল ধ্বংস হয়, তখন পুত্রশোকে উন্মত্ত অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র নিদারুণ প্রতিহিংসা লইবার জন্য বন্ধুত্বের ভাণ করিয়া বিজেতা ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছিলেন। ভগবান পার্শ্বে থাকিয়া সহায় না থাকিলে স্বার্থপর হীনচেতা ধৃতরাষ্ট্রের চক্রান্তে পঞ্চ পাণ্ডবের একজন সেই অশুভক্ষণে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিত। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ", এই নীতি অবলম্বন করিয়া ভগবান আপন ভক্ত ভীমসেনকে ধূর্ত্ত ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে যাইতে দিলেন না। ভীমসেনের পরিবর্ত্তে একটী লৌহময় ভীমের প্রতিমূর্ত্তি ধৃতরাষ্ট্রের বাহুপাশে ভগবান স্থাপন করিলেন। পঞ্চপাণ্ডব ও সমস্ত সভ্যজগত দেখিলেন ধৃতরাষ্ট্র হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন ক্রোধ ও হিংসা প্রকাশ করিয়া ভীমসেনকে বধ করিবার জন্য এত দৃঢ়রূপে সেই লৌহময় ভীমের প্রতিমূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিলেন যে সেই লৌহময় ভীমেরপ্রতিমূর্ত্তি চূর্ণ হইয়া গেল। আসল জীবন্ত ভীমসেন অক্ষত অবস্থায় রহিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের **পাণ্ডবনাথ** নামধারণ সার্থক হইল।

শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্যে যেমন শরণাগত দেবগণকে অসুরের পীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য ও অধিকারচ্যুত দেবগণের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যযুগে পরমাত্মার স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া **দুর্গা** ও **কালী** মূর্ত্তিতে অবতার-লীলার কথা আছে, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে সেই পরমাত্মারই পুরুষ মূর্ত্তিতে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতার লীলার কথা **রামায়ণ** ও **মহাভারতে** আছে।

আমরা সকলেই ধন, মান, প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল। আমাদের বড় সাধ আমরা সর্ব্ববিষয়ে সুখী হই। আমাদের সেই সাধ ষোল আনা পূর্ণ হয় না কেন? আমাদের ইচ্ছায় আমাদের ইষ্টসিদ্ধি হয় না কেন?

তাহার কারণ, আমরা ভগবানের মত সত্যসংকল্প নহি। তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হয়। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক গাছি তৃণকেও কেহ স্থানচ্যুত করিতে পারে না। **কেনোপনিষদে** ব্রহ্মের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া অগ্নি ও বায়ু দেবতাদের অহঙ্কার চূর্ণ হওয়ার ও লাঞ্ছনার কথা আছে।

তিনি যাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, নিখিল বিশ্ববাসীগণ এক যোগে চেষ্টা করিলেও তাহাকে নষ্ট করিতে পারে না। ভক্ত প্রহ্লাদকে পর্ব্বতের উপর হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, হস্তী পদতলে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল; কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হইল না কেন? ভক্তের ভগবান তাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়া। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের পুণ্যময় জীবনী পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবানের আশ্রিত হইতে পারিলে জীবের সকল আপদ বিপদ দূরে যায় ত বটেই, পরন্তু পার্থিব সম্পদ যদি কেহ কিছু চায়, তবে তাহার আশার অতিরিক্ত ভোগ ঐশ্বর্য্য তাহার লাভ হয়। কল্পতরুর তলে বসিয়া প্রার্থনা করিলে জীবের সকল সাধ পূর্ণ হয়। **তাঁহার আশ্রিত জীব হীন হইয়া সংসারে থাকে, একথা এ পর্য্যন্ত কোনও স্থানে শুনিতে পাওয়া যায় নাই।**

লঙ্কেশ্বর দশানন পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী হইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। সগুণ ব্রহ্মের বরে তিনি তাঁহার প্রার্থনা মত নর-বানর ব্যতীত অপর সকল প্রাণীর অবধ্য হইলেন। রাবণের এই পার্থিব অভ্যুদয়ের মূলে ব্রহ্মারূপী পরমাত্মার ইচ্ছা ও কৃপা রহিয়াছে।

রাবণের অনুজ বিভীষণ যখন রাবণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত

হইয়া শ্রীরামচন্দ্ররূপী পরমাত্মার আশ্রয়ে আসিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের শিবিরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন ভগবান উপস্থিত সচিব সুগ্রীব, জাম্বুবান, নল, নীলাদি, অনুচরগণের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রামানুচরগণ যুদ্ধের প্রারম্ভে শত্রুভ্রাতা বিভীষণকে রামচন্দ্রের শিবিরে বন্ধুভাবে স্থান দিতে মত দিলেন না। মায়াবী রাক্ষসকে বিশ্বাস করিলে পাছে মন্ত্রগুপ্তি নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে বিভীষণকে মিত্রভাবে কেহই গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"আমাকে শ্রীভগবান বোধে যদি কোন জীব একবার মাত্র আমার আশ্রিত হইয়া বলে, 'হে ভগবন্ **আমি (জীব) তোমার,** আমি সেই প্রপন্ন জীবকে সকল প্রাণী হইতে অভয় দিয়া থাকি। এইরূপভাবে আশ্রিতের প্রার্থনা পূরণ করাই আমার ব্রত।"

"সকৃদপি প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যঃ দদাম্যেতৎ ব্রতং মম॥"

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

শ্রীভগবানের ইচ্ছায়, বিভীষণ রাক্ষসকুলে জন্মলাভ করিয়াও ঈশ্বর পরায়ণ হইলেন, রামচন্দ্রের লীলা-সহচর হইলেন, রাবণের ধ্বংসের পর লঙ্কার সিংহাসনে বসিয়া নির্ব্বিবাদে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিলেন, এবং অবশেষে অমর হইয়া রহিলেন।

বালী-বধ ব্যাপারেও ঠিক এইভাব দেখা যায়। সুগ্রীব বালী অপেক্ষা অনেক দুর্ব্বল। অথচ আশ্রিত সুগ্রীবকে রক্ষা ও রাজা করিবার জন্য, শ্রীরামচন্দ্র দৃশ্যতঃ অন্যায় যুদ্ধে বালী বধ করিলেন। শ্রীরামরূপী **পরমাত্মার ইচ্ছায়** অতি দুর্ব্বল সুগ্রীবের শ্রীভগবানের আশ্রয়ে আসিয়া ভাগ্য ফিরিয়া গেল।

তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্—তাহাকে ব্রহ্মা করিয়া থাকি, তাহাকে ঋষি করিয়া থাকি, তাহাকে উত্তম মেধাবী করিয়া থাকি। পরমাত্মার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্যের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। আমাদের পৃথিবীর মত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বজগতে অনেকগুলি আছে। এক একটী ব্রহ্মাণ্ডের জন্য একটী করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের প্রয়োজন। সুতরাং অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটী ব্রহ্মা, অনন্ত কোটী রুদ্র আছেন। পরমাত্মার ইচ্ছায় এই অনন্ত কোটী বিষ্ণুর ও অনন্তকোটী রুদ্রের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। ব্রহ্মাও অমর নহেন। দৈবী বৎসর গণনায় ব্রহ্মার আয়ু শত বৎসর। প্রেমিক সাধক **বিদ্যাপতি** এই ভাবটী এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন:—"কত চতুরানন, মরি মরি আওত (যাওত) সাগর লহরী সমানা॥"

কল্পান্তে নূতন সৃষ্টিপর্ব্ব আরম্ভ হইলে, পূর্ব্ব কল্পের অনন্ত কোটী জীবের অনন্ত কোটী লীন ও প্রচ্ছন্ন কর্ম্মসংস্কার প্রকটিত করিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের প্রয়োজন হয়। পূর্ব্বকল্পের ব্রহ্মা পরকল্পের ব্রহ্মার পদ নিশ্চয় পাইবেন, এমন ব্যবস্থা নাই। নব সৃষ্টির পর্য্যায়ে ব্রহ্মার পদে পূর্ব্বকল্পের কোন এক বিশিষ্ট ভক্তকে তাহার প্রার্থনা অনুসারে পরমাত্মা অভিষিক্ত করেন। ব্রহ্মা আদি কবি, লোক-পিতামহ, সর্ব্বজ্ঞ, জগতে বেদের প্রচারক ও সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি। ব্রহ্মাকে সগুণ ব্রহ্ম বলে। সেইরূপ বিষ্ণু ও রুদ্রকেও সগুণ ব্রহ্ম বলা হয়। সুতরাং ব্রহ্মার পদ নির্গুণ ব্রহ্মের বা পরমাত্মার অতি সন্নিকট। নির্গুণ ব্রহ্ম যখন আপন মায়াশক্তির সংযোগে মায়াধীশ হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্যের জন্য জগতে প্রকাশিত হন, তখন তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন নামে ও মূর্ত্তিতে অভিহিত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বরের আবির্ভাবকে সগুণ অবতারের লীলারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরমাত্মা ইচ্ছা করিলে কোন একটী সৌভাগ্যবান জীবকে আপনার সগুণ অবতাররূপে প্রকাশ করিতে ত' পারেনই, পরন্তু ব্রহ্মার পদের অপেক্ষা উচ্চস্থান ব্রহ্মের **পরম ধাম** তাঁর কৃপা পাত্র ভক্তকে প্রদান করিতে পারেন। ব্রহ্মার পদ পার্থিব এবং অপার্থিব অভ্যুদয়ের সর্ব্বোচ্চসীমা। পরমাত্মা যখন স্বেচ্ছায় ভক্তের অধীন হন, তখন ইচ্ছামাত্রেই কোন প্রাণিকে অপার্থিব উন্নতির শিখরে স্থাপন করিতে পারেন। ভক্তের নিকট ব্রহ্মার পদ লোভনীয় নহে; কিন্তু যদি কোন ভক্ত ব্রহ্মা হইবার জন্য তপস্যা করেন, ভগবৎ ইচ্ছায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মা হইতে পারেন। অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা ভক্ত ভগবানকে প্রসন্ন করিতে পারেন এবং সেই প্রসন্নতার ফলে ভক্তের অভীষ্ট পূর্ণ হয়। ভক্তির শক্তি এতই আশ্চর্য্য ও অলৌকিক! শ্রুতি বলিয়াছেন —**"ভক্তি-বশঃ পুরুষঃ"** (ব্রহ্ম)। পরমাত্মা এক মাত্র ভক্তি দ্বারা লভ্য হন; সেইজন্য পরমাত্মা বলিতেছেন—"আমি ইচ্ছা করিলে আমার ভক্তকে আমি আর এক কল্পের ব্রহ্মার পদ পূর্ব্ব হইতেই দিয়া রাখিয়া থাকি।" পরমাত্মা যখন মহিষমর্দ্দিনীরূপে দেবগণের সমষ্টি তেজের ফলস্বরূপ বিচিত্র বিশাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন তখন সেই দিব্য দেবীর শ্রীঅঙ্গে ব্রহ্মার স্থান কোথায় ছিল? মায়ের রক্ত কমল তুল্য পাদপদ্ম যুগল ব্রহ্মার আশ্রয়ের স্থান হইয়াছিল। রক্তবর্ণ ব্রহ্মার তেজে মায়ের সেই অলৌকিক পাদপদ্মযুগল গঠিত হইয়াছিল।

"ব্রহ্মণঃ তেজসা পাদৌ। (শ্রীশ্রীচণ্ডী)।২॥

ব্রহ্মার স্থান যদি দুর্গা-অবতাররূপী পরমাত্মার পাদদ্বয়ে হয়, এবং

সেই পাদপদ্ম যদি তিনি অতি প্রিয়তম ভক্তকে প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে **পাদপদ্ম যে বস্তু, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বও সেই বস্তু**। ভক্ত সাধক গোবিন্দ চৌধুরী কৃত একটী সঙ্গীতে আছে "ব্রহ্মা আমার অলক্ত-জল"। শ্রীভগবান যখন ভক্তকে পার্থিব অপার্থিব সমস্ত সম্পদ দিয়া থাকেন, তখন ব্রহ্মার পদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও তিনি দিতে কুণ্ঠিত হন না। ভক্তের নিকটে ভগবানের কিছুই অদেয় নাই। শ্রীশ্রীদেবী ভাগবতে শঙ্খচূড়ের উপাখ্যানে দেখা যায় যে ভক্ত শঙ্খচূড় তপস্যার দ্বারা শ্রীভগবানকে প্রসন্ন করিয়া অতি দুর্লভ শ্রীভগবানের শক্তিস্বরূপা লক্ষ্মীদেবীকে পত্নীরূপে কামনা করিয়াছিলেন। ভক্তের এই বিসদৃশ প্রার্থনাও ভগবান পূর্ণ করিয়াছিলেন। তুলসীদেবীরূপে মা লক্ষ্মীর শঙ্খচূড়ের গৃহিণী হওয়া শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সম্ভব হইয়াছিল। ব্রহ্মার পদ শ্রীভগবানের লক্ষ্মীদেবীর পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। মহাভারতে যখন আমরা শ্রীভগবানকে ভক্তের নিকট নিজেকে নিজে বিলাইয়া দিতে দেখিতে পাই, যখন দুর্য্যোধনকে নারায়ণীসেনা ও অতি প্রিয়তম ভক্ত-সখা শ্রীঅর্জ্জুনকে তাহার রথের সারথি হইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপী পরমাত্মা আপনাকে আপনি বিলাইয়া দিয়াছিলেন, তখন তিনি ইচ্ছা করিলে এ বিশ্বজগতে কোন্ বস্তু না ভক্তের প্রার্থনামত প্রদান করিতে পারেন ?

পরমাত্মা যাহাকে ইচ্ছা করেন সে অতি সামান্য ও অত্যন্ত দুরাচার জীব হইলেও তাহাকে ত্রিকালজ্ঞ ঋষি করিতে পারেন। যিনি প্রত্যক্ষ ভেদ করিয়া পরোক্ষ দর্শন করিতে পারেন, তিনি ঋষি ; যিনি মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া **'অস্তি-ভাতি-প্রিয়"** স্বরূপ চৈতন্যকে দেখিতে পান, যিনি স্থূল ভেদ করিয়া সূক্ষ্মকে বুঝিতে পারেন, যিনি প্রতি জড় বস্তুর অন্তরালে চৈতন্যের খেলা দেখিতে পান, যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, যিনি

"সত্যং-শিবং-সুন্দরম্"কে উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি পরম পবিত্র, পরম জ্ঞানী, পরম শান্ত ও অতি মহান্ তিনিই ঋষি! যিনি জগতের উপদেষ্টা, যিনি জগতের মঙ্গলকামী, যিনি ব্রহ্মপরায়ণ, যিনি জগতে কাহারও প্রতি হিংসা করেন না, যিনি জীবের দুঃখ ও দৈন্য দেখিয়া বিগলিত-হৃদয় হন, যিনি পরম দয়ালু, বিশাল গগনের মত যাঁহার উদার হৃদয়, যিনি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা, যিনি সর্ব্বদা ভয়শূন্য অবস্থায় থাকেন, যিনি মরণজয়ী, যিনি সর্ব্বদা ভগবানে যুক্ত থাকেন, যিনি কখন কাহাকেও উদ্বেগ প্রদান করেন না, যিনি কর্কশ বাক্যের দ্বারা অকারণে কাহারও মনঃপীড়া দেন না, যাঁহার সংস্পর্শে আসিলে হিংস্র পশুও তাহার স্বাভাবিক হিংসা প্রবৃত্তি ভুলিয়া যায়, যিনি শান্তিধামের অধিকারী হইয়া ত্রিতাপে তাপিত কাতর সংসারী জীবকে জুড়াইয়া দিবার জন্য আশ্রমে বাস করেন, কাম ক্রোধাদি রিপু যাঁহার বশীভূত, যাঁহার জীবন বহুলোকের কল্যাণের জন্য ও বহুলোকের শান্তিসুখের জন্য—তিনিই ঋষি। ঋষিভাব জগতে দুর্লভ। এমন কি দেবলোকেও মহাদুর্লভ বলিয়া পূজার যোগ্য। এই অমূল্য ঋষিত্ব শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ও করুণায় সামান্য জীবও লাভ করিতে পারে।

অতি নিন্দিত রত্নাকর দস্যু পরমাত্মার ইচ্ছায় মহামুনি বাল্মিকী-রূপে পরিণত হইয়াছিলেন। ত্রিলোক-পাবন **"রাম"** নাম প্রচার, অমৃতময় রাম কথার সৃষ্টি, এই রত্নাকর দস্যুর দ্বারা পরমাত্মা সাধন করিয়াছিলেন। রত্নাকরের তুল্য অপাত্র জগতে পাওয়া যায় না। সেই লোকনিন্দিত দস্যু এতই অপাত্র ছিল যে জিহ্বায় রামনাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে পারিত না। তথাপি পরমাত্মা ইচ্ছা করিলেন যে তাহাকে ঋষি করিবেন ও শ্রীরামচন্দ্রের জগতে অবতাররূপে আবির্ভাব

হইবার পূর্ব্বেই লোকপাবন রামায়ণ গ্রন্থ তাহার দ্বারা রচিত হইবে। কেহ কখন স্বপ্নেও এই পরিবর্ত্তন, দস্যুত্ব হইতে ঋষিত্ব প্রাপ্তি, ধারণা করিতে পারে না। তথাপি অপূর্ব্ব উপায়ে এই অসম্ভব ব্যাপার পরমাত্মার ইচ্ছায় সম্ভব হইয়াছিল।

মহাত্মা সিদ্ধসাধক বিল্বমঙ্গলের সৃষ্টি এইরূপ অলৌকিক ব্যাপার। বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বজীবন রত্নাকর দস্যুর মত অতি ঘৃণিত ছিল। ভগবান ইচ্ছা করিলেন যে পাপময় জীবন হইতে একটী নিষ্পাপ ঋষির জীবন গঠিত হউক। তাঁহার ইচ্ছায় বিল্বমঙ্গলের ভাবপরিবর্ত্তন এক প্রকার অসম্ভব হইলেও সম্ভব হইয়াছিল।

ভগবানের ইচ্ছায় বদ্ধজীবের ন্যায় ভোগী তুলসীদাস ভগবানের ভক্ত ও আশ্রিত হইয়া নিজজীবনের গতি ভোগের পথ হইতে ত্যাগের পথে ফিরাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মহাত্মা তুলসী শেষজীবনে সিদ্ধ হইয়া যে ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। তুলসীর পূর্ব্বজীবন এবং সাধনায় সিদ্ধ হইবার পরজীবন তুলনা করিলে আকাশ পাতাল প্রভেদ হয়। কেবলমাত্র শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ও করুণায় সংসারী তুলসীদাস মহাত্মা ও প্রাতঃস্মরণীয় তুলসীদাস হইতে পারিয়াছিলেন। তুলসীদাসের দোঁহাবলী, হিন্দীরামায়ণ ও বিনয়পত্রিকা নামক অপূর্ব্ব রচনা সকল পাঠ করিলে এবং তুলসীদাসের অপূর্ব্ব ভাবপরিবর্ত্তন স্মরণ করিলে, শ্রীভগবানের মহিমার কথা আমাদের প্রাণে জাগিয়া উঠে ও হৃদয় শ্রীভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি নারদের পূর্ব্বজন্মের কথা আছে। নারদ-রূপে তিনি আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্মণের প্রসাদভোজী ও ব্রাহ্মণসেবাপরায়ণ দাসীপুত্র ছিলেন। ঋষি হইবার কোন উপাদানই তাঁহার আধারে ছিল না। পরমাত্মার ইচ্ছায় তাঁর এরূপ সৌভাগ্য

হইল যে তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেন; ভগবান বেদব্যাসের গুরু হইলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের উপাদান চতুঃশ্লোকী ভাগবত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নিকট প্রকাশ করিলেন, শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ভক্তশ্রেষ্ঠ ধ্রুবকে দীক্ষা দান করিলেন, জগতের দুঃখে কাতর হইয়া নিজপিতা ব্রহ্মার নিকট হইতে **লঘুপায়ে বা ভগবানের নাম অবলম্বন** করিয়া উপাসনা করিবার কৌশল লাভ করিয়াছিলেন, নারায়ণের চিরসহচর, প্রিয়ভক্ত ও অন্তরঙ্গ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পূর্ব্বজন্মের দাসীপুত্রের এই অপূর্ব্ব ঋষিত্বলাভ একমাত্র শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ও করুণায় সাধিত হইয়াছিল।

শাস্ত্রের মর্ম্ম অতি গূঢ়। অতি বুদ্ধিমান লোকও শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। শাস্ত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য একটী নূতন বুদ্ধির প্রয়োজন হয়—তাহার নাম **মেধা বা শাস্ত্রোজ্জ্বলা-বুদ্ধি**। কোটী কোটী মেধাহীন জীবের মধ্যে শ্রীভগবান যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে উত্তম মেধা প্রদান করেন, আত্মজ্ঞানধারণোপ-যোগী বুদ্ধি প্রদান করেন। বিষয়-মলিন বুদ্ধিতে বিচার করিলে আত্মতত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। জীব অপার্থিব উন্নতির প্রথম সোপানে উঠিলে তাহার শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি ফুটিয়া উঠে। শাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে, মন্ত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া মন্ত্রজপ করিতে পারিলে, শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে আচরণ করিয়া নিজের জীবন যাপন করিতে পারিলে, তবেই জীবের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবার আশা পূর্ণ হইতে পারে। সাধনার প্রথম জীবনে জীবের মেধাবী হওয়া প্রয়োজন। নিরক্ষর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদর্শনের পর বেদ বেদান্তের তত্ত্ব উপদেশ করিতে কোন কষ্টবোধ করে না। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় যেমন অনেক অসম্ভব সম্ভব হয়, বদ্ধজীবের সুমেধা হওয়াও সেই

প্রকার একটী অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হইয়া থাকে। ভক্ত প্রার্থনা করেন **"নামে রুচি, জীবে দয়া"**। ভক্ত আরও প্রার্থনা করেন "হে অন্তর্য্যামি! আমার এই জ্ঞান তোমার তত্ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ নয়, তুমি আমায় এরূপ বুদ্ধি প্রদান কর যাহাতে আমি তোমার তত্ত্ব ধারণা করিতে পারি।"

ভগবানও আশ্রিত ভক্তকে সেই বিচিত্র বুদ্ধি দান করেন যাহার দ্বারা ভক্ত অনায়াসে তাঁহাকে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট লক্ষণে বুঝিতে পারে।

"দদামি বুদ্ধিযোগং তম্" (গীতা)

আমরা নিত্য পরমাত্মার নিকট সুমেধা হইবার জন্য প্রার্থনা করি। গায়ত্রীতে বলি—

"ধিয়োঃ নঃ প্রচোদয়াৎ।"

অর্থাৎ হে ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মস্বরূপ-গায়ত্রি। **আমাদের বুদ্ধিকে তোমার জ্ঞানে ও ধ্যানে প্রেরণ কর।**

গায়ত্রীদেবী নিত্য উপাসনায় তুষ্টা হইলে তাঁহার ইচ্ছায় জীব সুমেধা হইয়া পড়ে।

গুরুসেবার ফলেও জীব, পরমাত্মার ইচ্ছায়, উত্তম মেধাবী হইতে পারে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য ইচ্ছামাত্রেই মূর্খ শিষ্য ত্রোটককে সুমেধা **ত্রোটকাচার্য্য** করিয়াছিলেন। মোহমুদ্গার স্তোত্র সংস্কৃত ভাষায় ভগবান শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত। কিন্তু গুরু-সেবাপরায়ণ শিষ্য ত্রোটকের নামে মোহমুদ্গরের স্তোত্রের ছন্দের নাম হইল ত্রোটকছন্দ।

আমরাও সামান্য জীব কিন্তু গুরুও শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস করিয়া উপাসনা করিতে থাকিলে আমরাও আমাদের ইষ্টদেবতার কৃপায় নিশ্চয়ই মার্জ্জিত বুদ্ধি সম্পন্ন হইতে পারিব।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর কৃপায় আমাদেরও শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি ফুটিয়া উঠুক।

মন্ত্র

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবাউ।
অহং জনায় সমদং কৃণোমহং দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ॥ ৬॥

অনুবাদ

আমি (পরমাত্মা) রুদ্রের শরাসন, ব্রাহ্মণদ্বেষী হিংস্র ত্রিপুর বধের জন্য, জ্যাযুক্ত করিয়াছি। আমিই স্তোতৃগণের জন্য যুদ্ধ করিয়া থাকি। আমিই অন্তর্য্যামী-রূপে স্বর্গ ও পৃথিবীতে আবিষ্ট হইয়া আছি।

অথবা—

আমি ব্রহ্মজ্ঞান বিরোধী—অতএব বিনাশ-যোগ্য রুদ্রকে (অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয়কে হনন করিবার জন্য প্রণবরূপী ধনুতে আত্মা-রূপ শর যোজনা করিয়া থাকি। এই রূপে আমিই জনসমূহের জন্য যুদ্ধ করি। আমি স্বর্গ, মর্ত্ত, উভয় লোকে সর্ব্ব প্রকারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছি।

আলোচনা

অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাগ্‌দেবী পরমাত্মাভাবে কথা কহিতেছেন। **নিজের প্রাণকে বিশ্বপ্রাণরূপে দেখিয়া** সেই বিশ্বপ্রাণকেই লক্ষ্য করিয়া বাগ্‌দেবী বলিতেছেন যে আমার আত্মা এখন আর ক্ষুদ্র জীবাত্মা নাই পরন্তু বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মায় পরিণত হইয়াছে। বাগ্‌দেবী নিজের আত্মাকে সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা অনুভব করিয়া দেবীসূক্তের আটটী মন্ত্র বলিয়াছেন। এইটী দেবীসূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্র।

পুরাণে ত্রিপুর নামক অসুর-বধের, যে উপাখ্যান আছে তাহাতে দেখা যায় যে সেই দুর্দ্দান্ত ব্রাহ্মণদ্বেষী হিংস্র অসুরকে, রুদ্রদেব বধ করেন। মহাদেব ত্রিপুরাসুর বধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু শিবের ধনুতে জ্যা আরোপন করিয়া তবে সেই ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ দ্বারা ত্রিপুরাসুর বধ হইয়াছিল। এখন শিবের ধনু আনমিত করিয়া তাহাতে জ্যা আরোপন করিল কে? শিব করেন নাই। দেবীসূক্তের অহং বা পরমাত্মা বলিতেছেন যে আমিই শিবের ধনুকে নমিত করিয়া জ্যা-যুক্ত করিয়াছিলাম বলিয়া শিব সেই ধনুতে বাণ সংযোগ করিয়া ত্রিপুরাসুরকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভ্রান্ত জীব মনে করিতে পারে যে রুদ্রদেব স্বয়ংই ধনুতে জ্যা আরোপন করিয়া সেই ধনুতে শরসন্ধান পূর্ব্বক ত্রিপুর বধ করিয়াছিলেন। ত্রিপুর-বধের জন্য মহাদেব যে শরাসন ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমিই (পরমাত্মা) আপন ব্রহ্মশক্তির দ্বারা সেই ধনুতে জ্যা-যুক্ত না করিলে শিব ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার করিতে পারিতেন না ;—এবং সেই কারণে ত্রিপুরাসুরও বধ হইত না। **রুদ্রের আপন শক্তি কিছুই নাই**। ব্রহ্ম শক্তির সাহায্য ও কৃপা না পাইলে রুদ্র শরাসনই ধারণ করিতে পারিতেন না। ত্রিপুরাসুর বধকার্য্য রুদ্রের নিজের শক্তিদ্বারা অসম্ভব। ত্রিপুরাসুর বধকর্ত্তা শিবের যে শক্তি তাহাই ব্রহ্মশক্তি। পরমাত্মা যখন সর্ব্বগত ও সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য, তখন ভগবান শিবকেও ব্যাপিয়া সেই পরমাত্মা অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং শিবের জগতের মঙ্গলের জন্য ত্রিপুরাসুরকে বধ করা শিবের নিজস্ব শক্তিতে ঘটে নাই। পরমাত্মাই আসল কর্ত্তা। **পরমাত্মাই রুদ্রকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া ত্রিপুর বধ করিয়াছিলেন**। নিমিত্ত বা উপলক্ষ যন্ত্র মাত্র, সুতরাং আসল কর্ত্তা হইতে পারে না।

পরমাত্মা এ কার্য্য করিলেন কেন? ত্রিপুরাসুর প্রকৃতই অতি হিংস্র ব্রাহ্মণদ্বেষী অসুর ছিল। **"গোব্রাহ্মণ হিতায় চ"**—গো রক্ষা ও সৎব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য যে পরমাত্মাকে নানা প্রকারের অবতার গ্রহণ করিতে হয়, সেই পরমাত্মাই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানকারী সদ্ব্রাহ্মণগণের অত্যন্ত হিংসাকারী ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। যে জীব ব্রাহ্মণের শত্রু সে অসুরভাবাপন্ন জীব ভগবানের বধ্য। ভগবান আপন শ্রীমুখে বলিয়াছেন, **"ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ" সদ্ব্রাহ্মণ আমার (পরমাত্মার) দেহ স্বরূপ।** ত্রিপুরাসুর, যজ্ঞকর্ম্মে লিপ্ত অনেক ব্রাহ্মণের শত্রুতা ও হিংসা করিয়াছে, সেই জন্য পরমাত্মা ভগবান রুদ্র-মূর্ত্তিতে তাহাকে বিনাশ করিলেন। যে জীব বিনাকারণে অপরকে হিংসা করে সেই আসুরিকভাবাপন্ন জীব ভগবানের বধ্য। ভগবানের জগতে অধার্ম্মিক লোক যখন ধার্ম্মিক লোককে হিংসা করে ও পীড়া দেয়, এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানকে নিন্দা করে, তখন সেই দুষ্কৃত অসুরকে ভগবান বিনষ্ট করিয়া বিশৃঙ্খল জগতে শৃঙ্খলা ও ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া আবার শান্তি আনয়ন করেন। এখন রুদ্রের জন্য পরমাত্মা শিবের শরাসন জ্যা-যুক্ত করিলেন কেন? যখন পরমাত্মাই জগতে সমস্ত কর্ম্মের প্রকৃত কর্ত্তা, তখন উপলক্ষস্থানীয় রুদ্রের জন্য ধনুতে জ্যা যুক্ত করিলেন কেন? পরমাত্মার প্রকৃতিগত রহস্যই এই। তিনি প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া আসলকর্ত্তার কাজ করেন। **তাঁর কৃপাপাত্র নিমিত্তরূপী জীব ভগবানের কর্তৃত্ব দেখিতে না পাইয়া নিজের কর্তৃত্ব দেখিয়া ভ্রমে পতিত হয়।** নিমিত্তরূপী জীবের জন্য ভগবানের পরোক্ষভাবে কর্ম্ম করা এই ত্রিপুরাসুর বধ ব্যাপারেই নূতন কথা নহে। তিনি এই ভাবেই বরাবর কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

জয়দ্রথ বধের কর্ত্তা দৃশ্যতঃ অর্জ্জুন। কিন্তু জয়দ্রথ-বধকর্ম্ম অর্জ্জুনের অসাধ্য হইত, যদি ভগবান আপনার সুদর্শন চক্রের দ্বারা সূর্য্যদেবকে আচ্ছন্ন না করিতেন। **অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্রোণ, কর্ণ ও ভীষ্ম বধ করিয়াছিলেন।** নিমিত্তস্থানীয় জীব কোন কালেই কিছু করে না। সমস্ত কর্ম্মই ভগবানের কৃত। সেইজন্য গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"ময়ৈবেতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব,
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।"

"হে অর্জ্জুন! **আমি** কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দণ্ডায়মান এই সকল বীরপুরুষগণকে **নিয়তিরূপে বহুপূর্ব্বেই বধ করিয়া রাখিয়াছি। তুমি নিমিত্ত বা উপলক্ষ মাত্র হইয়া যুদ্ধ কর।**"

ভগবানই সব করেন ইহা অত্যন্ত সত্য কথা। এই সত্য যে ভাগ্যবান জীব দেখিতে ও বুঝিতে পারে সেই সিদ্ধ হয়। পূর্ণজ্ঞান যখন জীবের জন্মে তখন সে এই সত্যটী অনুভব করিতে পারে। অজ্ঞানে কিন্তু এই সত্যের বিপরীত ভাব জীব বিশ্বাস করিয়া ধরিয়া থাকে। এই সত্যের বিপরীত বিষয়টী কি? **ঈশ্বরই প্রকৃত কর্ত্তা, জীব নিমিত্ত মাত্র—ইহাই প্রকৃত সত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠতত্ত্ব।** ইহার বিপরীত তত্ত্ব এই—জীবই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা এবং ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। এই বিপরীত এবং ভ্রান্ত তত্ত্বটী অজ্ঞানী, অহঙ্কারী ও অভিমানী জীব জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া বিশ্বাস করিয়া ধরিয়া আছে।

রুদ্রায়—আধ্যাত্মিক অর্থে রুদ্র শব্দে একাদশ ইন্দ্রিয়কে বুঝায়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশটী ইন্দ্রিয়কে একাদশ

রুদ্র বলে। এখন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এই একাদশ ইন্দ্রিয়—ইহারা ব্রহ্মজ্ঞান-বিরোধী। **ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী বস্তুকে বিনাশ করা সাধকের কর্ত্তব্য।** এখন ইন্দ্রিয়ের বশীভূত জীব ব্রহ্ম হইতে দূরে চলিয়া যায়। মুমুক্ষু সাধক ব্রহ্মজ্ঞান বিরোধী এই একাদশটী রুদ্রকে বা ইন্দ্রিয়কে বধ করিবার জন্য লালায়িত। কিন্তু সাধকের শক্তিতে এই ইন্দ্রিয়কে বধ করা কুলায় না। সেইজন্য সাধক পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করে যে পরমাত্মা যেন কৃপা করিয়া সাধকের মঙ্গলার্থে এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে বধ করেন। **ইন্দ্রিয় বধ ব্যাপারটি কি?** সাধক ইন্দ্রিয়গণের নাশ চাহেন কি না? এখানে **বধ অর্থে বহির্ম্মুখী ইন্দ্রিয়কে অন্তর্মুখী করা।** যে একাদশটী ইন্দ্রিয় আমাদের চিত্তকে সর্ব্বদাই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ ইহাদের মোহে আচ্ছন্ন রাখে, সেই একাদশটী ইন্দ্রিয়ের বাহিরে যাইবার শক্তি নষ্ট হইলে এবং তাহার পরিবর্ত্তে ভিতরে যাইবার শক্তি জন্মিলে, ইন্দ্রিয়ের বধ-কার্য্য সম্পূর্ণ হয়।

পরমাত্মা বলিতেছেন, আমিই সাধকের কল্যাণের জন্য এই একাদশ রুদ্রকে বা ইন্দ্রিয়কে বধ করি। কিরূপে এই বধকার্য্য সম্পন্ন হয়? পরমাত্মা বলিতেছেন **আমিই ব্রহ্মজ্ঞান-বিরোধী, অতএব বিনাশযোগ্য, একাদশ ইন্দ্রিয়কে বধ করিবার জন্য** ও তদ্দারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য **প্রণবরূপী ধনুতে আত্মারূপ শর যোজনা করি। "প্রণবো ধনুঃ শরোহি আত্মা ব্রহ্ম তৎলক্ষ্যম্ উচ্যতে"।** মন যখন প্রণবের চিন্তা করে তখন প্রণবের মহিমাতে বহির্ম্মুখী মন অন্তর্মুখী হয়। মন অন্তর্মুখী হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে জীবের ইন্দ্রিয় সকলও অন্তর্মুখী হইয়া যায় এবং তদ্দারা কালক্রমে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়। এখন ধ্যান ও জপের দ্বারা একাদশ

ইন্দ্রিয়কে অন্তর্মুখী করিবার ক্ষমতা কাহার আছে? সেই ক্ষমতা একমাত্র পরমাত্মারই আছে; জীবের নাই। জীবের যদি সেই ক্ষমতা নিজস্ব থাকিত তাহা হইলে জীব পরমাত্মার কাছে সেই ক্ষমতা কখনও প্রার্থনা করিত না। গায়ত্রীতে আমরা পরমাত্মার কাছে সেই শক্তি প্রার্থনা করি, **"ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ"** অর্থাৎ পরমাত্মার ধ্যান করিবার বা পরমাত্মাকে জানিবার ক্ষমতা জীবের নাই। অতএব **পরমাত্মা আমাদের (জীবের) বুদ্ধিকে তাঁর ধ্যানে ও জ্ঞানে প্রেরণ করুন—এই প্রার্থনা।**

ভগবানকে কি উপায়ে লাভ করিতে হয়, ভগবান নিজেই সেই রহস্য বলিতেছেন। ধনুতে বাণ যোজনা করিয়া যেমন লক্ষ্যভেদ হয়, সেইরূপ **ওঁকারে বা ইষ্টদেবতার মূর্ত্তিতে মন লগ্ন করিলে ইষ্টলাভ হয়।** পরন্তু একাদশ ইন্দ্রিয়েতে মন লগ্ন থাকিলে মন ব্রহ্ম লাভ করিতে পারে না। যেহেতু একাদশ ইন্দ্রিয় ব্রহ্মজ্ঞান বিরোধী। ইন্দ্রিয়াসক্ত মন অজ্ঞানীর মন। ব্রহ্মযুক্ত বা ব্রহ্মভূত মন জ্ঞানীর মন। ব্রহ্মদর্শন করিতে হইলে ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গ ছাড়িতে হইবে। অজ্ঞানীর লক্ষ্য ইন্দ্রিয়সুখ, কিন্তু জ্ঞানীর লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান। **সমদং**=সংগ্রামং। আমি তাহাদের (পরমাত্মা) আমার শরণাগত স্তুতিকারক ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য অতি প্রবল শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকি। ভগবান নিরপেক্ষ। তাঁহার প্রিয় অথবা শত্রু কেহই নাই। কিন্তু যাহারা ভগবানের মাহাত্ম্য আলোচনা করে তাহাদের মনস্কামনা তিনি পূর্ণ করেন। আশ্রিত সন্তানগণ যখন শত্রুভয়ে ভীত হইয়া ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং ভগবানকে প্রসন্ন করিবার জন্য একান্ত ভক্তিভরে শ্রীভগবানের মহিমার কথা নানা প্রকার স্তব-স্তুতি করিয়া প্রকাশ করে তখনি ভগবান আশ্রিত সন্তানগণের ভার গ্রহণ করিয়া তাহাদের

শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকেন। সাধুদিগের পরিত্রাণ ও সাধুর পীড়নকারী অসুরদিগের বিনাশ এই দুইটী কার্য্য করিবার জন্য শ্রীভগবানের অবতারলীলা। যেখানে ভক্তের পীড়ন হয় সেখানে ভগবান সেই ভক্তকে শান্তি দিবার জন্য ভক্তদের শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকেন।

শুম্ভ-নিশুম্ভ ভয়ে ভীত দেবতাগণ প্রতিকারের জন্য যখন আদ্যাশক্তির স্তব করিয়াছিলেন সেই সময় মা চণ্ডী আবির্ভূতা হইয়া আশ্রিত দেবতাগণের শত্রু শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্যদলপতিদ্বয়কে অনুচরগণের সহিত ধ্বংস করিয়াছিলেন। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য মহামায়াকে যে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল সেই যুদ্ধ তিনি তাঁর স্তুতিকারক দেবতাগণের পক্ষে ও দেবতাদের কল্যাণের জন্য করিয়াছিলেন। মধুকৈটভ-বধ, মহিষাসুর-বধ অথবা শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ এই তিনটী লীলাই আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে মহামায়াকে দেবতাদের শত্রু অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করাইতে প্রবৃত্ত করিবার একমাত্র কারণ দেবীর স্তব স্তুতি করা। সেইজন্য চণ্ডীলীলার মধ্যে আমরা স্তবের এত প্রাধান্য দেখিতে পাই।

স্তুতি না করিলে পরমাত্মা প্রসন্ন হন না ও প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা পূরণ করেন না; সেইজন্য আশ্রিত ভক্ত যখন শত্রুর দ্বারা উৎপীড়িত হয় এবং নিজে প্রবল শত্রুকে দমন করিতে পারে না, তখনই সেই ভক্ত পরমাত্মার সাহায্য প্রার্থনা করে। পরমাত্মা ভক্তের সাধ পূর্ণ করিবার জন্য ও তাহার অশান্তি দূর করিবার জন্য অবতার গ্রহণ করিয়া ভক্তের শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রাম করেন ও ভক্ত উৎপীড়নকারী দুষ্কৃতগণকে বিনাশ করিয়া আশ্রিতকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করেন।

ব্রহ্মা মধুকৈটভ-ভয়ে ভীত হইয়া যদি বিষ্ণুর নিদ্রারূপিনী যোগমায়ার স্তব না করিতেন তাহা হইলে অনন্তশয্যাশায়ী নারায়ণও জাগ্রত

হইতেন না এবং মহামায়ার প্রেরণায় যুদ্ধ করিয়া মধু-কৈটভ বধ করিতেন না। **ব্রহ্মার স্তবই মধু-কৈটভ বধের মূলকারণ।** মধু-কৈটভ বধের দ্বারা কাহার মঙ্গল সাধিত হইল? স্তুতিকারক ব্রহ্মার কল্যাণ সাধিত হইল। মধু-কৈটভ বধের ফলে ব্রহ্মা প্রবল শত্রুর উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইলেন। উৎকণ্ঠাপ্রাপ্ত ব্রহ্মা নিশ্চিন্ত হইলেন।

মহিষাসুর-বধ কার্য্য কখন সংঘটিত হইতে পারিত না যদি দেবতাগণ মহিষাসুরের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া প্রতিকারের জন্য সকলে মিলিত হইয়া দৈব সাহায্য প্রার্থনা না করিতেন। সমস্ত দেবতার শরীর জাত তেজ সমষ্টিরূপে যখন দুর্গামূর্ত্তিতে ব্রহ্মময়ী জগদম্বার আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন দেবতাগণ সেই অপূর্ব্ব তেজোময় বিশালমূর্ত্তি দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল এবং সেই দুর্গামূর্ত্তিকে দেবতাগণের পরমশত্রু মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আপন আপন দৈব অস্ত্রসকল দুর্গামূর্ত্তির হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। দেবতাগণ নানা-প্রকারের অস্ত্র অলঙ্কার ও উপহার প্রদান করিয়া সেই দেবীকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। একান্ত ভক্ত দেবতাগণের কল্যাণের জন্য সেই দুর্গা-মূর্ত্তি দেবতাগণের হতাশ হৃদয়ে উৎসাহ জন্মাইবার জন্য অট্টহাস্য ও সিংহনাদ করিয়া মহিষাসুর বধকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দেবতারা অনেক আশা করিয়া এই দুর্গামূর্ত্তিকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া-ছিলেন। দেবতাদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য মাকে সকল দেবতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। **মহামায়া পরমশান্ত ও স্নিগ্ধ-মূর্ত্তি হইয়াও ভীষণ চণ্ডীমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইবার মূল-কারণ দেবতাদের একযোগে সকরুণ প্রার্থনা।** পরমাত্মা অবতার গ্রহণ করিয়া যুদ্ধাদি হিংস্র কার্য্য পর্য্যন্তও ভক্তের মঙ্গলের জন্য করিতে বিমুখ হন না।

শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ লীলায় যখন দেবতাগণ তাহাদের প্রবল শত্রু শুম্ভকে চূর্ণ করিবার জন্য নিজেরা অসমর্থ হইয়া এই মহামায়ার শরণাগত হইতেছিলেন ও শুম্ভ নিশুম্ভ বধ কামনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সেই দেবীকে স্তব করিয়াছিলেন ও ভক্তিভরে বার বার প্রণাম করিয়াছিলেন তখন ভক্তের বিপদ নাশ করিবার জন্য ভক্তের অভিলাষ পূরণ করিবার জন্য মহামায়ার কৌষিকী মূর্ত্তিতে আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ে যে অপূর্ব্ব দেবীস্তব দেবতারা করিয়াছিলেন সেই স্তবের ফলেই মহামায়া কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবতাদের মঙ্গলের জন্য দেবতাগণের শত্রুদের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া অসুরকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন। দেবতাগণ যদি মহামায়ার স্তব না করিতেন তাহা হইলে শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ-কার্য্য কখনই ঘটিত না। পরমাত্মাকে তাঁহার সৃষ্ট জগতের কোন দ্রব্য দিয়া সন্তুষ্ট করা যায় না। পরমাত্মা কি উপায়ে এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে দেবতাদের জন্য দেবতাদের শত্রুর সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন? **পরমাত্মার প্রীতির একমাত্র কারণ, একমাত্র বস্তু, তাঁহার মহিমাকীর্ত্তন, তাঁহার স্তুতিবাদ**।

আধ্যাত্মিকভাবে এই তত্ত্ব আলোচনা করা যাউক। সাধক যখন আত্মদর্শন করিবার জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা করে সেই সময় সাধকের পরম শত্রুরূপে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য আদি বৃত্তিগুলি তাহার সাধনার প্রবল অন্তরায় হইয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ উৎপীড়ন করে। সেই সকল চক্ষুর অগোচর শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সাধক বার বার পরাজিত হয়। এই সূক্ষ্ম রিপুগণকে দমন না করিতে পারিলে সাধকের ইষ্টসিদ্ধি হয় না। যখন সাধক নিজের শক্তিতে, নিজের পুরুষকার দ্বারা চেষ্টা করিয়াও রিপুজয়ী হইতে পারে না

তখন পরমাত্মার শরণাগত হয় ও পরমাত্মার কৃপা ভিক্ষা করিবার জন্য একান্ত ভক্তিভাবে ভগবানের স্তব স্তুতি করে। এই সকল স্তব স্তুতির ফলে পরমাত্মা সাধকের হৃদয়ে কৃপা করিয়া আত্মশক্তিরূপে আবির্ভূত হন ও সাধকের হিতার্থে তাহার সূক্ষ্ম রিপুগণকে আপন ইচ্ছাশক্তিতে দমন করিয়া থাকেন। ভগবানের এই যে সাধকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সাধকের রিপুচূর্ণ করার স্বভাব ইহা সকল শাস্ত্রেরই স্পষ্ট কথা। শাস্ত্রের অন্যান্য কথার মর্ম্ম সকলে গ্রহণ করিতে না পারুক কিন্তু স্তুতিকারক ও প্রার্থনাকারীর সকল অভাব যে ভগবান পূর্ণ করেন এই সনাতন সত্য কথা অতি স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন জীবেও বুঝিতে পারে। সাধনার সময় সাধকের যে দেবাসুর-যুদ্ধ সর্ব্বদা চলে, সত্ত্ব ও রজ-তম গুণের সংগ্রাম যে সর্ব্বদা অনুভূত হয় এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে মাতৃসাহায্য আবশ্যক। মহামায়া যদি কৃপা করিয়া আমাদের মধ্যে আসুরিক প্রবৃত্তিগুলিকে চূর্ণ করিয়া দেন তবেই আমরা রিপুজয়ী হইতে পারি। মহামায়াকে আমাদের মঙ্গলের জন্য আমরা এই রিপুজয়-কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহিলে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? দেবীর প্রসন্নতা ব্যতীত এই দুষ্কর কার্য্য করা সম্ভব নহে। দেবীর প্রসন্নতা কি সাধন করা যায়? একমাত্র উপায়, তাঁহার বিচিত্র মাহাত্ম্য-পূর্ণ স্তব-স্তুতি করা। বিদ্যার দ্বারা, অর্থের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা, বেদ পাঠের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা অন্য কোন কিছুর দ্বারা এই মহামায়াকে প্রসন্ন করা যায় না। **একমাত্র শরণাগতি ও ঈশ্বরে নির্ভরতার দ্বারাই মহামায়া প্রসন্না হয়েন।** বেদে এই তত্ত্বটী সুন্দরভাবে প্রকাশিত আছে—

"ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশু" (উপনিষদ)

একমাত্র ত্যাগ বা পর-বৈরাগ্য বা ঈশ্বরে একান্ত নির্ভরতার দ্বারাই সেই অমৃতময় বস্তুকে বা ব্রহ্ম লাভ করা যায়।

শ্রীশ্রীচণ্ডী কৃপাপূর্ব্বক আমাদের সূক্ষ্ম শত্রুগণকে দমন করিয়া আমাদের রিপুজয়ী ও নিশ্চিন্ত করুন।

দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ—আমিই (পরমাত্মা) স্বর্গ ও পৃথিবী, উভয় লোকে অন্তর্য্যামী-রূপে আবিষ্ট হইয়া আছি।

স্বর্গ ও পৃথিবী উভয় লোকই জড়। এই জড় ভূলোক ও স্বর্গ লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কিন্তু চৈতন্য-স্বরূপ। পরমাত্মাই সেই চৈতন্যময় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি কি ভাবে এই পৃথিবী ও স্বর্গ উভয় লোকে, প্রবিষ্ট হইলেন? তিনি কি উপায়ে এই জড় উভয় লোকের চিন্ময় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাজিলেন? পরমাত্মা **অন্তর্য্যামী রূপে** স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই লোকে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য। কি স্বর্গ, কি পৃথিবী, সর্ব্বত্রই পরমাত্মা ব্যাপকভাবে সমস্ত বস্তুকে আচ্ছাদন করিয়া আছেন। বিশ্বজগৎ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর প্রতি অণুপরমাণুতে ভগবান চৈতন্য-রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। **"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ"** (শ্রুতি)॥ পরমাত্মা সৃষ্টি করিয়া সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন। সেইজন্য জড় জগতের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই, জড়ের আধার-ভূত চৈতন্যেরও আবির্ভাব হইয়াছিল। যেমন ভগবান্ জীবের দেহে জীবাত্মারূপে আছেন, তেমনই পৃথিবীর জড়দেহে তিনি বিশ্বাত্মা হইয়া আবির্ভূত। বেদ বলেন, পরমাত্মা স্বর্গে ও পৃথিবীতে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে "নারায়ণী স্তুতিতে" বলা হইয়াছে— মা চণ্ডীই একমাত্র জগতের আধারভূতা (চিৎ শক্তি)।

"আধারভূতা জগতস্তমেকা ॥" চণ্ডী ১১।

সপ্তলোকের মধ্যে কেবল মাত্র—স্বর্গ ও পৃথিবী, এই দুই লোকে পরমাত্মার অনুপ্রবিষ্ট হইবার কথা বলা হইল কেন? কারণ এই দুইটি প্রধান লোক এবং **এই দুই লোকেই পরমাত্মার অবতারলীলার অভিনয় হয়।** সেইজন্য যদিও পরমাত্মা বিশ্ব জগতের সর্ব্বত্র সাধারণভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তথাপি এই দুই লোক তাঁহার বিশেষ প্রকাশ-স্থল। বেদ বলেন, বিশ্বরূপিনী দেবী জগৎ-জননীর মস্তকে স্বর্গ-লোক ও পাদপদ্মে পৃথিবী-লোক অবস্থান করিতেছে!

"দ্যৌ মূর্দ্ধ্নি—পাদৌ বনস্পতয়ঃ।"

স্বর্গ ও পৃথিবীর, অন্তরে ও বাহিরে, পরমাত্মা, ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। দ্যুলোক ও ভূলোক প্রকাশ করিয়া, পরমাত্মা সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট।

আত্মার পাঁচটী কোষ বা দেহ আছে। এই কোষগুলি স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম। (১.) ভূলোক, আত্মার অন্নময় কোষ বা স্থূল দেহ। (২) ভুবলোক, আত্মার মনোময় কোষ। (৩) প্রাণময় কোষ,—আত্মার সৃষ্টি, স্থিতি ও ক্রিয়া শক্তি। (৪) **স্বর্গলোক, আত্মার বিজ্ঞানময় কোষ।** (৫) আনন্দময় কোষ—যেখানে আত্মার কেবল আনন্দময় স্বরূপে অবস্থান হয়। স্বর্গরাজ্যেই শ্রীশ্রীচণ্ডীর অবতার লীলা হইয়াছিল; সেইজন্য **বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা এই—শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব।** আত্মা যখন অন্নময় কোষ ছাড়িয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম মনোময় কোষ, প্রাণময় কোষ, ও বিজ্ঞানময় কোষ ভেদ করিয়া, আনন্দময় কোষে উপস্থিত হন, তখন আত্মার স্বরূপ প্রকাশ

হয় ও জীবের সাধনা সিদ্ধি লাভ করে। জীবাত্মা তখন পরমাত্মায় পরিণত হয়, ব্যষ্টি আত্মা তখন সমষ্টি-আত্মা বা বিশ্বাত্মায় পরিণত হয়।

ভগবান প্রাণশক্তিরূপে ভূলোক ও স্বর্গলোক ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া, তিনি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন ও স্বর্গলোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শোভা। বেদ বলেন,—ভগবানের মহিমাই ভগবানের প্রতিষ্ঠার ভূমি। "সঃ ব্রহ্ম কুত্র প্রতিষ্ঠিতঃ?"—সেই ব্রহ্ম কোথায় প্রতিষ্ঠিত? **"স্বে মহিম্নি"** —আপন মহিমায় সেই ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের মহিমা কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ভগবানের মহিমাস্থল। **সৃষ্টি ভগবানের বিরাট মহিমা।** সৃষ্টির সর্ব্বত্র ভগবানের মহিমা প্রকাশিত রহিয়াছে।

বেদ বলেন,—

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ **সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽ** বাক্যনাদরঃ।" ছান্দোগ্য উপনিষৎ। ৩।১৪।২।

অর্থাৎ, এই বিচিত্র বিশ্ব পরমাত্মারই কার্য্য। এই জগতের সমস্ত পবিত্র কামনা, পূত গন্ধ, সুখকর রস তাঁহারই। **তিনিই এই নিখিল বিশ্বকে অভিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন;** অথচ তাঁহার কোন ইন্দ্রিয়ই নাই। তিনি নিজের পূর্ণ স্বরূপে সর্ব্বদাই অবস্থান করিতেছেন বলিয়া বাহিরের কোন বস্তু লাভ করিতে তাঁহার একটুও আগ্রহ নাই।

বেদ বলেন,—

"অসদেবেদমগ্র আসীত্তৎ সদাসীত্তৎ সমভবত্তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত তৎসংবৎসরস্য মাত্রামশয়ত তন্নিরভিদ্যত তে আণ্ডকপালে রজতং চ সুবর্ণং চাভবতাম্।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩।১৯।১)

—"এই বিপুল বিচিত্র বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে এমন ছিল না। তখন বীজের মত অতি সূক্ষ্মরূপেই অবস্থান করিতেছিল। তাহার পর ক্রমে তাহা অভিব্যক্ত হইবার উপক্রম করিল। ধীরে ধীরে সৃষ্টির ঈষৎ অঙ্কুর উদ্ভূত হইল। তাহা ক্রমে স্থূলতর, স্থূলতম হইয়া একটী সুবৃহৎ ডিম্বে পরিণত হইল। ডিম্বটী এক বৎসর ধরিয়া নিস্পন্দ হইয়াই পড়িয়া রহিল। তাহার পর একদিন তাহা আপনা আপনিই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তাহার একটী ভাগ **সুবর্ণময়** এবং অন্যটী **রৌপ্যময়** হইল।"

"তদ্ যদ্রজতং সেয়ং পৃথিবী, যৎ সুবর্ণং দ্যৌর্যজ্জরায়ুতে পর্ব্বতা যদুল্বং সমেঘো নীহারো যা ধমনয়স্তা নদ্যো যদ্বাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ।" (৩।১৯।২)

—"**সেই রৌপ্যময় ভাগটিই এই পৃথিবী আর সুবর্ণময় ভাগটী ঐ দ্যুলোক**। ডিম্বটী যখন দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তখন তাহার গাত্রে জরায়ুর যে অংশ লাগিয়াছিল, তাহার স্থূলভাগ হইতে এই পর্ব্বত উৎপন্ন হইল। আর যে সূক্ষ্মভাগ বা অংশ (উল্ব) তাহা হইতে মেঘ ও নীহার জন্মগ্রহণ করিল। নবজাত সেই বিশ্ব-শিশুর দেহের শিরাগুলি নদী হইল, আর তাহার মূত্রাশয়ের মধ্যবর্ত্তী সলিল রাশিই এই সমুদ্র হইল।

শ্রুতি প্রমাণে, জানা গেল যে, পৃথিবী ও দ্যুলোক একটী ডিম্বের দুই ভাগ। সেই জন্য সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পরমাত্মাই পৃথিবী ও দ্যুলোক দুই খণ্ডকে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া আছেন। সৃষ্টির সঙ্গেই এই দুই লোক আবির্ভূত হয় ও উভয় লোকের পরস্পর সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়।

মন্ত্র।

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম যোনিরপ্‌স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানুবিশ্বোতামূন্দ্যাং
বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥৭॥

অনুবাদ।

আমি জগৎপিতাকে প্রসব করিয়াছি। এই পৃথিবীতে পরমাত্মায় বিরাজমান অন্তঃকরণ বৃত্তি সমূহের যে গূঢ় অংশ, তাহা আমার প্রকাশস্থান। আমি সমগ্র ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত। আমি নিজের শরীর দ্বারা ঐ দূরবর্ত্তী দ্যুলোকও **স্পর্শ** করিয়া থাকি।

আলোচনা।

পিতরম্—এই কথাটীর নানা অর্থ আছে।

আমি (পরমাত্মা) জগৎ পিতাকে বা হিরণ্যগর্ভকে প্রসব করিয়া থাকি। **আমি** জগৎপিতারও জননী ; যেহেতু পরমাত্মা হইতে সকলের উৎপত্তি।

পিতরম্—'আকাশ' বা 'স্বর্গলোক' এরূপ অর্থও হয়।

'দ্যৌঃ পিতেতি শ্রুতেঃ। পিতা দ্যৌঃ।'—সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মা **আমি** এই ভুলোকের উপর স্বর্গলোককে প্রসব করিয়াছি। বেদে 'পিতা' কথার অর্থ 'দিব লোক' আছে।

বেদে আছে, 'আত্মা হইতে আকাশ জন্মিয়াছে'।

'আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূত'—ইতি শ্রুতেঃ।

সুতরাং আমি (পরমাত্মা) জগতের পিতাকে বা **আকাশকে** প্রসব করিয়াছি—এরূপ অর্থও করা যায়।

সুবে—প্রসব করিয়াছি। এই 'সুবে' কথাটীর জন্য, ভগবানের মাতৃত্ব বা বিশ্বজননীত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বরকে 'পিতা' বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ভগবান যে আবার জগতবাসীর 'মাতা' হন, সেইটী প্রকাশ হইল এই মন্ত্রে। মাতা যেমন সন্তান প্রসব করেন, সেইরূপ পরমাত্মা জগৎ-পিতাকে বা হিরণ্যগর্ভকে বা ব্রহ্মাকে প্রসব করেন। **পরমাত্মা সকলের পিতা ও মাতা, দুইই, সমকালে**।

হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা পরমাত্মার মনোময় কোষ বা সমষ্টি মন; ইনিই জগৎ-পিতা; ইনিই সৃষ্টিকর্ত্তা। এই বিরাট মনের বা জগৎ পিতার কল্পনা—এই বিশ্বজগৎ!

যে আকাশ হইতে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ প্রভৃতি বিশ্বউপাদান সকল সৃষ্ট হইয়াছে সেই আকাশ আবার ভগবানের ইচ্ছাশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

বেদ বলেন—**"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"**—যাহা হইতে (অর্থাৎ যে ভগবান হইতে) এই সকল স্থাবর জঙ্গম জন্মলাভ করিয়াছে।

বেদান্ত শাস্ত্র বলেন—**"জন্মাদ্যস্য যতঃ"** অর্থাৎ যাহা হইতে বা যে পরমাত্মা হইতে বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থ ও প্রাণীবর্গের জন্ম (অর্থাৎ সৃষ্টি,) স্থিতি ও ভঙ্গ (অর্থাৎ লয়) হইয়া থাকে তিনিই সর্ব্বকারণ। মাতা যেমন সন্তান প্রসব করেন ভগবানও সেই প্রকার জগৎ-পিতা বা আদিপুরুষ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রসব করেন। প্রসবের পর যেমন মাতার স্নেহ যত্ন ও করুণা সন্তানের উপর আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে ভগবানেরও অনন্ত করুণা সহস্র ধারায় বিশ্বজগতের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর উপর বর্ষিত হয়। যে জগৎ পিতার বিরাট সংকল্পের ফলে এই বিশাল

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে **সেই হিরণ্যগর্ভ, ভগবানের সংকল্প ও অহেতুকী কৃপার মূর্ত্তি বিশেষমাত্র।**

এই মন্ত্রের প্রথম পাদের প্রথম অংশের অর্থ তাহা হইলে এই কয় প্রকারের দাঁড়াইতেছে।

অম্ভৃণ ঋষির কন্যা সিদ্ধা বাগ্‌দেবী স্বীয় আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া পরমাত্মা ভাবে বলিতেছেন ঃ—

(১) আমিই (পরমাত্মা) জগৎ পিতাকে প্রসব করিয়াছি।

(২) আমিই আকাশকে প্রসব করিয়াছি।

(৩) আমি হিরণ্যগর্ভকে প্রসব করিয়াছি।

(৪) আমিই ভূলোকের উপর স্বর্গলোককে প্রসব করিয়াছি।

বিশ্বরূপিনী মহামায়া ব্রহ্মময়ী যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তারও জননী তাহা এই মন্ত্রে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল। ভগবান যখন বিশ্বজগতের মূলীভূত কারণেরও জননী হইয়াছেন তখন সমস্ত জীব জগৎ সেই বিশ্বপ্রসবিনী পরমাত্মার করুণা হইতে কখনই বঞ্চিত হইতে পারে না। জগৎপিতা যখন দেবী বিশ্বরূপিনী মহামায়ার সন্তান, আমরা সেই জগৎ-পিতার সন্তান হইয়া উত্তরাধিকারসূত্রে সেই অহেতুকী করুণার আকর-স্বরূপ পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে পারি না। পরমাত্মা স্বর্গলোককে প্রসব করিয়াছেন বলিয়া স্বর্গলোকবাসী দেবতাগণকে তিনি বিশেষ স্নেহ ও কৃপা করেন। এই দেবী-মাহাত্ম্যে আমরা দেখিব যে, এই স্বর্গবাসী দেবতাগণের কল্যাণের জন্য পরমাত্মাকে দেবশত্রুম ধুকৈটভ, মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করিতে হইয়াছিল এবং এই পুণ্যময়ী অবতার-লীলা তাঁহার অতি প্রিয়স্থান স্বর্গলোকেই হইয়াছিল। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যঃ-এই সাতটী লোকের মধ্যে স্বর্গলোকই পরমাত্মার বিশেষ প্রিয়। আমরা

ভূলোকবাসী তথাপি আমরাও পরমাত্মার বিশেষ কৃপাপাত্র। সেই জন্য তিনি আপন শ্রীমুখে স্বর্গলোকের বর্ণনায় বলিতেছেন যে **এই ভূলোকের উপর যে স্বর্গলোক**, সেই স্বর্গলোককে আমি প্রসব করিয়াছি। এখন এই ভূলোকের সহিত স্বর্গলোকের বিশেষ সম্বন্ধ। শাস্ত্র প্রমাণে আমরা পাইয়া থাকি যে ভূলোকে পুণ্যকর্ম্ম করিলে সেই পুণ্যকর্ম্মের ফলে মৃত্যুর পর সেই পুণ্যকর্ম্মকারীর আত্মা স্বর্গলোকে কিছু কাল বাস করে। ভাগ্যবান ভূলোকবাসী স্বর্গবাসী হইতে পারে। সুতরাং স্বর্গলোকবাসীর মধ্যে যদি কয়েকজনও পুণ্যের ফলে ভূলোক হইতে স্বর্গলোকে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে পরমাত্মার করুণার মূর্ত্তিমান বিগ্রহ যে স্বর্গলোক সেই স্বর্গলোকে পুণ্যবান ভূলোকবাসী প্রবেশ করিবার অধিকার পায়। এই স্বর্গস্থান অবিমিশ্র সুখভোগস্থান। যে সমস্ত জীব সকাম পুণ্যকর্ম্ম করেন তাঁহারা এই স্বর্গে পুণ্যের ফল ভোগ করিতে আসেন। কূপ ও জলাশয়—খনন, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, আর্ত্তকে আশ্রয়-প্রদান, পীড়িতের সেবা প্রভৃতি সৎকর্ম্ম করিলে, এই সকল পুণ্য কর্ম্মের ফলে জীব স্বর্গলোকে কিছুকাল বাস করিবার অধিকার পায়। আবার স্বর্গভোগের ফলে পুণ্যক্ষয় হইলে সেই সকল পুণ্যকারী আত্মা মাতৃগর্ভে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে।

"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।"

মম যোনিঃ—ইহার উপরে আমার (পরমাত্মার) কারণ দেহ। ইহার উপরিভাগে আনন্দময় কোষের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোষে আমার (পরমাত্মার) কারণ—শরীর অবস্থিত।

সমুদ্রে—সমুদ্র কথার অর্থ **পরমাত্মা**। সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার বুদ্ধিশক্তি বা চিৎশক্তি সর্ব্বব্যাপিনী। সেই চিৎশক্তির মধ্যে যে

চৈতন্য সর্ব্বত্র খেলা করিয়া থাকেন সেই লীলা—প্রকাশের ফলে পরমাত্মার সৎভাবের প্রকাশ হয়। আমি যে আছি ইহাই আমার সৎভাব বা **অস্তি**, আমি যে সর্ব্বজ্ঞ, আমার এই ভাব প্রকাশ হয়, আমার :চিৎশক্তির বিকাশে। ইহাকেই শাস্ত্রে **ভাতি** বলে। আমি যে আনন্দস্বরূপ, আমার এই ভাব প্রকাশ হয় আমার হ্লাদিনী-শক্তির বিকাশে। ইহাকেই শাস্ত্রে **প্রিয়** বলে। এই **অস্তি-ভাতি-প্রিয়-স্বরূপ আমি** (**পরমাত্মা**), আমার আবির্ভাব বা প্রকাশের কারণ আমি নিজেই স্বয়ং। আমার ইচ্ছা হইলে আমি আমার জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি অথবা বলশক্তি এই তিনটীর কোন একটীর সাহায্যে আমি (পরমাত্মা) জীবের নিকট আত্ম-প্রকাশ করি।

সমুদ্র কথার আর একটী অর্থ আছে। বেদে সমুদ্র কথার অর্থ '**আনন্দ**'। শ্রুতি বলেন "এই সমুদয় প্রাণী সমুদ্রবান বা আনন্দময়।" সমুদ্র কথার ধাতুগত অর্থ—যাহা সম্যক্ প্রকারে ক্লিন্ন বা রসার্দ্র করে। একমাত্র আনন্দই জীবকে রসযুক্ত করিতে পারে, সেই জন্য সমুদ্র কথার অর্থ আনন্দ। পূজ্যপাদ ভগবান সায়নাচার্য্য শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সমুদ্র কথার এই অর্থ স্মরণ করিয়া সমুদ্র কথার অর্থ পরমাত্মা বলিয়াছেন। যে হেতু সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মা ও আনন্দ একই বস্তু।

আচার্য্য সায়ণ "সমুদ্র" কথার আর একটী অর্থ করিয়াছেন। 'সমুদ্র' অর্থে '**অন্তরীক্ষ**' বুঝায়। অন্তরীক্ষে অন্তরীক্ষবাসী দেব-শরীর-সমুহের মূল কারণ একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্য। আমি (পরমাত্মা) সকলের মূলীভূত কারণ রূপে সর্ব্ব পদার্থ ও প্রাণীকে ব্যাপিয়া আছি।

ততো বিতিষ্ঠেভুবনানু বিশ্বা—সেই হেতু আমি চৈতন্যরূপে এই ত্রিভুবন ব্যাপিয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছি। সমস্ত ভুবনে একমাত্র আমি (পরমাত্মা) অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছি বলিয়া সৃষ্ট বস্তুসকল স্থিতিলাভ

করিতেছে। সৃষ্ট বস্তু অনেক প্রকারের, কিন্তু সেই সকল বিভিন্নরূপ ও নামের আধার স্বরূপ চৈতন্য এক প্রকারের; অনেক প্রকারের নহে। উর্দ্ধে সপ্তলোক এবং অধোদেশে সপ্তলোক, এই চতুর্দ্দশ ভুবনে কোটী কোটী প্রকারের প্রাণী ও পদার্থ বিরাজ করিতেছে। একটী ভুবনের সহিত আর একটী ভুবনের সাদৃশ্য নাই। সেই প্রকার, একলোকবাসীর সহিত অপরলোকবাসীর প্রকৃতিগত কোন মিল নাই। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও রূপ ভাবিলে মনে হয় যে, ইহাদের উৎপত্তির কারণও বিভিন্নপ্রকারের। কার্য্য ও কারণে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুমান করিতে হয়। এখন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত প্রকারের কার্য্য দেখিয়া তাহাদের মূলে কারণও অনন্ত প্রকার আছে, এই বিচার যদি করা যায় তাহা হইলে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত আর দ্বিতীয় বস্তু এমন নাই যাহা অনন্ত প্রকারের কার্য্যাবলীর সর্ব্বকারণ-কারণরূপে একমাত্র মূলকারণ হইতে পারে! তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্ত্তা বলিয়া **নিমিত্ত কারণ**। আবার সৃষ্টির পরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থের আধার-স্বরূপ থাকার জন্য জগতের **উপাদান কারণ।** অতএব সমস্ত ভুবনে একমাত্র ব্রহ্ম চৈতন্যই সর্ব্বব্যাপী হইয়া ওতপ্রোত ভাবে অনুপ্রবিষ্ট আছেন।

বর্ষ্মণোপস্পৃশামি।—ঐ যে দূরবর্ত্তী স্বর্গলোক সাধারণ জীবের পক্ষে বহু দূর দেশে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়; সেই স্বর্গলোককেও আমি এই দেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়া আছি। পরমাত্মা প্রকৃতিরূপে সমস্ত পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট আছেন সেইজন্য সমস্ত পদার্থ স্পর্শ করিয়া আছেন।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই পরমাত্মার শরীর। ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী তিনি। সেই জন্য বিশ্বরূপিনী মূর্ত্তিতে তিনি সমস্ত জীবজগৎকে আপন শরীরেই স্থান দিয়াছেন। তাঁহার স্পর্শের সঞ্জীবনী শক্তিতে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড

বাঁচিয়া আছে। অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটী প্রাণী তাঁর স্পর্শে স্থিতি লাভ করিতেছে। আসন-শুদ্ধির মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই **"দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা"** পৃথিবী দেবীকে স্বয়ং বিষ্ণু বা পরমাত্মা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সাধক যদি আসনে উপবেশন করিয়া ধারণা করিতে পারে যে পৃথিবীর উপরে আসন রাখিয়া সাধক বসিয়াছে, সেই আসনে সাধকের দেহকে ও মনকে স্থির রাখিতে হইলে, পরম শান্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার স্পর্শ অনুভবে আনিতে হয়। ভগবান্ যখন বহু দূরবর্ত্তী দ্যুলোককেও আপন দিব্য মহিমাময় বিরাট সর্ব্বকারণ কারণ শরীরের দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকেন তখন তিনি এই পথিবীকেও তাঁহার বিচিত্র শরীরের দ্বারা স্পর্শ করিয়া আছেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। **পরমাত্মা আমাদের স্পর্শ করিয়া আছেন অথচ ভাগ্যহীন আমরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করি না।** তিনি সর্ব্বদা আমাদের জন্য কল্যাণময় হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন, আমরা তাঁহার দিকে চাই না, তাঁহাকে আশ্রয় করি না, তাঁহার এই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যের কথা মনে স্থান দিই না। **আমাদের জন্ম-জন্মের দুষ্ট সংস্কার আমাদের ভগবানের এই কল্যাণকর স্পর্শের কথা ভাবিতে দেয় না।** আমাদের মধ্যে যাঁহারা ভাগ্যবান তাঁহারা ভগবানের এই অপূর্ব্ব স্পর্শের কথা শাস্ত্রে সংবাদ পান এবং সেই সকল ভাগ্যবানের মধ্যে আবার যাঁহারা অতিশয় সৌভাগ্যবান তাঁহারা এই বিচিত্র স্পর্শের কথা ধারণায় আনিতে পারেন। যে সাধকের এই প্রকারের দিব্যজ্ঞান হয়, তিনিই দেখিতে পান, বুঝিতে পারেন ও জানিতে পারেন যে তিনি পরমাত্মার এই বিরাট মূর্ত্তির **দিব্য অঙ্গে আশ্রিত-ভাবে লগ্ন** হইয়া আছেন। আমাদের এই বিষয়-মলিন-মন ভগবানের এই অপূর্ব্ব করুণার কথা চিন্তা করিতে পারে না। সংসারের মধ্যে বিষয়ের কোলাহল-শব্দে

উন্মত্ত-প্রায় আমাদের এই অশুদ্ধ মন, সেই পরম প্রেমময়, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময়, আনন্দময়, পরমাত্মার এই দৈবী স্পর্শের কথা কেমন করিয়া ভাবিতে পারিবে? ভগবানের এই প্রচ্ছন্ন স্পর্শের কথা অনুভবে আনিতে পারিলে, তাঁহার করুণায় অল্প সময়ের মধ্যেই, আমাদের অশুদ্ধ মনের নাশ হইয়া যায় এবং তাঁহার স্থলে শুদ্ধ মনের আবির্ভাব হয় ও আমাদের সর্ব্বদা শ্রীভগবানে যুক্ত থাকিবার সৌভাগ্য উদয় হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর কৃপায় আমাদের বিষয়-মলিন মনে তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী করুণার কথা সর্ব্বদা জাগিয়া উঠুক। আমরা ধন্য হইয়া যাই।

মন্ত্র ঃ

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমানা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিবৈ তাবতী মহিমা সংবভূব ॥ ৮

অনুবাদ ঃ

আমিই (পরমাত্মা) জগৎ-নির্ম্মাণ-সময়ে বায়ুর ন্যায় স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছায় প্রবাহিত হই। অথবা আমি স্বয়ং এই লোকত্রয়-উৎপাদন পূর্ব্বক ইহার অন্তরে ও বাহিরে বায়ুবৎ অধিষ্ঠিত রহিয়াছি। অথবা, আমি স্বয়ং যখন বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হই তখনই এই সমগ্র ভুবনের সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

আমিই পৃথিবী এবং আকাশের পরেও আছি। অথবা, এই স্বর্গ-মর্ত্তের পরেও আমি বর্ত্তমান। অথবা, আমি পৃথিব্যাদি সকল লোকেই স্বীয় মহিমার সহিত অধিষ্ঠান করিয়া থাকি। কিন্তু, আমি নিজে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিত, আমাতে কোন প্রকার অবিদ্যা-মালিন্য দৃষ্ট হয় না।

আমিই ব্রহ্মস্বরূপিণী, এ জন্য আমার অসীমতা এইরূপ হইয়াছে। অথবা, ইহাই আমার মহিমা।

আলোচনা ঃ

অম্ভৃণ ঋষির কন্যা সিদ্ধা বাক্‌দেবী স্বীয় আত্মাকে বিশ্বাত্মা বিশ্বব্যাপিনী উপলব্ধি করিয়া পরমাত্মাভাবে কথা কহিতেছেন।

এই অষ্টম মন্ত্রটী দেবী স্থক্তের শেষ মন্ত্র। এই মন্ত্রে অতি গভীর দুর্ব্বোধ্য স্থষ্টিতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

বাত ইব প্রবামি!—বিশ্ব-স্থষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ছিলেন, আর দ্বিতীয় বস্তুর বা ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল না। অদ্বিতীয় সেই **একমেবা দ্বিতীয়ম্** তত্ত্ব বিশ্ব স্থষ্টির ক্ষিতি অপ্ তেজাদি স্থূল, এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারাদি স্থক্ষ্ম, উপাদান স্থষ্টি করিলেন। পরমাত্মা স্থষ্টির প্রতি অনু-পরমাণুতে আপন চিৎশক্তি প্রবেশ করাইয়া দিলেন। স্থষ্টি যেমন বিশাল ও বিচিত্র হইল, স্থষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মাও সেইরূপ স্থষ্টির সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়িলেন।

স্থষ্টির মূল কারণ পরমাত্মার বহু হইবার ইচ্ছা। "একঃ বহুস্যাম্"—পরমাত্মা ইচ্ছা করিলেন, 'এক আমি বহু হইব'। তাঁহার সেই সঙ্কল্পের ফলে বিশ্বজগৎ-স্থষ্টি হইল। শুধু স্থষ্টি করিয়াই পরমাত্মা ক্ষান্ত হইলেন না। প্রতি স্থষ্ট বস্তুতে তিনি চিৎ-স্বরূপ **আধার—রূপে** ছড়াইয়া পড়িলেন। সেইজন্য বহু মূর্ত্তিতে তিনি বহু নাম ও বহুরূপ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইলেন। তাঁহার এক হইয়াও বহু হইবার সঙ্কল্প পূর্ণ হইল। জগৎ—নির্ম্মাণ-কালে অদ্বিতীয় পরমাত্মার বিশ্বব্যাপী চৈতন্য-রূপে প্রতি স্থষ্ট বস্তুতে খণ্ড মত সঞ্চারিত হওয়া, কাহার অনুরোধে বা প্রেরণায় ঘটিয়াছিল? পরমাত্মা আপন ইচ্ছায় এই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। স্থষ্টি-কার্য্যে পরমাত্মা অন্য কাহারও সাহায্য লন নাই। সত্যসঙ্কল্প তিনি, স্থষ্টি-লীলাকার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই তিনি প্রতি স্থষ্ট বস্তুতে প্রাণশক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বায়ু যেমন আপন ইচ্ছায়, স্বাধীন-ভাবে, সর্ব্বত্র প্রবাহিত হয়, জগৎ-নির্ম্মাণ সময়ে পরমাত্মাও সেইরূপ স্বতন্ত্রভাবে অন্য **কাহারও কর্ত্তৃক** আদিষ্ট বা অনুরুদ্ধ না হইয়া, স্থষ্টির সর্ব্বত্র প্রতি

অণুপরমাণুতে, আপন চিৎ-শক্তি ছড়াইয়া দিয়া বিশ্বজগতের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান—কারণ, দুই-ই সাজিলেন। **লীলাময় ভগবান**। যখন তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে **এক** থাকেন তখন তাঁহার সেই অদ্বিতীয় সত্তারূপে থাকার নাম তাঁহার নিত্য-ভাবে স্থিতি। আবার যখন তিনি সৃষ্টির পর স্বরূপে এক থাকিয়াও বহু মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন, এবং আপন চিৎ-শক্তির দ্বারা, জীব, জগৎ, আকাশ, গ্রহ নক্ষত্রাদি সৃষ্টির সর্ব্বত্র আবরণ করেন, তখন তাঁহার বিশ্বাত্মা-ভাবে থাকার নাম, **নিত্য হইতে লীলায় অবতরণ**। পরমাত্মা তাঁহার সৃষ্টির সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন। তিনি নাই এমন স্থান থাকা সম্ভব নহে। বায়ু যেমন সর্ব্ব স্থানে আছে, তিনিও সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী। তাঁহার এই বিচিত্র সৃষ্টিকার্য্য তিনি স্বেচ্ছায় করিয়াছেন। যখন তিনি এইরূপ নিত্য হইতে লীলায় নামিয়া থাকেন, এবং যখনই তিনি স্বাধীনভাবে আপন ইচ্ছায় এক হইতে বহু হইবার ইচ্ছা করিয়া বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া জড়ে চৈতন্যের সঞ্চার করেন, তখনই সৃষ্টিকার্য্য সফল হয়, জগৎ নির্ম্মিত হয়।

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই তিন লোক উৎপাদন করিয়া পরমাত্মা কি ভাবে বিরাজ করেন? পরমাত্মা এই তিন লোকের অন্তরে ও বাহিরে বায়ুর ন্যায় ওতপ্রোতভাবে সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া জড় জগৎকে প্রাণময় চৈতন্যে পরিণত করেন। চিৎ এবং জড় দুই-ই তাঁহার সৃষ্টি। মহাশূন্য বা আকাশ জড় বস্তু, তথাপি আকাশ সৃষ্টির সময় তিনি সেই অনন্ত আকাশের প্রতি অংশ ব্যাপিয়া বিরাট চৈতন্যরূপে অনন্ত আকাশের আধার স্বরূপে আবির্ভূত হইলেন। চৈতন্য বা ব্রহ্ম এক বস্তু। চৈতন্যের বিভাগ বা খণ্ড কখন হয় না। অথচ বিচিত্র বিরাট সৃষ্টির অসংখ্য বিভিন্ন রূপের আধার স্বরূপে সেই একমাত্র চৈতন্যই যেন অসংখ্য ও

বিভিন্ন খণ্ড-মত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভূঃ লোকের আধার স্বরূপে যে চৈতন্য অবস্থান করিতেছেন ভুবঃ ও স্বর্গ লোকের আধার স্বরূপে বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-স্বরূপে সেই চৈতন্যই সৃষ্টির সময়ে প্রকাশিত হইলেন। বায়ু যেমন জীব দেহের বাহিরে প্রবাহিত হইয়া জীব-দেহকে সুস্থ ও জীবিত রাখে এবং জীবদেহের অন্তরে প্রাণ অপান প্রভৃতি পঞ্চ বায়ুরূপে প্রবাহিত হইয়া জড় জীব দেহকে প্রাণময় করিয়া রাখে, পরমাত্মাও সেইরূপ ভূঃ লোকের বা অপর কোন লোকের বাহিরে ও অন্তরে প্রাণ-শক্তিরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া থাকেন। পরমাত্মার এই সর্ব্বব্যাপিনী শক্তি প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব।

মহা প্রলয় হইয়া যাইলে যখন সমস্ত বিশ্বসৃষ্টি লয় হয়, তখন যিনি একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, যাঁর নাশ কখন হয় না, তিনিই পরম পদ। সৃষ্টির পূর্ব্বে ইনি স্পন্দন-রহিত অবস্থায় আপন স্বরূপে থাকেন। এই নির্গুণ অবস্থায় সর্ব্বদা থাকিয়াও সৃষ্টিকালে তিনি যেন স্পন্দনযুক্ত অবস্থায় আসেন। নির্গুণ অবস্থায় যিনি পরম শান্ত, মঙ্গলময়—তাঁহার স্পন্দনযুক্ত—মত অবস্থাটীই ত্রিজগৎরূপে অবস্থান। যিনি নির্গুণ ও সগুণ দুইভাবে প্রকাশিত হন, অস্পন্দ হইয়াও স্পন্দমত লীলা করেন বলিয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পূর্ণ হয়, **নিত্যভাবে** নির্গুণ অবস্থা অক্ষুন্ন রাখিয়া যিনি **লীলায়** সগুণভাবে বিশ্বাত্মা-রূপে তিন লোক ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন, যিনি না থাকিলে কিছুই থাকিতে পারে না ; চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সকল যাঁর তেজে তেজোময় হইয়া আলোক দিতে সমর্থ হয়, যিনি সমুদয় জগতের অন্তরে ও বাহিরে সকল পদার্থে চৈতন্যরূপে বিরাজ করিয়া থাকিলেও তাঁহার পূর্ণত্বের কোন হানি হয় না, তিনিই পরমাত্মা।

যাঁহা হইতে বিশ্বজগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ ঘটিতেছে, যাঁহার

সঙ্কল্পের ফলে বিশ্বসৃষ্টি হয়, যিনি স্পন্দন অবস্থা হইতে স্পন্দন রহিত অবস্থায় আসিলে জগদাড়ম্বর নিবৃত্ত হইয়া যায়, যিনি বাগিন্দ্রিয়—শূন্য হইয়াও বাচাল, যিনি হস্তশূন্য হইয়াও সমস্ত গ্রহণ করিতে পারেন, যিনি পদ-বিহীন হইয়াও সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন, যাঁহার এক অংশ মননশীল ও অপর অংশ পরম শান্ত প্রস্তরের ন্যায়, নিত্য-তৃপ্ত হইয়াও যিনি সহস্র মুখে ভোজন করেন, যাঁর অবিদ্যাপাদে মায়ার খেলা সৃষ্টির বৈচিত্র্য এবং যাঁর বিদ্যাপাদে কোন স্পন্দন নাই, মায়ার কোন শক্তি প্রকাশ নাই, যিনি জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, অথচ কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে অধিষ্ঠিত নহেন, নাট্যশালার দীপ সাহায্যে নটের নৃত্য করার মত যিনি সাক্ষীস্বরূপে থাকাতে চিত্তের নানাপ্রকার স্পন্দন হয়; বিশাল সমুদ্র হইতে যেমন তরঙ্গ উঠে, সেইরূপ যাঁহা হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি উঠিতেছে, তিনিই সেই দীপ্তিশীল, ক্রীড়াশীল পরমাত্মা বা পরম শান্ত পরম পদ।

কিরূপে এই ব্রহ্ম হইতে এই সর্ব্বত্র ভাসমান সৃষ্টি উঠে?

যেমন সুষুপ্ত অবস্থাটী স্বপ্নমত প্রকাশ পায় সেইরূপ ব্রহ্মই সৃষ্টি মত প্রকাশ পান। সর্ব্বাত্মক সুষুপ্ত স্থানটীই সেই ব্রহ্মস্থান।

"সুষুপ্তং স্বপ্নবদ্ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ।
সর্ব্বাত্মকঞ্চ তৎ স্থানং তত্র তাবৎ ক্রমং শৃণু॥"

সুষুপ্তিতে বিষয় ভোগের দ্বারগুলি রুদ্ধ হইয়া যায়। জীবের অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় আবরণগুলি থাকে না; **কেবল মাত্র অজ্ঞান আবরণ থাকে;** ইহা আপন পূর্ণ স্বরূপের বিস্মৃতি। স্থূল সূক্ষ্ম কোন প্রকার চিত্ত স্পন্দন না থাকায় সুপ্ত পুরুষ সুষুপ্তিতে আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে। জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে ভৌতিক প্রকাশের

অভাব যেমন সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে, সুষুপ্তিতে কুয়াসার মত একটা স্বরূপের বিস্মৃতিরূপ অজ্ঞান জীবকে আচ্ছন্ন করে। সুষুপ্তিতে এই ভাবী বিচিত্র নামরূপযুক্ত বিশ্বটা **প্রথমে ছায়ার মত থাকে।** ক্রমে ছায়া ছায়া মত বিশ্বটা **স্বপ্নগরের মত ভাসে**—ক্রমে তাহাই—আরো প্রকট হইয়া, স্থূল হইয়া সৃষ্টিরূপে ভাসিয়া উঠে।

মণির যেমন স্বভাবতঃ ঝলক উঠে, স্বপ্রকাশ চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা হইতেই এই বিশ্ব স্বভাবতঃ অজস্রভাবে উঠিতেছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে ও মহাপ্রলয়ের পরে, পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। পরমাত্মাই অনন্ত চিৎস্বরূপ মণি ও অনন্ত প্রকাশাত্মক। বিশ্ব বলিয়া কোন কিছুই যখন থাকে না, তখন "আর কিছুই নাই" অভাব বোধরূপ অজ্ঞানটা **যেন** সৎস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গেই অবস্থান করিতেছে। "আছে" এই ভাবের সঙ্গে "নাই" এই অভাবটা অথবা "অস্তির" সঙ্গে "নাস্তিটা" যেন অবস্থিত। এই "নাস্তি" বাঅভাবের মধ্যে বিশ্বটা যেন ছায়া ছায়ার মধ্যে আছে। অভাবটা কার? বিশ্বের? বিশ্ব ত নাই? তবে বিশ্বের অভাব বোধ কাহার মধ্যে আছে? চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের **যেন** ঐ অভাব বোধ রহিয়াছে। সেই জন্য এই বিশ্বটী পরমাত্মার সত্তামাত্রাত্মক; চিৎ . বা আনন্দমাত্রাত্মক নহে। যেমন ভোজনের ইচ্ছা না থাকিলেও যদি কেহ জোর করিয়া ভোজন করায়, তখন যেমন অনিচ্ছায় ভোজন করিতে করিতে ভোজন ইচ্ছা উদ্রেক হয়, সেইরূপ পরম শান্ত, চলনরহিত ব্রহ্মে সংকল্পের স্বভাবতঃ ঝলক উঠিলে—অনিচ্ছারও ইচ্ছা জন্মে। সৃষ্টি বিষয়ক ব্রহ্মের ইচ্ছাই ইহা। অবুদ্ধি পূর্ব্বক কোন কিছু সংকল্প ওঠাই বুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টির কারণ। সেই চিৎমণির সত্তাটী আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, শুদ্ধবোধমাত্র। "আছের" সঙ্গে 'নাই' জড়িত সেই 'নাই'য়ের মধ্যে ভাবী সৃষ্টির নাম ও রূপ

অনুসন্ধান—তৎপরতা আছে। এই সংকল্প—শক্তিরূপা মায়াটী যখন ব্রহ্মে ভাসেন তখনই ব্রহ্মে বিচিত্র জগৎ ভাসার মত দেখায়। ভাবী নামরূপ অনুসন্ধান বৃত্তির দ্বারাই এই শুদ্ধবোধস্বরূপ চিৎ—সত্তাটী কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বরূপ অর্থাৎ রূপাভাস ধারণ করেন। চেতনাত্মক ব্রহ্ম—সত্তা হইতে অভিন্ন যে পরমাসত্তা তাহাই চিন্নাম-যোগ্যা হন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর। পরমাসত্তা চিন্নাম-যোগ্যা হইবার পর, "আমি বহু হইব"—এই ঈক্ষণ—সম্বোধন—রূপ যে সংকল্প, তাহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতে থাকে। পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে সংকল্প ঘন বা দৃঢ়ীভূত হয়। তাহার পরেই **আত্ত-কলনা** হয় অর্থাৎ তাহা হইতেই সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ রূপে আত্মভাবে পরিচ্ছেদ কল্পনা হয়। তখন আপনার অপরিচ্ছিন্ন ভূমা—ভাবের বিস্মৃতি **যেন** ঘটে। ইহার ফলে পরমাত্মা ক্রমশঃ হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি নাম ধারণ করেন। ব্রহ্মসত্তা তখন ভাবনা-মাত্র-সারা। তখনও বিকারাদি ক্রিয়া-সারা হন নাই। পরমা-সত্তা তখন ভাবনা বিশেষ দ্বারা সংসার-উন্মুখী হন। ইহাতে তাঁর ব্রহ্ম-স্বভাবের বিকার উৎপন্ন হয় না। ভাবনার দ্বারা পরিছিন্ন হইলেও তাঁহার স্বরূপের কোন ক্ষতি হয় না। সেই পরমাসত্তার উপরে এই পরিছিন্ন ভাবনা, রজ্জুর উপরে সর্পজ্ঞান ভাসার মত উঠে, ইহার নাম ব্রহ্মসত্তার উপরে জীব ভাবের উত্থান। এই জীব-সত্তা পরে অন্যান্য ভূতগণের অবকাশ প্রদান করে; সেইজন্য এক শূন্য-প্রায় আকাশ-সত্তার উদয় হয়। সৃষ্টি আরম্ভ হইলে ভবিষ্যতে যে শব্দাদি উঠিবে সেই সমস্ত গুণের বীজস্বরূপ এই আকাশ।

পরাশক্তির সংকল্পেই এই অসৎরূপ সৃষ্টিব্যাপার সৎ-মত ভাসে। আমি (পরমাত্মা) যখন বায়ুর মত প্রবাহিত হই তখনই এই সমগ্র ভুবনের সৃষ্টি আরম্ভ হয়। বায়ু-প্রবাহ বায়ুর ক্রিয়াশক্তি

প্রকাশ করে। শান্ত পরমাত্মা যখন বায়ুর মত সচল হন তখনই সৃষ্টি আরম্ভ হয়। যখন ব্রহ্মের কোন চলন বা স্পন্দন থাকে না, তখন কোন সৃষ্টিও থাকে না। তখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। আবার চলন-রহিত পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তিরূপে স্পন্দন বা চলন আরম্ভ হইলে সৃষ্টি-প্রবাহ চলিতে আরম্ভ হয়। পরমাত্মাকে জানিতে হইলে তাঁহার **স্বরূপ লক্ষণ** ও তাঁহার **তটস্থ লক্ষণ** এই দুই প্রকার লক্ষণের দ্বারা তাহাকে জানা যায়। স্বরূপ লক্ষণে তাঁহার চলন-রহিত নির্গুণভাবের কথা আছে। কিন্তু তটস্থ লক্ষণে তাঁহার চলন-যুক্ত বা ক্রিয়া-শক্তি-বিশিষ্ট সগুণভাবেরই কথা আছে। জগৎ-প্রসূতি, পালয়িত্রী এবং সংহন্ত্রী-শক্তিরূপা জননীই দেবীসূক্তের **আমি** বা পরমাত্মা। সেই জন্য মন্ত্রে "আরভমানা" শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। শ্রীমৎভাগবৎ গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে ব্রহ্মের স্বরূপ ও তটস্থ দুই প্রকার লক্ষণের কথা আছে।

পরোদিবা ঃ—আমি (পরমাত্মা) পৃথিবী এবং আকাশের পরেও আছি। এই স্বর্গ ও মর্ত্তের পরেও যে সমস্ত লোক আছে, বা যে মহাশূন্য আকাশ আছে, সেই সকল স্থানে পরমাত্মা বিদ্যমান আছেন। পরমেশ্বর যখন সর্ব্বব্যাপী, তখন তিনি স্বর্গ ও মর্ত্তলোকের মধ্যেই আবদ্ধ আছেন এবং স্বর্গ ও মর্ত্ত ছাড়া অন্যত্র নাই, ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে। তাঁহার অস্তিত্বের সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। শিব-মহিম্নঃ স্তোত্রের প্রথম শ্লোকে ব্রহ্মের সত্তার বা মহিমার অসীমতার কথা আছে।

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই তিন লোকে জীব জন্ম-মৃত্যু-চক্রে বারবার যাতায়াত করে। ভূ-লোকে জীবের মৃত্যু ঘটিলে জীবের কর্ম্মানুসারে ভুবঃ ও স্বর্গলোকে তাহার গতি হয়। পাপকর্ম্মের ফলে ভুবঃ লোকে অর্থাৎ প্রেতলোক ও পিতৃলোকে আতিবাহিক দেহে ঘুরিয়া জীব পুণ্যকর্ম্মের

ফলস্বরূপ স্বর্গভোগ করিতে যায় এবং নির্দ্দিষ্ট কাল ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন সুখ স্বর্গে ভোগ করিয়া জীবাত্মা আবার ভূলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে। যখন জীবের মুক্তি হয় তখন তাহার জন্মগ্রহণ বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহাকে আর ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোকে ঘুরিতে হয় না। মুক্ত আত্মা ভগবানের নিত্যধামে বা বৈকুণ্ঠে বা কৈলাসে গমন করে এবং চিরকালের জন্য মুক্ত হইয়া পরমা শান্তি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের মত পূর্ণানন্দে অবস্থান করে। ভগবানের এই নিত্যধাম ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোকের বাহিরে। সেইজন্য পরমাত্মা বলিতেছেন যে আমি স্বর্গ এবং মর্ত্তের পরে আমার নিত্যধামে বা আমার পরমধামে বিরাজ করি। স্বর্গ ও মর্ত্তের বাহিরেও অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে এবং সেই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটী জীবজগৎ রহিয়াছে এবং সেই অনন্তকোটী জীবজগৎ পরমাত্মারই সৃষ্টি, সেই জন্য পরমাত্মা যেমন স্বর্গ ও মর্ত্তের অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র পূর্ণভাবে প্রাণশক্তিরূপে ব্যাপিয়া আছেন, সেইরূপ স্বর্গ ও মর্ত্ত ছাড়া বাকী অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডেও তিনি পূর্ণভাবে সর্ব্বত্র প্রতি অণুপরমাণুতে প্রাণশক্তিরূপে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। বিশ্বজগতের কোন্ অংশে তিনি নাই? ইহার উত্তরে যদি কেহ কোন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলে যে এই স্থানে পরমাত্মার অস্তিত্ব নাই তাহা হইলে তিনি যে সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বান্তর্য্যামী এবং সর্ব্বশক্তিমান এই কথাগুলি নিরর্থক হইয়া যায়। **সকলের অপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া ভগবানের একটী নাম ব্রহ্ম।** তিনি সকলকে আচ্ছাদন করিয়া আছেন বলিয়া তাঁহার আর একটী নাম ব্যাপক। মানুষের জ্ঞানে ও কল্পনায় বিশ্বের সীমা যতদূর হইতে পারে পরমাত্মা সেই সীমা অতিক্রম করিলেও পূর্ণভাবে কতশত অজ্ঞাত লোকে ব্যষ্টি-চৈতন্য ও সমষ্টি-চৈতন্যরূপে বিরাজ করেন।

পরমাত্মা পৃথিবীর ও আকাশের উপরেও আছেন। পূজ্যপাদ সায়নাচার্য্য এই কথার এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা ঃ—পৃথিবী ও আকাশ মায়ার রাজ্যের মধ্যে। পৃথিবী ও আকাশের পরে পরমাত্মা আছেন অর্থাৎ তিনি মায়াতীত রাজ্যে আছেন। কি ভাবে তিনি ভূত সকলের বিকারজাত পৃথিবী ও আকাশের পরে আছেন? তিনি সকল বস্তুর সহিত **অসঙ্গ উদাসীন নির্লিপ্ত কূটস্থ** ব্রহ্ম চৈতন্যরূপ। তাঁহাতে কোনরূপ অবিদ্যা—মালিন্য নাই। তিনি পৃথিব্যাদি সমস্ত লোকে নিজ **মায়ারূপ মহিমা দ্বারা** অধিষ্ঠিত আছেন। যে মায়া শক্তির বিকাশে এই চরাচর সৃষ্টি হইয়াছে সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া পরমাত্মার নিজেরই মহিমামাত্র। তিনি আপন মহিমায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যরূপে বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুতে বিদ্যমান আছেন। তাঁহার একাংশে এই জগৎ অবস্থিত। তিনি সমস্ত বস্তুর মধ্যে আধার-চৈতন্যরূপে অবস্থান করিতেছেন সত্য অথচ তিনি স্বয়ং নির্লিপ্তভাবে থাকেন বলিয়া কোন বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। তিনি সমকালে নিজ মায়ার সহিত যুক্ত থাকিয়া জগৎ পালন করেন এবং নির্গুণ ভাবে মায়ার রাজ্যের বাহিরে মায়াতীত নিরঞ্জন স্বরূপে অবস্থান করেন। বেদান্তের মতে তাঁহার অনন্ত ভাবের দুইভাগ আছে। একভাগে সমুদায় সৃষ্টি ব্যাপার অর্থাৎ নিজ মহিমারূপ মায়ার খেলা, এই খণ্ডের নাম তাঁহার **অবিদ্যাপাদ**। আবার তাঁহার যে ভাগে মায়া প্রবেশ করিতে পারে না এবং সেইজন্য যেখানে জন্ম মৃত্যুর কোন ব্যাপার নাই, কেবল মাত্র পূর্ণ তুরীয় আনন্দ বিদ্যমান আছে, সেই অংশের নাম **বিদ্যাপাদ**। তিনি তাঁহার এই দুই খণ্ডে সমকালে বিরাজ করেন। তিনি সকল বস্তুর আধার হইয়াও এমন কৌশলে উদাসীন ভাবে থাকেন যে তাঁহাতে সমস্ত বিশ্বজগতের সঙ্কল্প—তরঙ্গ উঠিলেও তিনি নিজে প্রকৃতভাবে অসঙ্গ

থাকিতে পারেন। এই অসঙ্গ অবস্থায় থাকার সময় তাঁহার নাম হয় **কূটস্থ**। শ্রীশ্রীগীতায় এই তত্ত্বটী খুব সুন্দর ভাবে প্রকাশিত আছে ঃ—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিত" ॥৯।৪

অর্থাৎ, আমি (পরমাত্মা) অব্যক্তরূপে বা অতীন্দ্রিয় সচ্চিৎস্বরূপে এই নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া তাহার ভিতরে ও বাহিরে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছি। ভূতগণ কারণস্বরূপ আমাতে অবস্থিত। কিন্তু আমি আকাশের ন্যায় নিঃসঙ্গ বলিয়া সেই সকল ভূতগণে, ঘটাদিতে মৃত্তিকার ন্যায়, অবস্থিত নহি।

"ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ" ॥৯।৫

অর্থাৎ, আমি নিঃসঙ্গ বলিয়া ভূত সকলও আমাতে অবস্থিত নহে। আমার ঐশ্বরিক যোগ বা অঘটন-ঘটনা-চাতুর্য্য-মায়া দেখ। কারণ আমার অদ্ভূত যোগমায়াবৈভববশতঃ কিছুই বিরুদ্ধ নহে। আরও আশ্চর্য্য দেখ, আমি ভূতধারক ও ভূতপালক তথাপি আমার মায়া-কল্পিত ভূতগণে আমি অবস্থিত নহি। জীব যেমন দেহ ধারণ ও পালন করিলেও অহঙ্কারবশে দেহে মিলিত ও লিপ্ত থাকে, নিরহঙ্কার বশতঃ আমি ভূতগণকে ধারণ ও পালন করিয়াও তাহাদের সহিত সেইরূপভাবে সংশ্লিষ্ট নহি।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্!
তথা সর্ব্বানি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥৯।৬

অর্থাৎ, যেমন সর্ব্বদা সর্ব্বত্রগামী এবং মহান্ বায়ু আকাশে অবস্থিত

অথচ অবয়ব না থাকায় আকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, ভূতগণও সেইরূপে নিরাকার, পরিপূর্ণ এবং নিরবকাশ আমাতে অসংশ্লিষ্ট ভাবে অবস্থিত, জানিও।

পরমাত্মা যেমন অনন্ত, তাঁহার মহিমাও সেই প্রকার অসীম। পরমাত্মা ব্রহ্মস্বরূপিনী, সেইজন্য তাঁহার অসীমতাও এইরূপ হইয়াছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে আমরা এই পরমাত্মার মহিমার কথা পাইয়া থাকি।

"সহোবাচ যং উর্দ্ধং গার্গি! দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা—পৃথিবীইমে যং ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে আকাশ এব তৎ ওতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি।"

এই বৈদিক মন্ত্রের ও পরবর্ত্তী মন্ত্র কয়টীর ভাবার্থ এই ঃ—জনক রাজার সভাতে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ব্রাহ্মণদিগের বিবাদ উপস্থিত হইলে গর্গ কন্যা বাচক্লবী যাজ্ঞবল্ক্যকে যে প্রশ্ন করেন যাজ্ঞবল্ক্য সেই প্রশ্নটী বলিতেছেন। সেই যাজ্ঞবল্ক্য নিশ্চয় করিয়া গার্গীকে উত্তর দিতেছেন। ওরে গার্গি! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহা ত এই? যাহা স্বর্গ হইতেও উপরে, যাহা পৃথিবীরও অধোদেশে, আর যাহার মধ্যে এই দৃশ্যমান স্বর্গ ও মর্ত্তলোক, আর যাহা গত হইয়াছে, যাহা বর্ত্তমান আছে, আর যাহা ভবিষ্যতে হইবে এই সমস্ত পদার্থ কাহাতে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে! সেই পদার্থটী কি? তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিতেছি, আকাশই সমস্ত পদার্থকে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া আছে। তুমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছ, আকাশ কাহাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত? তাহার উত্তর এই বলিতেছি ঃ—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা যাঁহাকে অবিনাশী পুরুষ বলেন, সেই অক্ষরে, সেই ব্রহ্মে, আকাশ ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে। এই অক্ষর কিরূপ? যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহার উত্তরে

বলি, ইনি অস্থূল অর্থাৎ স্থূলাদি চতুর্ব্বিধ পরিণাম-রহিত। ইনি অস্নেহ অর্থাৎ চিক্কণতাদি গুণ-রহিত। ইনি অচ্ছায় অর্থাৎ ইনি মূর্ত্তি-রহিত। ইনি অতম অর্থাৎ ইনি অজ্ঞানমায়ার অতীত। ইনি অবায়ু, বায়ুর অতীত। ইনি অনাকাশ অর্থাৎ আকাশের অতীত। ইনি অসঙ্গ অর্থাৎ নির্লিপ্ত। ইনি অস্পর্শ অর্থাৎ স্পর্শ-রহিত। আবার ইনি ইন্দ্রিয়াদিগত অধিদৈবতরূপ তেজ নহেন। এইজন্য অতেজস্ক। তবে কি ইনি ইন্দ্রিয়চালক প্রাণ? না, ইনি অপ্রাণ। ইনি মুখরহিত এবং নাম ও গোত্র-রহিত। ইনি জরাতীত এবং অমরণ-স্বভাব। ইঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই বলিয়া ইনি অপর কাহাকেও দেখিয়া ভয় পান না। ইনি অমৃত অর্থাৎ নিত্যমুক্ত স্বভাব। ইনি অরজ, গুণাতীত, লোকাতীত। ইনি শব্দের অগোচর এবং বিবর্ত্ত-বর্জ্জিত। ইনি অবচ্ছেদ—রহিত। ইনি অপূর্ব্ব অর্থাৎ ইঁহার পূর্ব্বে আর কিছুই নাই। ইনি অন-পর অর্থাৎ যাঁহা হইতে অপর আর কিছুই নাই। ইনি অনন্ত অর্থাৎ ইহার ভিতর বলিয়া কিছুই নাই; ইনি অবাহ্য অর্থাৎ ইঁহার বাহির আবরণ কিছুই নাই; এই প্রকার যিনি অসঙ্গ ও উদাসীন তাঁহাকে কেহ অঙ্গীকার করে না। আর কিছুই তাঁহাকে ব্যাপিয়া নাই। যেহেতু তিনি অগ্রাহ্য অর্থাৎ কেহই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না।

ঋক্‌বেদ্ সংহিতায় পুরুষসূক্ত মন্ত্রে ব্রহ্মের মহিমার কথা আছে। **দেবীসূক্তের** শেষ মন্ত্রের শেষ কথা যেমন **এতাবতী মহিমা সংবভুব; পুরুষসূক্তের** তৃতীয় মন্ত্রে সেই একই ভাবের কথা আছে যথা :—

"এতাবানস্য মহিমা অতো জায়শ্চ পুরুষঃ" ॥৩॥

দেবীসূক্তে পরমাত্মার **মাতৃভাবের** প্রকাশ বর্ণিত হইয়াছে এবং **পুরুষসূক্তে** পরমাত্মার **পিতৃভাবের** প্রকাশ বর্ণিত হইয়াছে। দেবীসূক্ত ও পুরুষসূক্ত—এই দুইটীই ঋগ্বেদের অংশ সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকটীতেই অভ্রান্ত সত্য-তত্ত্বের কথা আছে। পরমাত্মা জীবলোকের পিতা ও মাতা সম কালে।

বেদ বলেন যে ব্রহ্ম চারি-পাদ-বিশিষ্ট।

"সোয়ম্ আত্মা চতুষ্পাদ্"

ব্রহ্মের এক পাদের নাম অবিদ্যাপাদ। ইহারই এক অংশে সৃষ্টি হইতেছে। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড ইঁহারই এক অংশে ত্রসরেণুবৎ উঠিতেছে ও পড়িতেছে। ব্রহ্মের বাকি তিন পাদ বিদ্যাপাদ বা তুরীয় পাদ। এই বিদ্যাপাদে ব্রহ্মের নির্ব্বিকার ও নির্গুণ ভাবে স্বরূপ অবস্থান। এই বিদ্যাপাদে ব্রহ্মের কোন মায়া-বিভূতি প্রকাশ পায় না। এখানে ইনি কেবলমাত্র অদ্বিতীয় সত্তারূপে অবস্থান করেন। পরিপূর্ণ আনন্দ এইখানেই সম্ভবে।

কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মের অংশ কখনও হয় না। নিরংশ ব্রহ্মের অংশ কল্পনা করা কিরূপে সম্ভবে ?

পঞ্চদশী নামক বেদান্ত গ্রন্থে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে নিরংশ ব্রহ্মকে অংশযুক্ত করিয়া বর্ণনা করা হয় কেবল মাত্র ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু শিষ্যদের বিষয়টী সহজে বুঝিবাব জন্য। জিজ্ঞাসু শিষ্যের ভাষায় ব্রহ্মের অংশ কল্পনার কথা দেখা যায়। বেদও পঞ্চদশীকারের মত অখণ্ড ব্রহ্মের চারিপাদ কল্পনা করিয়া নিরংশ ব্রহ্মের তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তর দেন। ব্রহ্মের এক ভাগে মায়ার খেলা এবং অপর তিন ভাগে শান্ত স্পন্দন-রহিত অবস্থা, এই নির্গুণ ও সগুণ ভাবযুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব

পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য ব্রহ্ম চারিপাদ-বিশিষ্ট এই কথা বলা হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে, ব্রহ্ম কিয়দংশে নির্বিকার ও বাকি অংশে বিকারযুক্ত। দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিপরীত গুণ ও ধর্ম্ম কেমন করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তায় থাকিতে পারে? দেবীসূক্তের আত্মা কেমন করিয়া সমকালে কিয়দংশে ত্রিগুণময়ী বাকি অংশে ত্রিগুণাতীতা হয়েন? দেবীসূক্তের এই শেষ মন্ত্রের এই শেষ অংশ এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছে, তাহা এই ঃ—পরমাত্মা ব্রহ্মস্বরূপিনী বলিয়া পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ ব্রহ্মে সম্ভব হয়। তিনি সমস্ত পদার্থের কারণস্বরূপ হইয়াও স্বয়ং বিশ্ব জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াও নিজে বিশ্বজগতের কোন পদার্থের সহিত লিপ্ত না হইয়া থাকিতে পারেন। ব্রহ্ম এই প্রকারে নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন কেন? যেহেতু এই প্রকারে নির্লিপ্ত হওয়া তাঁহার মহিমা সূচনা করে। যদি প্রশ্ন হয় যে তাঁহার মহিমা এই প্রকার কেন? তাহার উত্তরে এই বলা যায় যে পরমাত্মা আপন মহিমায় অধিষ্ঠিত বলিয়া **তাঁহার মহিমাও পরমাত্মার ন্যায় অসীম ও অনন্ত**।

পরমাত্মা নিজ মায়ার দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু সেই মায়া পরমাত্মার অধীনে থাকিয়া সৃষ্টিবৈচিত্র্য সম্পাদন করেন। পরমাত্মা মায়াধীশ। মায়াকে নিজের ইচ্ছামত চালনা করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নানা ভাবের জীব সৃষ্টি করেন। পরমাত্মা মায়ার সঙ্গে যুক্ত না হইলে সৃষ্টি হয় না কিন্তু এমন কৌশলে মায়ার সঙ্গে যুক্ত হন যে মায়াকে লইয়া খেলা করিলেও ভগবান নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন। পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তি যোগমায়া বা মহামায়া বলিয়া সেই মায়ার স্পর্শে ভগবানে কোন প্রকার মলিনতা আসিতে পারে না। কিন্তু জীবের কথা স্বতন্ত্র। জীব অবিদ্যার বশীভূত হইয়া নিজের স্বরূপকে চিনিতে পারে না। জীব অবিদ্যাচ্ছন্ন

হইয়া ভাবে যে তাহার সহিত পরমাত্মার কোন সংস্রব নাই। ঈশ্বরের সহিত যে মায়া থাকিয়া সৃষ্টিকার্য্য করেন জীবের সঙ্গে সেই মায়া যুক্ত হইয়া **অবিদ্যা** নাম ধারণ করিয়া জীবকে বশীভূত করিয়া জীবের স্বরূপকে জানিতে দেয় না। জীবের মধ্যে অবিদ্যারূপ মলিনতা যতদিন থাকে ততদিন জীব আত্মদর্শন করিতে পারে না। ভগবানের কোলে থাকিয়া সমস্ত বিশ্বসংসারের জীব আপন কর্ম্মানুসারে অবিদ্যার মোহে আচ্ছন্ন থাকে। ভগবানের কোলে অবিদ্যার এই আশ্চর্য্য খেলা চলে বটে এবং ভগবানের সৃষ্ট ও আশ্রিত সমস্ত প্রাণীতে অবিদ্যার মলিনতা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে ভগবানের আশ্রিত জীবে অবিদ্যা এত প্রবল হইয়া নৃত্য করে সেই ভগবানের সঙ্গে সেই কুহকিনী—অবিদ্যার কোন সংস্রব নাই। **পরমাত্মায় অবিদ্যাজনিত মালিন্য কখনও থাকে না।** সূর্য্য হইতে কুয়াসার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই কুয়াসা পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে থাকে বলিয়া লোকে দিবাভাগে সূর্য্যকে দেখিতে পায় না। কুয়াসা সূর্য্য হইতে জন্ম লাভ করিয়া সূর্য্যকেই আবরণ করে। **অবিদ্যা** জিনিষটা ঠিক কুয়াসার মত। অবিদ্যা, চৈতন্য হইতে জন্মলাভ করিয়া জীবের স্বরূপকে বা আত্মচৈতন্যকে আবরণ করে। জীবের নাম ও রূপ লইয়া জীবচৈতন্যের উপাধি সৃষ্টি হয়। এই উপাধি বা অবিদ্যা, আত্মাকে, সূর্য্যকে কুয়াসার মত, আবরণ করিয়া রাখে। সেইজন্য জীবে অবিদ্যার মলিনতা আছে। কিন্তু পরমাত্মায় অবিদ্যাই স্থান পায় না ত অবিদ্যা-জনিত মলিনতা আসিবে কোথা হইতে ?

ভক্তগণের শুভাদৃষ্টবশতঃ জগজ্জননী মহামায়া অম্ভৃণ ঋষির বাক্ নামে কন্যারূপে অবতীর্ণ হইয়া আপন মুখে স্বীয় আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া পরমাত্মার স্বরূপের যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহাই এই দেবী সূক্ত।

এই আমরা সংক্ষেপে দেবী সূক্তের আটটী মন্ত্র আলোচনা করিয়া তত্ত্ব-হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিলাম।

শ্রীশ্রীচণ্ডী আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। দেবী সূক্তের আলোচনার ফলে **শ্রীশ্রীচণ্ডীর কৃপাপাত্র** যেন আমরা হইতে পারি,—এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

দেবীসূক্ত-আলোচনায় ফল-প্রাপ্তি।

ওঁ হ্রীং নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

মাতৃকরুণাপুষ্ট, মায়ের অবিদ্যা-মূর্ত্তির মুগ্ধ উপাসক, মহামায়ার বিদ্যামূর্ত্তির আশ্রয়প্রয়াসী, অমৃতময়ীস্বরূপিনীমায়ের সন্তান আমরা, দেবী-সূক্ত আলোচনা করিয়া কি পাইলাম, কি বুঝিলাম, কি শিখিলাম, কি জানিলাম ?

১। পরমাত্মাই বিশ্বজননী মহামায়া। শক্তি ও শক্তিমান যেমন অভেদ, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ী মহামায়া, তেমনি এক বস্তু। ব্রহ্ম—শক্তিমান এবং মহামায়া বা শ্রীশ্রীচণ্ডী সেই ব্রহ্মের শক্তি। সুতরাং মহামায়াই ব্রহ্ম।

২। পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য। বিশ্বজগতে চন্দ্র, সূর্য্য, দেবতা, মানব, স্থাবর, জঙ্গম যত কিছু বস্তু বা প্রাণী আছে সকলের অধিষ্ঠান-চৈতন্যরূপে এই পরমাত্মাই বিরাজ করিতেছেন। প্রতি জীবে যিনি জীবাত্মা, বিশ্বজগতের সমষ্টি-জীবে তিনিই পরমাত্মা।

৩। এই পরমাত্মাই সকাম কর্ম্মকারীদিগকে যজ্ঞাদির ফল অর্পণ করিয়া থাকেন। ইনিই জীবের কর্ম্ম-ফল-বিধাতা, ইনিই জীবের পাপ পুণ্যের কর্ম্মফলদাতা।

৪। এই পরমাত্মাই বিশ্বজগতের একমাত্র ঈশ্বরী এবং ইনিই

ধনার্থী-সাধককে ধন দান করেন। বিশ্বজগতের একমাত্র কর্ত্রী বলিয়া বিশ্বের ধনভাণ্ডারও এই পরমাত্মার অধিকারে রহিয়াছে। ইনি ইচ্ছা না করিলে ধন কাহাকেও আশ্রয় করে না।

৫। এই পরমাত্মা ভাবসমূহের মধ্যে পরম ভাব এবং উপাস্য দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবতা। ইনি সর্ব্বরূপে সর্ব্বশরীরে বিরাজিত রহিয়াছেন। ইনি সমস্ত বস্তুর ও প্রাণীর প্রাণ—শক্তিরূপে বিরাজিত আছেন।

৬। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল দেবতা আছেন তাঁহারা প্রত্যেকে যেখানে থাকিয়াই হোক যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন তদ্দ্বারা এই পরমাত্মারই উপাসনা করা হয়।

৭। এই পরমাত্মা সকল জীবের ভোজনশক্তিরূপিনী, দর্শন-শক্তিরূপিনী, শ্রবণশক্তিরূপিনী ও জীবনীশক্তিরূপিনী। ইঁহারই শক্তিতে জীবেরা আহার করে এবং প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে।

৮। পরমাত্মাই বিশ্বজগতের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ। এই পরমাত্মাই একমাত্র নিত্য বস্তু এবং ইঁহার সৃষ্ট জগৎ ইঁহারই শক্তিতে জন্মিতেছে, স্থিতিলাভ করিতেছে ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে।

৯। যে সকল জীবেরা পরমাত্মার এই প্রকার রহস্যের কথা জানে না তাহারাই পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্ম-মৃত্যুরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়।

১০। সর্ব্বশক্তিময়ী পরমাত্মাকে অমান্য বা উপেক্ষা করিলে সকল জীবের সর্ব্বপ্রকার হীনতা বা অমঙ্গল হয় এবং এই পরমাত্মাকে শ্রদ্ধা দেখাইলে সকল জীবের কল্যাণ হয়।

১১। কি পার্থিব ভোগ, কি অপার্থিব ভোগ বা মোক্ষ, সমস্তই এই পরমাত্মার প্রিয় সাধকের প্রতি তাঁর দানের সামগ্রী।

১২। পরমাত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও সর্ব্বগত। পরমাত্মাতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

১৩। এই পরমাত্মাই উপাসকগণের অভীষ্ট পূরণ করেন। আন্তরিক প্রার্থনা করিলে, জীবের সর্ব্বপ্রকারের অভাব, এই পরমাত্মাই মোচন করিয়া থাকেন।

১৪। দেবতা ও মানবগণ যে তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন সেই দুর্লভ পরমাত্মার তত্ত্ব পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশ করেন। জীবের কল্যাণের জন্য পরমাত্মা তাঁর কৃপাপাত্র উপযুক্ত অধিকারীর নিকট তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ-রহস্যের কথা প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরমাত্মা তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তত্ত্ব-কথা যদি তিনি নিজে না প্রকাশ করেন তাহা হইলে জগতে কোন প্রাণীই পরমাত্মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রকৃত রহস্যের কথা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, ধারণায় আনিতে পারে না।

১৫। পরমাত্মা যে জীবকে রক্ষা করিতে সংকল্প করেন, তাহাকে তিনি অপর সমস্ত প্রাণী অপেক্ষা বড় করেন। তিনি প্রসন্ন হইলে ও ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রিয় উপাসককে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পদ প্রদান করেন অথবা তাঁহাকে অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী ঋষি বা শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধিযুক্ত করেন। পরমাত্মার প্রসাদে জীব ভোগরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব বা ব্রহ্মত্ব বা ত্যাগরাজ্যের সর্ব্বোচ্চসীমা (বা মোক্ষপদ) লাভ করিয়া থকে। মহাজ্ঞানী বা মহাভক্ত বা মহাযোগী করিবার ক্ষমতা একমাত্র পরমাত্মারই আছে। পরমাত্মাই জীবের সকল শক্তির আধার। যোদ্ধা যুদ্ধ করে, তাহার আপন শক্তিতে নহে, পরন্তু পরমাত্মারই শক্তিতে।

১৬। পরমাত্মাই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও অন্তরে ওতপ্রোত-ভাবে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন।

১৭। পরমাত্মাই **স্বর্গলোক**, আকাশ এবং হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। পরমাত্মা বিশ্বসৃষ্টি করিয়া প্রকৃতিরূপে সকল পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট আছেন এবং চৈতন্যরূপে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোক ব্যাপিয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

১৮। এই পরমাত্মা লীলাময়ী ও স্বাধীন। পরমাত্মা সৃষ্টিব্যাপারে অপর কাহারও সাহায্য আবশ্যক করেন না। তিনি স্বয়ং এই তিনলোক সৃষ্টি করিয়া ইহার অন্তরে ও বাহিরে প্রাণশক্তিরূপে বায়ুবৎ অধিষ্ঠিত আছেন। এই বিরাট সৃষ্টি পরমাত্মারই বিরাট মহিমা। তিনি পৃথিব্যাদি সকল লোকে নিজ মহিমার সহিত অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাতে সকল পদার্থ আশ্রয় করিয়া আছে। কিন্তু তিনি স্বয়ং নির্লিপ্ত-ভাবে অবস্থিত বলিয়া তাঁহাতে কোন প্রকার অবিদ্যামালিন্য দৃষ্ট হয় না।

১৯। পরমাত্মা, স্বরূপে নির্গুণ ও নির্ব্বিকার থাকিয়াও সৃষ্টিলীলা করিবার জন্য ত্রিগুণময়ী হইয়া থাকেন। **তিনি সমকালে অচল ও সচল, নির্গুণ ও সগুণ, অরূপ ও সরূপ, তত্ত্বাতীত ও তত্ত্বময়,** সংকল্পশূন্য ও সংকল্পযুক্ত, সমষ্টিচৈতন্য ও ব্যষ্টিচৈতন্য। তিনি অদ্বিতীয় একমাত্র সত্তা। **সৃষ্টিপ্রবাহ তাঁহার অনন্ত করুণার ধারা**। তিনি তাঁহার সৃষ্টবস্তুর অধিষ্ঠানচৈতন্য অথচ অহঙ্কার বা অভিমানশূন্য বলিয়া তিনি কোন বিষয়ে লিপ্ত হয়েন না; সকল পদার্থের সঙ্গে তিনি অসঙ্গ ও উদাসীনভাবে অবস্থান করেন.। জীবের প্রতি স্বাভাবিক করুণাবশতঃ তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া সকল পদার্থে প্রাণশক্তিরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও পরবৈরাগ্যবলে তিনি নির্লিপ্তভাবে থাকিতে পারেন। সকল সৃষ্টির মূলকারণ হইয়াও তিনি যে কেমন করিয়া তাঁহারই সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত হইয়াও সকল পদার্থ হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন

ইহা **জীবের ধারণার অতীত**। কিন্তু **পরমাত্মার মহিমাই এইপ্রকার**।

২০। তিনি এই বিশ্বসৃষ্টির প্রত্যেক বস্তু ও প্রাণীকে ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া এই সৃষ্টি এখন পর্য্যন্তও বজায় আছে। পরমাত্মার শক্তিও যেমন অদ্ভূত তাঁহার করুণাও সেইরূপ অনন্ত ও অপার। **পরমাত্মার প্রসন্নতাই জীবের লক্ষ্য**।

২১। মহামায়ার স্বরূপ বা পরমাত্মার প্রকৃত তত্ত্ব এ যাবৎ না জানার জন্য আমাদের এই প্রকারের পরমাত্মাকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। আমরা সেইজন্য সতত অপরাধী। আমাদের সেই অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আমরা মহামায়ার উদ্দেশে তাঁহার প্রসন্নতার জন্য তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

প্রার্থনা

অথ অর্গলাস্তুতিঃ ॥

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ।

মন্ত্র

জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিনি ।
জয় সর্ব্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তুতে ॥১॥

অনুবাদ

হে চামুণ্ডে! হে দেবি! তোমার জয় হউক! (অথবা তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বিরাজ কর)। হে মা! তুমি বিঘ্নকারী ভূতগণের অপসারণ করিয়া থাক; তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বিরাজ কর। হে সর্ব্ব-ব্যাপিনি! সর্ব্বান্তর্য্যামিনি! দেবি! হে কালরাত্রিস্বরূপে! (অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের অন্ধকারস্বরূপিনি!) তোমার জয় হউক। তোমাকে নমস্কার করি।

আলোচনা

জয় ত্বং দেবি—সাধনাবর্জ্জিত, ভগবৎ-পাদপদ্ম হইতে বহুকাল বঞ্চিত, বিষ্ঠার কৃমি কীট যেমন বিষ্ঠায় আনন্দে পুষ্টিলাভ করে সেইরূপ বিষয়ানন্দে মুগ্ধ, বহির্ম্মুখী মনযুক্ত, আমরা, বিশ্বজননী মহামায়ার দিকে ফিরিবার চেষ্টা করিতেছি। সেইজন্য বিষয়-বিমুগ্ধ মনকে মাতৃমুখী

করিবার জন্য তাহাকে **জয়** শব্দ শ্রবণ করান হইতেছে। মহামায়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ও তত্ত্ব। কাহারও স্তব করিতে যাইলে স্তাবকের কর্ত্তব্য উপাস্য সম্বন্ধে **জয়** শব্দ উচ্চারণ করা। ক্ষুদ্র ব্যক্তি মহতেরই স্তব করে। এখানে মহামায়ার উপাসক, ব্রহ্মময়ীর স্তব করিতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত জীব মোহাচ্ছন্ন থাকিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেকেই সংসারে সকল কর্ম্মে কর্ত্তা ভাবনা করে, ততকাল সেই জীব অহঙ্কারে বিকৃতবুদ্ধি হইয়া মায়ের মহিমা দেখিতে ও বুঝিতে পারে না। সেই ভ্রান্ত জীব সকল কর্ম্মে নিজেরই বুদ্ধির প্রশংসা করে; নিজের মহিমা নিজেই সর্ব্বদা বলে; নিজের বাহাদুরী নিজে, সকলের কাছে, দেয়; **নিজেই নিজের জয়ধ্বনি করে;** নিজেই নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মনে করে। কিন্তু সাধনরাজ্যে প্রবেশ করিবার মুখেই অশুদ্ধ মনকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে, আমরা মহামায়ার প্রজা; আমরা মহামায়ার আশ্রিত সন্তান। সেই জন্য যদি জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিতে হয়, তবে **মায়েরই জয় হউক**—এই কথা বলা উচিত। মা যখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব এবং প্রপন্ন জীবের দুর্গতি-হারিনী ও অভীষ্টপূরণকারিনী, তখন মাতৃতত্ত্ব একটু বুঝিতে আরম্ভ করিলেই আর কেহই মায়ের নামে জয়ধ্বনি না করিয়া থাকিতে পারিবে না। শ্রীশ্রীচণ্ডীর মহিমা গান করিতে হইলে প্রথমে এই কথাই বলা শোভা পায় যে,—

"জয় ত্বম্ দেবি!"

হে দেবি! তোমার জয় হউক। যতদিন মায়ের মহিমা গান করিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই, যতদিন শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্বের কথা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমাদের কর্ণযুগলকে পবিত্র করে নাই, ততদিন বিষয়রসে মজিয়া আমরা জগতে মাতৃহারা হইয়া নিরাশ্রয় ও

অরক্ষিত ছিলাম ; ততদিন আমরা নিজেদের **জয় জয়কার ধ্বনি** স্বয়ং করিয়া ও অপরের নিকট তাহা শুনিয়া, কত আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছি ! সদ্‌গুরুর কৃপায়, সৎশাস্ত্রের উপদেশ ও সৎসঙ্গের জ্ঞানালোকে আমরা এখন মাতৃ-মুখী হইতে চেষ্টা করিতেছি। সেইজন্য **মাতৃ জয়ধ্বনি**। বিষয়ের দিকে যাহাতে মন না যায়, পরন্তু বহির্মুখী মন যাহাতে অন্তর্মুখী হইতে পারে, সেইজন্য বিষয়ের দিকে **অর্গল** বা খিল দিবার জন্য, এই মহাকল্যাণকর অর্গলাস্তুতি আরম্ভ করা হইতেছে।

দীনহীন কাঙ্গালেরা শ্রাদ্ধাদি কোন কর্ম্ম উপলক্ষে প্রার্থী হইয়া যেমন ধনী দাতার গৃহদ্বারে সমাগত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তি কামনায় উচ্চৈঃস্বরে ও আনন্দভরে পুনঃ পুনঃ দাতার মহিমা ঘোষণা করিয়া দাতার নামে জয়ধ্বনি করে, শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক সাধকও সেইরূপ অকিঞ্চনের মত জগৎরূপী মাতৃমন্দিরের দ্বারে সমাগত হইয়া মহামায়ার করুণাপ্রার্থী হইয়া বারবার **'মহামায়ার জয় হউক'** শব্দ উচ্চারণ করে। বিশ্বজননী আমাদের অভীষ্টফলদাত্রী এবং আমরা নানা অভাবগ্রস্ত হইয়া পার্থিব ও অপার্থিব ঐশ্বর্য্য লাভ কামনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীর করুণার প্রার্থী। **মা দাতা সাজিয়াছেন** এবং **সাধক গ্রহীতা সাজিয়াছে**। সাধক মাতৃকরুণার কাঙ্গাল হইয়া ত্রিতাপের জ্বালা হইতে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করিতেছে। মা আমাদের সাধককে বর এবং অভয় প্রদান করিয়া প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করিতেছেন। সাধক, "দেবি ! তোমার জয় হউক," এই শব্দে মহামায়ার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। কি আশা হৃদয়ে লইয়া সাধক মাতৃমন্দির দ্বারে মাতৃজয়ধ্বনি করিয়া মায়ের এই মঙ্গলস্তুতি আরম্ভ করিয়াছে ? সাধকের আশা ও লক্ষ্য শ্রীশ্রীচণ্ডীর কৃপা লাভ। ঋষি-প্রদর্শিত পথে মায়ের মঙ্গলগীতি গান করিতে যে সাধক অগ্রসর হইবে তাহাকে মায়ের মহিমাসূচক

প্রথম শব্দ এই উচ্চারণ করিতে হইবে—"দেবি! তোমার জয় হউক।"

জয় শব্দের আর একটী অর্থ শাস্ত্রে আছে। 'জয়' শব্দে 'মহাভারতাদি সৎশাস্ত্রকে বুঝায়। সেই জন্য প্রায় সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণের শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই—

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসম্ ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

নারায়ণ এবং নরশ্রেষ্ঠ নরঋষি, দেবী সরস্বতী এবং ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া তবে জয় (অর্থাৎ সৎশাস্ত্র) উচ্চারণ করিতে হয়।

মহামায়া! তুমি বর্ণমালারূপিনী বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রময়ী। শাস্ত্র কতকগুলি শব্দের সমষ্টিমাত্র। মা! তুমি শব্দময়ী ও অক্ষররূপিনী। সুতরাং তুমি **জয়রূপিনী**।

'জয়' শব্দের আর একটী অর্থ 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বিরাজ করা।' মহামায়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বিরাজ করেন বলিয়া তাঁহাকে "জয়" বলা হইয়াছে।

দেবী শব্দের অর্থ দুইটী। প্রথম অর্থ—**দ্যোতনশীলা**, দীপ্তিময়ী, তেজোময়ী, প্রভাশালিনী। মহামায়া স্বয়ং প্রকাশমানা। তিনিই সকলের প্রাণ-শক্তিরূপিনী তাঁহার সত্তায় সকলের অস্তিত্ব, তাঁহার প্রভায় চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদির দীপ্তি। তিনিই সকলকে প্রকাশ করেন। তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে এরূপ শক্তিসম্পন্ন আর কেহই নাই। বেদ সেইজন্য ব্রহ্মস্বরূপিনীর সম্বন্ধে বলেন—

"তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বম্"।

'দেবী' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ :—'ক্রীড়াময়ী, **লীলাময়ী**। মহামায়া

ব্রহ্মস্বরূপিনী, **ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তিরূপিনী**। তিনি স্বতন্ত্রা, স্বাধীনা, কাহারও আদেশে কার্য্য করেন না। লীলা করিবার জন্য, কেবলমাত্র ক্রীড়া করিবার অভিনয় করিবার জন্য তাঁহার এই বিচিত্র বিরাট সৃষ্টি। তিনি **সর্ব্বজ্ঞ** হইয়াও লীলাচ্ছলে জীব সাজিয়া **অল্পজ্ঞের অভিনয়** করেন। বৃহৎ তিনি ক্ষুদ্র সাজিয়া ক্ষুদ্রত্বের ভাণ করিয়া অপূর্ব্ব সৃষ্টিলীলা করেন। বেদান্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মশক্তি মহামায়ার এই লীলার কথা একটি সূত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে ঃ—

"লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্"।

বেদান্ত দর্শন। ২য় অ, ১।৩৩॥

ইচ্ছাময়ী যখন তাঁহার এই বিচিত্র সৃষ্টি লীলা সম্বরণ করেন তখন তিনি বহুত্বের ভাণ ঘুচাইয়া নির্গুণ অবস্থায়, নিত্যভাবে, ব্রহ্মস্বরূপে, থাকেন। সৃষ্টির সময়ে নিত্য হইতে লীলায় অবতরণ ও মহা প্রলয়ে লীলা সংবরণ করিয়া নিত্যে অবস্থান করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে দেবী সম্বোধন করা হইয়াছে।

দেবতার স্তব করিবার সময় তাঁহাদের কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য দেবলোকের যোগ্য সম্মানসূচক দেবভাষা এই "দেবী" শব্দ। গঙ্গার স্তবের প্রথমেই সেইজন্য "দেবী" শব্দ দেখিতে পাই। যথা ঃ—

"দেবি! **সুরেশ্বরি**! ভগবতি গঙ্গে!"

অর্গলাস্তোত্রের প্রারম্ভে শ্রীশ্রীচণ্ডীকে দেবতার ভাষায় সেই জন্য 'দেবী' সম্বোধন করা হইয়াছে।

চামুণ্ডে ঃ—হে চামুণ্ডে! মা! চণ্ডমুণ্ড বধ করিয়াছিলে বলিয়া তোমার একটী নাম 'চামুণ্ডা'। দেবীমাহাত্ম্যে 'চণ্ডমুণ্ড বধ' অধ্যায়ের শেষ মন্ত্রে মা! তোমার 'চামুণ্ডা' নামের ইতিহাস আছে।

যখন কালী চণ্ডমুণ্ড অস্থরদ্বয় বধের পর চণ্ডের মস্তক ও মুণ্ড অস্থরের মুণ্ড গ্রহণ করিয়া চণ্ডিকার নিকট আসিয়া প্রচণ্ড অট্টহাস্য মিশ্রিত বাক্যে বলিলেন—"এই যুদ্ধরূপ যজ্ঞে আমাকর্ত্তৃক চণ্ড ও মুণ্ড নামক মহাপশুদ্বয় তোমাকে উপহার প্রদত্ত হইল। তুমি স্বয়ং শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করিও।" তখন সেই মহাস্থর চণ্ডমুণ্ডকে আনীত দেখিয়া কল্যাণী চণ্ডিকা কালীকে মিষ্টবাক্যে বলিলেন—"যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ডকে গ্রহণ করিয়া আসিলে, সেইজন্য হে দেবি! লোকমধ্যে তুমি **চামুণ্ডা** নামে খ্যাত হইবে।

"শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ।
প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্ ॥ ২৩
ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহা পশূ।
যুদ্ধ যজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি ॥ ২৪

ঋষিরুবাচ ॥ ২৫

তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাস্থরৌ।
উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং বচঃ ॥ ২৬
যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি! ভবিষ্যসি

দেবীমাহাত্ম্যে চণ্ডমুণ্ডবধ।

মা! আর্ত্ত সন্তানগণের অস্থরদের কবল হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য তুমি ভীষণা চামুণ্ডা সাজিয়া থাক। ভক্ত-রক্ষার্থ ভক্তপীড়নকারী অস্থরদের বধ করিবার জন্য মা আমাদের চিরশান্তময়ী মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া

অসুরদলনী অতি উগ্রা চামুণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করেন। সন্তান-স্নেহে বিগলিত-হৃদয়া মা! সন্তানের দুঃখ দূর করিবার জন্য নিজে অসুরের অপবিত্র রক্ত মাখিতেও দ্বিধা বোধ করেন না।

ভুতাপহারিনি বা ভুতাপসারিনি! মা! তুমি সন্তানের মঙ্গলের বিঘ্নকারী ভূতগণকে দূর করিয়া থাক। তোমার সন্তানগণ যাহাতে শান্তিতে বাস করে, তাহার জন্য তুমি করুণা করিয়া সন্তানগণের শুভকার্য্যের বিঘ্ন নাশ কর। যেখানে অমঙ্গল, যেখানে বিঘ্ন, সেখানেই তোমার আবির্ভাব হয় মা! শুধু তোমার সন্তানগণের সকল বাধাবিঘ্ন দূর করিবার জন্য। পূজার সময় আমরা পূজাকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে করিবার জন্য **বিঘ্নোৎসারন** মন্ত্র উচ্চারণ করি। সেই মন্ত্রটী এই :—

"**অপসর্পন্তু** তে ভূতা যে **ভূতা** ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা **বিঘ্নকর্ত্তারঃ** তে **নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া**।"

অর্থাৎ যে সকল প্রাণী পৃথিবীতে থাকিয়া কার্য্যে বিঘ্ন করে সেই সকল ভূত **মহাদেবের আদেশে** দূরে যাক্; যদি দূরে না যায় তবে তাহাদের নাশ হউক।

সাধক বিঘ্নকারী ভূতগণকে দূর করিবার জন্য মহাদেবের আদেশ ও শাসনবাক্য প্রয়োগ করে। শিবের আদেশ বলিয়া শুভকার্য্যের বিঘ্নকারী ভূতগণ সাধককে তাহার উপাসনায় আর বাধা দেয় না। যত বড়ই দুষ্টাত্মা ভূত শুভকার্য্যে বিঘ্ন দিবার জন্য সাধকের নিকট আসুক না কেন, শিবের আদেশের কথা শুনিলে সেই সকল ভূত পলায়ন করে। সাধকের বিঘ্ন দূর হইলে সাধকের অভীষ্ট পূরণ হয়। বিশ্বসংসারে যেখানে শুভ কার্য্যের উদ্যোগ হয়, সেখানেই বিঘ্নকারী ভূতগণ আসিয়া নানা বিঘ্ন

জন্মায়, তাই শুভকার্য্যে অনেক বাধা। মঙ্গলকর কার্য্যে পাছে কোন অমঙ্গল আসিয়া পড়ে, এইজন্য বিঘ্ন দূর করিবার জন্য শিবের নাম ভক্তগণ গ্রহণ করেন। যদি শিবের নামে বিঘ্ন দূর হয়, তবে শিবশক্তি বা শিব-মোহিনী বা শিবহৃদি-বিহারিনী বা হিমাচল-সুতানাথ-সংস্তুতে দেবী মহামায়ার নামে যে কোটী কোটী বিঘ্ন দূরে পলায়ন করে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। মায়ের নামে ভক্ত সন্তানগণ সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া থাকেন। এই জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডীর একটী নাম ভূতাপহারিনী বা ভূতাপসারিনী।

সর্ব্বগতে :—মা তুমি সর্ব্বব্যাপিনী ও সর্ব্বান্তর্য্যামিনী। তুমি নিত্যা হইয়াও যখন জগদাকারে আকারিত হও তখন বিশ্ব জগতই তোমার একটা মূর্ত্তি হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে প্রথম অধ্যায়ে মেধস মুনি সুরথ রাজার মহামায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে **মহামায়াই জগন্মূর্ত্তি**।

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্"।

তিনি বিশ্বের সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট আছেন। মহামায়ার গতি সর্ব্বত্র। তিনি নাই এমন কোন স্থান বিশ্বজগতে থাকিতে পারে না। তিনি বিশ্বজগতের প্রতি অণু পরমাণু পর্য্যন্ত আপন দৈবী শক্তি দ্বারা ব্যাপিয়া আছেন। তিনি জগতের সর্ব্বত্র প্রাণশক্তিরূপে আছেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম **সর্ব্বগত**। জড় জগতের অধিষ্ঠান চৈতন্য এই মহামায়া। সেইজন্য তিনি প্রত্যেক জীবের মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে এবং প্রত্যেক জড় পদার্থের মধ্যে প্রচ্ছন্ন চৈতন্যরূপে বিরাজ করেন। তাঁহার শক্তিতে বিশ্বজগৎ স্থিতি লাভ করিতেছে। তিনি একাকী হইয়াও বহু নাম ও রূপ ধারণ করিয়া বহু খণ্ড চৈতন্যের ভাণ করিয়া থাকেন। সৃষ্টি লীলাই **মায়ের অখণ্ড ভাবে খণ্ড অভিনয়।** যেমন একই জল ভিন্ন ভিন্ন

আধার-পাত্র অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও বর্ণ ধারণ করে সেইরূপ ত্রিগুণময়ী এই মহামায়া এক হইয়াও বহু নাম ও রূপের আধার অনুসারে বিভিন্ন প্রাণশক্তির খেলা করেন। জগতের নাম ও রূপ অসংখ্য ও বিভিন্ন, কিন্তু এই সকল বিভিন্ন নাম ও রূপের আধার-স্বরূপ জীব-চৈতন্য আছেন। তিনি একমাত্র এই মহামায়া আর দ্বিতীয় কেহ নয়। মাই সকল জীবের ও সকল পদার্থের অন্তর্য্যামীরূপে বা আধার-চৈতন্যরূপে আছেন। একের বহুত্বের ভাণ হইলেও, এক বহু সাজিলেও, **বহুমূর্ত্তির অন্তরালে বহু চৈতন্য নাই**, সেই একই চৈতন্য যেন বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

কালরাত্রি! মা তুমি **প্রলয়ের অন্ধকার-স্বরূপিনী**। মহাপ্রলয়ে যখন সৃষ্টির কোন চিহ্ন থাকে না, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মুছিয়া যায়, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি নিবিয়া যায়, মহাশূন্যে কোন প্রকার আলোক থাকে না, কেবল অতি গাঢ় অন্ধকারে মহাশূন্য পরিপূর্ণ থাকে, সে সময় এই কালরাত্রি বা প্রলয়ের ঘন ঘোর অন্ধকার ছাড়া আর কিছু থাকে না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতাগণ এই অন্ধকারে ডুবিয়া যায়, চন্দ্র-সূর্য্যকে এই অন্ধকার গ্রাস করে, বিশ্ববাসীর অভুক্ত কর্ম্মফলের বীজ এই অন্ধকারে লীন থাকে, এই অন্ধকারই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া, ধুইয়া, মুছিয়া, ফেলিয়া দেয়, কোন প্রাণীর কোন কলরব থাকে না, কাহারও সাড়া শব্দ নাই, অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড, অনন্তকোটী জীবকে লইয়া, কোন যাদুকরের মন্ত্র-সাহায্যে যেন হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবলমাত্র এই ভয়ঙ্করা কালরাত্রি সৃষ্টিকে মুছিয়া ফেলিয়া আপনার সর্ব্বগ্রাসিনী শক্তির পরিচয় দিতেছে। **এই কালরাত্রিই মহামায়া**। যেহেতু মহামায়া **নিত্যা** অর্থাৎ পরিণামশূন্যা সেইজন্য সকলের নাশ হইলেও মহামায়ার নাশ নাই। মা চণ্ডী জন্ম-স্থিতি-

প্রলয়কর্ত্রী। তিনি বিশ্বসৃষ্টি সময়ে **সৃষ্টিরূপা,** বিশ্বজগত পালন করিবার সময়ে **স্থিতিরূপা,** বিশ্ব-প্রলয়ের সময়ে তিনি **সংহাররূপা**।

"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১।৫৭।

মা হইতেই সকলের জন্ম এবং মায়েতেই সকলের লয়। **যে মূর্ত্তিতে মা সকলকে লয় করেন সেই মূর্ত্তিই মায়ের কালরাত্রিমূর্ত্তি**। করুণাময়ী মা বিশ্বজননী হইয়া সন্তানের ধ্বংস কেমন করিয়া করেন? প্রলয়-সময়ে জীব সকল নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় বটে, কিন্তু যায় কোথায়? যাহার পরিণাম আছে তাহাকে নশ্বর বলে। নশ্বর জীব প্রলয়ে ধ্বংস হইবার পর স্থূল হইতে সূক্ষ্মে কোথায় অবস্থান করে? এই কালরাত্রিরূপিনী বিশ্বগ্রাসিনী মাতৃমূর্ত্তির শান্তিময় কোলে থাকিয়া সূক্ষ্মভাবে জীবগণ মহা নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে। প্রলয়ে স্থূল সৃষ্টি লোপ পায়, কিন্তু আগামী সৃষ্টির বীজ সূক্ষ্মভাবে এই কালরাত্রির অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে। কালরাত্রিরূপে মা আমাদের সকলকে প্রলয়ের অন্ধকাররূপ **বস্ত্রাঞ্চল** দিয়া ঢাকিয়া রাখেন। আমরাও সুষুপ্তিকালের পূর্ণ আনন্দ ভোগের মত প্রলয়ের পর মায়ের এই কালরাত্রিরূপা সর্ব্বগ্রাসিনী মূর্ত্তির কোলে থাকিয়াও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ভাবী সৃষ্টির বীজরূপে মাতৃ অঙ্গে লীন হইয়া **পূর্ণানন্দে** আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকি। প্রলয়ের পর সৃষ্টি লোপ পাইলে আমরা আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাই। আমাদের অহংজ্ঞান মহাপ্রলয়ের সঙ্গে লোপ পায়। আমরা স্বরূপে যে বস্তু সেই পরমাত্মাতে লীন হইয়া যাই। ব্রহ্মময়ী মায়ের একাকী থাকিতে কখনও ইচ্ছা করে না, সেইজন্য প্রলয়ে একাকী

থাকিলেও সৃষ্টির বীজকে বিশ্বগ্রাসিনী বিরাট অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখেন। সাধক জানেন যে প্রলয়ে সকলের নাশ হইলেও সাধককে সূক্ষ্মভাবে মাতৃঅঙ্কচ্যুত করিতে কেহই পারে না। সাধক জীবনে সাধনা দ্বারা মায়ের সন্ধান পাইলে মাই তাহাকে বুঝাইয়া দেন যে মহাপ্রলয়ে কালরাত্রি সকলকে গ্রাস করিলেও ভক্ত কোন বিভীষিকা দেখে না। মায়ের কৃপায় সাধক বুঝিতে পারে প্রলয়ের পর সাধক নষ্ট হয় নাই, পরন্তু মায়ের কোলে চিরশান্তিতে ঘুমাইয়া আছে। সকলের কাছে কালরাত্রির রূপ অতি ভীষণ, অতি ভীতিপ্রদ, কিন্তু সাধক মায়ের কৃপায় উপলব্ধি করে যে, সেই কালরাত্রি, বিশ্বজননীরই সন্তানের প্রতি স্নেহে বিগলিত হৃদয়া করুণাময়ী মূর্ত্তি। মাই যখন প্রলয়ে সংহার মূর্ত্তি ধারণ করেন, মাই যখন সৃষ্টির এই সুন্দর প্রকাশকে অন্ধকারে ডুবাইয়া দেন, মাই যখন বিশ্ব রচনার জালকে আপনার মধ্যে গুটাইয়া লন, মাই যখন বিশ্বজগতের সমস্ত ভেদজ্ঞান অপসারিত করিয়া দুর্ভেদ্য অন্ধকাররূপ একটী বিরাট অভেদ বস্তুতে স্থিতি লাভ করেন, মাই যখন মহাপ্রলয়ের কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার অগণিত বিভিন্ন নাম ও রূপ মুছিয়া ফেলিয়া এক অদ্বিতীয় সত্তারূপে আপনি আপন ভাবে থাকিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি সংহাররূপিনী এই ভীষণা কালরাত্রি মূর্ত্তি ধারণ করেন। সাধক অনুভব করেন যে মহামায়া হইতে তাহার উৎপত্তি এবং যে মহামায়ার করুণায় তাহার স্থিতি সেই মহামায়ারই কালরাত্রিরূপই তাহার লয়স্থান।

নমোঽস্তুতে!—মা! তোমাকে নমস্কার। যদি বিশ্বজগতে নমস্কারের যোগ্য কেহ থাকে তবে সে তুমিই। তোমাকে নমস্কার না করিয়া অপরকে নমস্কার করিলে তোমার প্রাপ্য সম্মান অপরকে দেওয়া হয়। মহামায়া! তোমার নিকট আমরা যে উপকার পাইয়াছি, পাইতেছি,

ও পরে পাইব, তাহা স্মরণ করিয়া, তোমার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তোমাকে নমস্কার করিয়া আমরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যখন ভাবিয়া দেখি যে তুমি আমাদের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্ত্রী এবং আমাদের গুরু ও পরম গুরুদিগেরও তুমি পূজনীয়া, যখন ভাবি যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবতাগণও তোমাকে ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া নিজেদের কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন, যখন স্মরণ করি ভূলোকবাসী ঋষিগণ ও স্বর্গবাসী দিব্য মহর্ষিগণ তোমাকে ভক্তিপূর্ব্বক অবনত মস্তকে প্রণাম করেন, তখন দেব-মহর্ষিগণের বরণীয়া তোমাকে নমস্কার করিয়া আমার মানব জীবন সার্থক জ্ঞান করি। তোমার মহিমা চিন্তা করিলে, তোমার করুণার কথা ভাবিতে বসিলে, শরণাগত ভক্তজনের প্রতি তোমার অহেতুকী কৃপার কথা ভাবিলে তোমার পাদপদ্মে আমার অভিমানে গর্ব্বিত মস্তক আপনিই নত হইয়া পড়ে। যখন দেখি তুমি ছাড়া জগতে আর বড় কেহ নাই, যখন দেখি আমার হৃদয়ের নানা প্রকারের বৈষয়িক চিন্তার জ্বালা দূর করিতে তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই, যখন দেখি আমাদের মত আর্ত্ত সন্তানগণের চক্ষের জল মুছাইয়া দুঃখ দূর করিতে তুমি ভিন্ন আর দ্বিতীয় আশ্রয় নাই, যখন দেখি ভক্ত সন্তানের জন্য বিশ্ব-জননী তুমি, বিশ্বব্যাপিনী করুণার ধারা সতত প্রবাহিত কর, যখন দেখি 'মা রক্ষা কর' এই শব্দ উচ্চারণ করিলে তুমি সাধকের চারি পাশ হইতে দৈববাণী রূপে মাভৈঃ শব্দ উচ্চারণ কর, যখন দেখি সন্তানের দুঃখের প্রতীকার করিবার জন্য তুমি ভীষণামূর্ত্তি পর্য্যন্তও ধারণ কর, তখন মহামায়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এবং অভীষ্ট পূরণের আশায় তোমার প্রসন্নতার জন্য **তোমার** পাদপদ্মে নমস্কার করিব না ত আর কোথায় করিব? এত দয়াবতী, এত গুণবতী, এত মহিমাময়ী মা

আমাদের! সেইজন্য মা তোমাকে যেন নমস্কার করিতে পারি। যদি তোমাকে নমস্কার করিতে না শিখিলাম তবে নমস্কার শব্দ সাধন-রাজ্যের অভিধান হইতে উঠিয়া যাক্। সেইজন্য ঋষি বলিতেছেন "তে নমঃ" (তোমায় নমস্কার)।

মা তোমাকে নমস্কার। শতবার, সহস্রবার, কোটীবার, তোমায় নমস্কার। তোমার মহিমা জানিবার পূর্ব্বে আমরা তোমার সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্বশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া 'অহং কর্ত্তা' জ্ঞানে যে সকল কার্য্য করিয়াছি, সেই সকল কার্য্যেই আমরা অতি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। আমরা যে বিশ্বজননীর সন্তান, আমরা যে অমৃতময়ী মায়ের পুত্র, ইহা একেবারে ভুলিয়া গিয়া স্বয়ং কর্ত্তাজ্ঞানে কার্য্য করিয়া সতত অপরাধী হইয়াছি। এখন আমরা, মা! তোমার প্রসাদে, তোমার দিব্য মহিমার প্রভাবে, তুমি যে বিশ্বজগতের রাষ্ট্রী, তুমি যে সকলের প্রভু, তুমি যে আমাদের ভাগ্যফল-বিধাতা—এই সনাতন তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া, আমরা যে বিশ্বজননীর সন্তান, আমরা যে মহামায়ার আশ্রিত, আমরা যে মায়ের হাতে যন্ত্রস্বরূপ, ইহা ধারণা করিতে পারিয়াছি; এইজন্য, ঋষি বলিতেছেন, মা! তোমার মহিমার কথা আমাদের মত সন্তানদের বুঝাইয়া দাও। যে মূহুর্ত্তে তোমার তত্ত্ব, তোমার কৃপায়, আমরা ধারণা করিতে পারিব, সেই মূহুর্ত্তে আমাদের 'অহং-কর্ত্তৃত্ব' জ্ঞান চলিয়া যাইবে ও আমাদের সকল কর্ম্মে মাতৃ-কর্ত্তৃত্ব ফুটিয়া উঠিবে। যখন ঠিক উপলব্ধি করিব **মাই আসল কর্ত্তা** আমরা তাঁর আজ্ঞাধীন দাস, অনুগৃহীত প্রজা, বাধ্য সন্তান, তখনই আমরা মাতৃত্বের মহিমা স্মরণ করিয়া অহঙ্কার-শূন্য হইব এবং অত্যন্ত নম্র এবং বিনীত হইব। যে অজ্ঞান আমাদের মাথা অভিমানে উচ্চ করিয়া রখিয়াছিল আজ সেই মাথা

মায়ের পাদপদ্মে নত হইতেছে। আমাদের কৃত পূর্ব্ব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ আমরা, মহামায়া! তোমাকে বারবার নমস্কার করিতেছি। সাধক যখন মায়ের মহিমায় মুগ্ধ হয় তখনই সে মায়ের নিকট নত হইয়া আত্ম সমর্পন করে। সাধক কৃত-অপরাধের কথা মনে করিয়া একবারমাত্র মহামায়া! তোমাকে প্রণাম করিয়া তৃপ্ত হয় না। অপরাধ যেমন সংখ্যায় বহু হইয়া গিয়াছে, অপরাধ যেমন পরিমাণে অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ মা! তোমাকে **সারা জীবন ধরিয়া** নমস্কার করা সাধক প্রয়োজন মনে করে। তোমাকে **ভুলিলে** মা! আমাদের **মাথা উচু** থাকে, তোমার **স্মরণে** আমাদের **মাথা নত** হইয়া যায়। মা! আমরা যেন এক মূহুর্ত্তও তোমাকে না ভুলি এবং সেইজন্য তোমাকে বার বার অন্তরে ও বাহিরে **প্রণাম করা আমাদের যেন বন্ধ না হয়**। যতদিন পর্য্যন্ত স্থূল দেহে আমরা থাকিব, যতদিন পর্য্যন্ত মা! তোমায় দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ না হইব, যতদিন পর্য্যন্ত মোক্ষদায়ক তোমার শান্তিময় কোলে বিশ্রাম লাভ না করিব, ততদিন যেন তোমাকে বার বার নমস্কার করিতে না ভুলিয়া যাই। মা! তোমায় আবার নমস্কার। আমাদের উদ্দেশ্য **অপরাধ-ক্ষমা-প্রার্থনা ও তোমার প্রসন্নতা**।

যখন আমাদের জ্ঞান হয় জগতের কোন কিছু বস্তুই **আমাদের নিজস্ব নহে** এই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কার কিছুই আমাদের নিজের নহে, **সমস্তই মায়ের দান সামগ্রী** তখনই আমাদের প্রকৃত পক্ষে মাকে নমস্কার করা হয়। **“ন মম”**, আমার কিছুই নহে, সমস্তই মায়ের, এই ভাব হইতে নমস্কার কথার ‘নমস’ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

'অস্তু' 'হউক'। মা! ভক্ত সন্তান প্রার্থনা করিতেছে তোমার পাদপদ্মে যেন আমরা নমস্কার করিতে পারি। আমাদের মাথা তোমার পায়ে নত করিয়া দাও মা—এই আমাদের প্রার্থনা। জগতে সর্ব্বাপেক্ষা শান্তিময় অবস্থা মায়ের পাদপদ্মে মাথা নত করিয়া থাকা। মা! কৃপা কর, যেন নমস্কার করিয়া তোমার স্নেহ খুব বেশী আকর্ষণ করিতে পারি। আর কোন প্রকার সাধনা করিতে পারি বা না পারি তোমাকে উদ্দেশে যেন স্মরণ করিতে পারি মা! আমাদের নমস্কার করা শিখাইয়া দাও—এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। গীতায় বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ভগবৎ মহিমা দর্শনে মুগ্ধ অর্জ্জুনের মত যেন আমরা বলিতে পারি, "মহামায়া! তোমার সম্মুখভাগে প্রণাম, তোমার চারিপাশে প্রণাম, তোমাকে সহস্রবার প্রণাম। শরণাগতপালিকে! এই আমাদের একটী সাধ পূর্ণ কর মা!—**যেন তোমায় ঠিকভাবে নমস্কার করিতে আমরা শিখি।"**

মন্ত্র

জয়ন্তী, মঙ্গলা কালী
ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা
স্বধা নমোঽস্তুতে ॥২॥

অনুবাদ

(মা চণ্ডি!) তুমি জয়ন্তী (সর্ব্বত্র জয়যুক্তা,) তুমি মঙ্গলা, (জন্মাদি-নাশিনী), তুমি কালী (সর্ব্বগ্রাসিনী,), তুমি ভদ্রকালী

(সুখ বিধায়িনী,) তুমি কপালিনী (প্রলয় কালে ব্রহ্মাদিরও বিনাশের পর তাঁহাদের মস্তকাস্থি হস্তে লইয়া বিচরণ-কারিনী) তুমি দুর্গা (বহু তপঃক্লেশ দ্বারা তুমি প্রাপ্তব্যা,) তুমি শিবা (মঙ্গলময়ী,) তুমি ক্ষমা (সহন শীলা,) তুমি ধাত্রী (বিশ্বজগৎ-ধারণ-কর্ত্রী,) তুমি স্বাহা (মন্ত্ররূপিনী হইয়া দেবলোক পোষণকারিনী,) তুমি স্বধা (মন্ত্ররূপিনী হইয়া পিতৃলোক-তোষণকারিনী,) তোমাকে নমস্কার।

জয়ন্তী—জয়শালিনী ; জয়যুক্তা ; সর্ব্বোৎকৃষ্টা।

মার্কণ্ডেয় ঋষি অর্গলাস্তুতির প্রারম্ভে শ্রীশ্রীচণ্ডিকাদেবীকে নমস্কার করিতেছেন। মহামায়া চণ্ডিকাদেবীর নানাপ্রকারের অলৌকিক সদ্‌গুণ আলোচনা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা হইতেছে। এই মন্ত্রে মহামায়ার গুণাবলীর কথা ধ্যানোপযোগী করিয়া সংক্ষেপে বলা হইতেছে। সাধক মহামায়ার এক একটী গুণের কথা স্মরণ করিয়া যাহাতে সহজে তাঁহাকে ধ্যান করিতে পারে, সেই জন্য মার্কণ্ডেয় ঋষি এই মন্ত্রে মহামায়ার কতকগুলি নামের সার্থকতা দেখাইতেছেন।

জগদম্বার একটী নাম **'জয়ন্তী'**। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিনী মা সকল কারণেরও কারণ বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও সর্ব্বোৎকৃষ্টা। মায়ের মহিমা ঠিক ভাবে বুঝিতে পারিলে সাধক সিদ্ধ হন। সিদ্ধাবস্থায় মহামায়াকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উপলব্ধি হয়। মায়ের মহিমাকে ক্ষুন্ন করিতে পারে এমন ব্যক্তি বা বস্তু এ বিশ্ব-জগতে নাই। মহামায়ার জয় সর্ব্বত্র। তাঁহার মহিমায় তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণেরও জয় সর্ব্বত্র। তিনি বা তাঁহার মহিমা কখনও কোথায়ও পরাজিত বা খর্ব্ব হন নাই। সেই জন্য তাঁহার একটী নাম **অজিতা** বা **অপরাজিতা**। তিনি তাঁহার মহিমার সহিত সর্ব্বদা জয়যুক্তা

থাকেন। সেইজন্য যে সকল দুষ্টবুদ্ধি জীব মাকে জয়শালিনী না দেখে, বা না বলে, তাহারা মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। মা যখন সর্ব্বদাই জয়যুক্তা, তখন মাকে ঠিকভাবে দেখিলে তাঁহাকে জয়ন্তী মূর্ত্তিতেই দেখা যায়। মাতৃগত-প্রাণ সিদ্ধ সাধক মায়েরই জয় গান করে। **বিশ্ব-জগৎ নীরব ভাষায় মায়েরই জয় গান করে**। মহামায়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ বা কিছু নাই। তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট তত্ত্ব বা সত্ত্বা বলিয়া মায়ের নাম **জয়ন্তী**। ঋষিগণ মাতৃ মন্ত্রের সাধনায় মায়ের জয়গান না করিয়া থাকিতে পারে না। দেবতাদের স্তবস্তুতিতে সেই জন্য এত জয়ধ্বনি আমরা দেখিতে ও শুনিতে পাই। **ভগবতীপুষ্পাঞ্জলিস্তোত্র** খুব দীর্ঘ; কিন্তু তাহাতে মায়ের জয় গান প্রতি তিন লাইন অন্তর চতুর্থ লাইনে আছে। মায়ের সেই জয় গান শুনিলে ভক্তের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়। সেই জয় গান এই :—

"জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দ্দিনি! রম্যকপর্দ্দিনি!
শৈলসুতে!"

মায়ের জয় গান করিলে মা প্রসন্ন হন, ভক্তের অভীষ্ট পূরণ করেন! মায়ের জয় গান না করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়; মাকে উপেক্ষা ও অমান্য করা হয়। তাহার ফলে অমঙ্গল ও অশান্তি উপস্থিত হয়। বদ্ধজীব ক্রমাগত মাতৃমঙ্গল-গীত গান করিলে মায়ের প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মে, এবং তাহার আসক্তির বন্ধন শিথিল হইয়া যায়; মা তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে বন্ধন মুক্ত করেন। মায়ের এমনি মহিমা!

দক্ষ-যজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে বিষ্ণু-চক্রে তাঁহার শরীর

৫১ অংশে বিভক্ত হইয়া ভারতবর্ষের যে যে স্থানে পতিত হয়, সেই সেই স্থান এক একটী পীঠস্থানে পরিণত হয়। এই ৫১ পীঠের মধ্যে একটী পীঠস্থান **জয়ন্তীক্ষেত্র**। শ্রীহট্ট জেলার এই জয়ন্তী ক্ষেত্রে সতীর বাম জঙ্ঘা পড়িয়াছিল। এখানে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম **দেবীজয়ন্তী** এবং ভৈরব ক্রমদীশ্বর। এই স্থানে দেবীর জঙ্ঘা প্রোথিত দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবতীর জয়ন্তী মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ একটী পীঠস্থানের মূর্ত্তি।

জয়ন্তী মহোৎসব নামে ভারতবর্ষে একটী উৎসব প্রচলিত আছে। যে শুভদিনে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে গীতা উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই স্মরণীয় দিনে প্রতি বৎসরে **গীতা জয়ন্তী** উৎসব ভারতবর্ষের বহু স্থানে এখনও অনুষ্ঠিত হয়।

মহামায়া! ভাগ্যবান ভক্ত তোমার জয়গান করিয়া শুধু যে তোমাকে জয়ন্তী বলে তাহা নহে; আনন্দে আত্মহারা হইয়া তোমার জয়ন্তী মূর্ত্তির এবং জয়ন্তী নামের জয়গান করে। সেইজন্য ভক্তগণ **জয়জয়ন্তী** নামে মায়ের এক মূর্ত্তিকে স্মরণীয় করিবার জন্য ছত্রিশ রাগিণীর মধ্যে একটী রাগিণীর নাম রাখিয়াছেন জয়জয়ন্তী।

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হইলেই প্রলয়কাল উপস্থিত হয়। প্রলয়ে সৃষ্টি ধ্বংস হইলে **ত্রিগুণময়ী** মহামায়া **ত্রিগুণাতীতা** হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন। ব্রহ্মস্বরূপিনী মা প্রলয়ের পর আবার নূতন কল্পের সৃষ্টি করেন। সুতরাং তিনিই সৃষ্টির মূলীভূত কারণ-স্বরূপ বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। এইভাবে সর্ব্বকারণ-কারণ বলিয়া তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্টা এবং সেই জন্য মায়ের এই প্রসিদ্ধ নাম জয়ন্তী।

মঙ্গলা—মোক্ষপ্রদা। ভক্তগণের জনম-মরণাদিরূপ কর্ম্মচক্র যিনি গ্রহণ করেন বা নাশ করেন তিনিই মঙ্গলা। মহামায়া যখন প্রসন্না

হইয়া ভক্তগণের জন্মান্তর-পরিগ্রহ বন্ধ করিয়া মোক্ষ প্রদান করেন তখনই তিনি মঙ্গলা নাম ধারণ করেন। মহামায়া কৃপা করিলে ভক্ত এই দেহে থাকিয়াই জীবন্মুক্ত বা বিদেহ-মুক্ত হইতে পারে। এ কথা গীতায় আছে। ভক্ত আত্মদর্শন বা মাতৃদর্শন করিবার পর দিব্যজ্ঞান লাভ করে। দিব্য জ্ঞানের পর তাহার প্রাণের উৎক্রমণ না হইয়াও ভক্ত সর্ব্ব প্রকারের কর্ম্মবন্ধন-মুক্ত হয়। তাহার হৃদয়ের গ্রন্থিসকল ভেদ হইয়া যায়, তাহার সমস্ত সংশয় দূর হইয়া যায়, সে জীবন্মুক্ত হয়। **বেদ** বলেন :—

"**ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি**"—তাহার প্রাণের উৎক্রমণ হয় না।

পূজ্যপাদ আচার্য্যগণ মায়ের **মঙ্গলা** নামের উক্ত প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যিনি (মঙ্গং লাতি ইতি মঙ্গলা) মঙ্গকে অর্থাৎ ভক্তগণের জন্ম ও মৃত্যু ব্যাপারকে লাতি অর্থাৎ নাশ করেন—যিনি বদ্ধজীবকে মুক্ত করেন, তাঁহার নাম মঙ্গলা। মহামায়া জীবের ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করেন। যে সাধক মায়ের কাছে ভোগের প্রার্থনা করে তিনি তাহাকে প্রচুর ভোগ দিয়া সংসারে আসক্তির বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখেন। আবার যে ভক্ত মুক্তি প্রার্থনা করে তাহাকে তিনি সমাধি বৈশ্যের ন্যায় মোক্ষদায়ক তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। যে জন্ম-মৃত্যু-চক্রে আমরা সকলে অনাদিকাল হইতে লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া আসিতেছি শ্রীশ্রীচণ্ডিকা দেবী আমাদের সেই দুরন্ত দৈবী কর্ম্মচক্র বন্ধ করিয়া দিতে পারেন এবং তাহার ফলে আমরা পরম শান্তি লাভ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারি। মায়ের এই অপূর্ব্ব মোক্ষদায়ক গুণ আছে বলিয়া মায়ের একটী নাম **মঙ্গলা** হইয়াছে। ভক্তগণ দেবীর মঙ্গলা নাম স্মরণ করিয়া ভক্তির আতিশয্যে তাঁহাকে **সর্ব্ব-মঙ্গলা** বলিয়া পূজা ও আরাধনা করিয়া সফলকাম হইতেছেন।

কালী—কলয়তি, ভক্ষয়তি, সর্ব্বমেতৎ প্রলয়কালে ইতি কালী। যিনি প্রলয়কালে বিশ্বজগতের সমস্ত বস্তু ও প্রাণী ভক্ষণ করেন, তিনিই কালী। প্রলয়কালে সৃষ্টি লোপ পায়। এই বিরাট সৃষ্টি লুপ্ত হইয়া যায় কোথায়? এই চণ্ডিকা দেবী সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিনী। মহামায়া সংহার-মূর্ত্তিতে বিশ্ব জগতের সমুদয় পদার্থ প্রলয়কালে গ্রাস করেন। যে মহামায়া হইতে বিশ্বের উৎপত্তি সেই মহামায়াতে সৃষ্টি লুপ্ত হইয়া সূক্ষ্মভাবে লীন থাকে। প্রলয়কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতাদের অস্তিত্ব থাকে না। এই সকল শ্রেষ্ঠ দেবতাগণকে মহামায়া ধ্বংস করেন ও ভক্ষণ করেন। প্রলয়ে কোন কিছু থাকে না। এত বৃহৎ বৈচিত্রপূর্ণ বিশ্বকে যিনি এমন কৌশলে ভক্ষণ করিতে পারেন, যে, সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ প্রাণীগণের সহিত একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায়, তাঁহাকেই **কালী** বলে। মহামায়া প্রলয়কালে আপন মায়ার জাল সংহরণ করেন। তাঁর সৃষ্টি লোপ করিতে পৃথিবীতে অপর কোন শক্তি পারে না। তাঁরই সাজান এই বিশ্বকে প্রলয়ের সময় তিনিই ভক্ষণ করেন। কিন্তু ভাবী সৃষ্টির বীজরূপে তিনি সমস্ত জিনিষকে প্রলয়ের অন্ধকারের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে রাখিয়া দেন। কালী মূর্ত্তিতে যখন মহামায়া সমস্ত বিশ্বকে ভক্ষণ করেন তখনই প্রলয়কাল উপস্থিত হয়। যাঁহার এইরূপ বিশ্বজগৎ ভোজন করিবার শক্তি আছে, তিনি প্রলয়কালের পূর্ব্বেও আশ্রিত ভক্তগণকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভক্তের সাধনার সমস্ত অন্তরায়গুলিকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন; তাহার ফলে ভক্ত সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে। **কালী কল্পতরু**।

আবার, কালকে যিনি গ্রাস করেন তিনিই কালী। যে কাল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে পর্য্যন্তও গ্রাস করেন, সেই কাল বা মহাকাল মহামায়ার পদানত। কাল সকলকে আপনার বশে আনিয়া ধ্বংস করে; কালী

আবার সেই কালকে আপনার পদতলে রাখিয়া তাহার বুকে দাঁড়াইয়া বিশ্ব-ধ্বংসলীলার অভিনয় করেন। যেখানে ধ্বংসের প্রয়োজন সেইখানেই মায়ের কালীমূর্ত্তির আবির্ভাব। ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মশক্তি মা, সর্ব্বগ্রাসিনী কালিমূর্ত্তিতে ভক্তগণের হৃদয়ে বিপুল আনন্দ প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর সপ্তম অধ্যায়ে চণ্ডমুণ্ড বধ করিবার জন্য কালীমূর্ত্তির আবির্ভাবের কথা আছে। মা কালীর সেই অপূর্ব্ব সংহারমূর্ত্তির বর্ণনা এইরূপ আছে।

"**কালী** করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাঽসিপাশিনী ॥
বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালা-বিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা ॥"

এই ধ্যানের অনুবাদ ঃ—

তাঁহার ভ্রূকুটী—কুটিল ললাটফলক হইতে শীঘ্র করালবদনা ও খড়্গপাশহস্তা কালী বহির্গত হইলেন। সেই দেবী বিচিত্র খট্টাঙ্গধারিনী, নরমালা-বিভূষণা, ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধারিনী এবং শুষ্কমাংসনিবন্ধন অতি ভয়ঙ্করী। তিনি অতি বিস্তারবদনা, লোলরসনাবশতঃ ভীমদর্শনা, কোটর-প্রবিষ্ট রক্তনয়না ও ভীষণ হুঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরণকারিনী।

৫১ পীঠের এক পীঠ কালিঘাটে দেবীর দক্ষিণ চরণের চারিটী অঙ্গুলী পতিত হইয়াছিল। এই পীঠ দেবতার নাম **কালিকা দেবী** ও ভৈরবের নাম নকুলেশ্বর।

এই কালিকাদেবী কালভয়হারিনী ও কৈবল্যদায়িনী।

ভদ্রকালী—ভদ্রম্, মঙ্গলম্, সুখম্, কলয়তি, স্বীকরোতি ভক্তেভ্যঃ দাতুম্ ইতি ভদ্রকালী। মঙ্গলদায়িনী, সুখপ্রদা। যিনি ভক্তগণকে স্বেচ্ছায় মঙ্গল দান করিতে অঙ্গীকার করেন তিনিই ভদ্রকালী। ভদ্রকালী মহামায়ার একটী নাম। মায়ের ভক্ত যখন দুঃখে পতিত হয়, তখন দুঃখের প্রতিকার করিবার জন্য সে মায়ের শরণাগত হয়। মহামায়া ভদ্রকালীরূপে সেই ভক্তকে সুখ প্রদান করেন। দুঃস্থ সন্তানকে সুখী করিবার জন্য মা বর-মুদ্রা ধারণ করেন। যখন ভক্ত বিপদের মধ্যে বাস করে, যখন দুঃখের সহিত তাহাকে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হয়, যখন তাহার চারিধারে অমঙ্গল ঘিরিয়া ফেলে, তখনই ভক্তের কাতর প্রার্থনায় মায়ের ভদ্রকালীরূপে আবির্ভাব হয়। শরণাগত প্রার্থী সন্তানের অভীষ্ট পূরণ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন। সুখের প্রার্থী ভক্তকে সুখ প্রদান করেন, মঙ্গলকামী ভক্তকে কল্যাণ দান করেন, ত্রিতাপদগ্ধ সন্তানকে শান্তিদান করেন—ইহা মায়ের স্বভাব। এইজন্য ভদ্রকালী কথার অর্থ সুখপ্রদা বা মঙ্গলদায়িনী। ভদ্রকালী মূর্ত্তিতে মহামায়া আশ্রিত সন্তানকে ভোগ-সুখ প্রদান করেন। সন্তানের ভোগে যখন কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তখন করুণাময়ী মা সন্তানের প্রার্থনায় তাহার ভোগের বাধা দূর করিয়া তাহার ভোগসুখ অক্ষুন্ন রাখিতে এবং অমঙ্গল দূর করিয়া ভক্তগণের প্রার্থিত মঙ্গল দান করিতে স্বীকার করেন। বিশ্ব জননী কল্পতরুসদৃশা। সাধক এই ব্রহ্মময়ী মায়ের নিকট সাংসারিক যাহা কিছু মঙ্গল বা সুখ প্রার্থনা করেন, ভাবগ্রাহিনী মা, ভক্তের সেই সকল সাধ পূর্ণ করেন। মঙ্গলময়ী মায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া কোনও ভক্তের অকল্যাণ হইতে পারে না। ভদ্র কালীর উপাসনা করিয়া কোন ভক্ত সুখহারা বা শান্তিহারা হইতে পারে না। বিশ্ববাসী

সন্তানগণের যাহা কিছু প্রার্থনার বিষয় বা যাহা কিছু অভাব, সেই সমস্তই জগদম্বার বিরাট ভাণ্ডারে ভক্তগণকে দান করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। পার্থিব সম্পদ লাভ করিতে ইচ্ছুক মায়ের ভক্ত মায়ের নিকট দান গ্রহণ করিয়া অভাব পূরণ করিবার জন্য নাম জপ ও পূজা করেন। ভদ্রকালী জীবের দুঃখ হরণ করিয়া তাহাকে সর্ব্ব সুখে সুখী করেন। জীব কর্ম্মদোষে যখন বিপন্ন হয় তখন ভদ্রকালীপ্রসাদে জীবের অকল্যাণ দূরে যাইয়া মঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হয়।

পুরাণে মায়ের ভদ্রকালীমূর্ত্তিতে পাতালে আবির্ভাবের কথা আছে। সিদ্ধ রামপ্রসাদ একটী শ্যামাসঙ্গীতে এই ভদ্রকালী মূর্ত্তির কথা বলিয়াছেন ঃ—

"বসন পর মা, বসন পর মা, বসন পর মা, তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা পদে দিব আমি গো॥

*　　　*　　　*　　　*

পাতালেতে ছিলে মাগো হয়ে **ভদ্রকালী**"

যেখানে জ্ঞানের বিকাশ বা বিদ্যার আবির্ভাব, সেখানেই মঙ্গল বা শান্তি। যেখানে অজ্ঞানের আবির্ভাব বা অবিদ্যার খেলা, সেখানেই অমঙ্গল ও অশান্তি। বিদ্যার সঙ্গে মঙ্গল এবং অবিদ্যার সঙ্গে অমঙ্গল থাকে। মঙ্গল বা মায়ের ভদ্রকালীমূর্ত্তি বিদ্যারূপিনী বা সরস্বতী বা বাক্‌দেবী, সেইজন্য বেদমাতা বাক্‌বাদিনীকে শাস্ত্রে ভদ্রকালী নামে অভিহিত করা হয়। সরস্বতীর প্রণাম মন্ত্রে আমরা ভদ্রকালী নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। সরস্বতীর প্রণাম মন্ত্র এই ঃ—

"সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।"

কপালিনী—ব্রহ্মাদীন্ নিহত্য তেষাং কপালং গৃহীত্বা প্রলয়কালে অটতি ইতি কপালিনী।

"কপালোঽস্ত্রী শিরোঽস্থি স্যাদ্ঘটাদেঃ শকলেষু চ'। ইতি মেদিনীকোষাৎ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণকে নিহত করিয়া তাঁহাদের মস্তকের অস্থি সকল গ্রহণ ও ধারণ করিয়া প্রলয়কালে যিনি ভ্রমণ করেন তিনিই কপালিনী।

প্রলয়কালে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা, পালন কর্ত্তা বিষ্ণু ও সংহার কর্ত্তা মহেশ্বর পর্য্যন্তও লয়প্রাপ্ত হন। আদ্যাশক্তির বিশ্বরচনা তিনি আপন হস্তে মুছিয়া ফেলেন। প্রলয়ে একমাত্র ব্রহ্মময়ী মহামায়া ব্যতীত আর কেহই থাকে না। মহামায়ার মাহাত্ম্য তাঁহার কপালিনী মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠে। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ধ্বংসের পর তাঁহাদের মস্তকের অস্থিসকল গ্রহণ করিয়া নিহত অসুরদিগের মুণ্ডমালা ধারণের ন্যায়, ধারণ করিয়া, একাকী দ্রষ্টা ও দৃশ্য সাজিয়া প্রলয় সময়ে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া বেড়ান। সে নৃত্য দেখিবার কেহ তখন থাকে না। সে কপালিনীমূর্ত্তির অপূর্ব্ব শোভা দেখিবার আর কেহ থাকে না। মা চণ্ডীর মহিষাসুর বা শুম্ভ নিশুম্ভ বধের সময়ের দানবদলনী-মূর্ত্তি, দেবতা সকল ও দিব্যসিদ্ধ মহর্ষিগণ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। মহিষাসুর-মর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তির স্তব করিয়া দেবতাগণ ধন্য হইয়াছিলেন ও মায়ের নিকট ঈপ্সিত বর লাভ করিয়াছিলেন। ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ ও শুম্ভ নিশুম্ভ মহাসুরগণকে বধ করিবার সময়ে মা চণ্ডীর অতি আশ্চর্য্য ও দৈবী মূর্ত্তি দেবতাগণও সিদ্ধ মহর্ষিগণ দর্শন করিয়াছিলেন এবং "নারায়ণীস্তুতি" দ্বারা স্তব করিয়া মায়ের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রলয়কালে মা চণ্ডীর কপালিনী

মূর্ত্তিতে ধ্বংস লীলার যে অভিনয় তাহা দেখিবার সৌভাগ্য কোন দেবতা বা সিদ্ধ মহর্ষি কাহারও ভাগ্যে হয় না। যে ব্রহ্মা প্রসন্ন হইলে রাবণের মত দানবকে নর বানর ব্যতীত অপরের অবধ্য হইবে এই প্রকার অমরত্ব বর দিতে পারেন; যে বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া ভক্ত ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতির অভীষ্ট পূরণ করেন ও মুক্তি প্রদান করেন এবং যিনি দশ অবতারে দশ প্রকারের লীলা অভিনয় করিয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ ও অসাধুর বিনাশ করেন; যে মহেশ্বর সমুদ্রমন্থনে উত্থিত গরল পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন এবং জগদ্‌বাসীকে সেই হলাহলের জ্বালা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; যে ভগবান শঙ্কর বিশ্ববাসীর জ্ঞানগুরু ও অলৌকিক তত্ত্বপ্রধান দুরূহ তন্ত্রশাস্ত্রের বক্তা এবং যিনি মহাকাল-রূপে সমস্ত ধ্বংস করেন, সেই সগুণ ব্রহ্ম-মূর্ত্তিস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মহাপ্রলয়ে লয়প্রাপ্ত হন। মহামায়া তাঁহার অতি প্রিয় এই তিনটি প্রধান দেবতার ধ্বংসের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মস্তকের অস্থিমালা মুণ্ডমালারূপে ধারণ করিয়া কপালিনী মূর্ত্তিতে প্রলয় কালে নৃত্য করিয়া বেড়ান। শাস্ত্রে মহামায়ার সেই প্রলয় নৃত্যের আংশিক বর্ণনা আছে ঃ—

"ডিম্বং ডিম্বং সুডিম্বং পচ পচ সহসা
ঝম্য ঝম্যং প্রঝম্যং
নৃত্যন্তী শব্দ বাদ্যৈঃ স্রজমুরসি শিরঃ
শেখরং তার্ক্ষ্যপক্ষৈঃ।"

ব্রহ্ম-কপালধারিনী বলিয়া মায়ের একটী নাম কপালিনী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, প্রলয়ে মায়েরই শ্রীঅঙ্গে লীন হইয়া থাকে। মাও

স্নেহবশতঃ আদর করিয়া সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে নিজের কোলে স্থান দেন। প্রলয়ে সকল জীবই মায়ের আশ্রয়ে সূক্ষ্মভাবে স্থান পায়। কেবলমাত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া এবং মায়ের অত্যন্ত আদরের বলিয়া মায়ের অঙ্গে লীন হইয়াও স্থূল ভাবে প্রকাশিত হয়। সেইজন্য মহাপ্রলয়ে কোন জীবেরই অস্তিত্বের চিহ্ন না থাকিলেও মায়ের অঙ্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের অস্তিত্বের চিহ্ন তাঁহাদের মস্তকের অস্থিমালারূপে প্রকটিত হয়। ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকেও ধ্বংস করিবার শক্তি মায়ের যে আছে তাহা মায়ের এই কপালিনী-মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছে। দেবী চণ্ডিকা অসুরদলন করেন ভক্ত দেবতাগণকে রক্ষা করিবার জন্য। আবার দেবতা দলন করেন তাঁহার অচিন্ত্য পরাক্রম দেখাইবার জন্য ও সৃষ্টি-সংহার-লীলার অভিনয় করিবার জন্য। তিনি ব্রহ্মস্বরূপিনী। তিনিই ব্রহ্ম। প্রলয়ে ব্রহ্ম ব্যতীত আর সকলের নাশ হয়। ব্রহ্মময়ী কপালিনী মূর্ত্তিতে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের ধ্বংসের চিহ্ন ধারণ করিয়া প্রলয়কালে লীলাছলে নৃত্য করিয়া বেড়ান। তিনি যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ তাহা এই কপালিনী মূর্ত্তির ধ্যান করিলে বেশ স্পষ্ট অনুভূত হয়।

"প্রপঞ্চরূপাম্বুজং হস্তে যস্যা ইতি বা। কপালিনী মত্বর্থীয় ইতিঃ। 'প্রপঞ্চাম্বুজহস্তা চ কপালিন্যুচ্যতে পরে'তি রহস্যাগমাৎ'।"

মায়া প্রপঞ্চরূপ হস্তে যাঁর শোভা পায় তিনিই কপালিনী।

মায়া-প্রপঞ্চরূপ হস্তে যাঁর শোভা পায় তিনিই কপালিনী। মহামায়ার একটী রূপের ধ্যান মূর্ত্তি এই লীলাকমলধারী মূর্ত্তি। সেই লীলাকমলটী পার্থিব অম্বুজ নহে। অনাদি সৃষ্টিলীলার প্রতীক্ এই লীলাকমল। জগন্মাতা এই জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গচক্র লীলাকমলের ন্যায় ধারণ করিয়া

শোভা পাইতেছেন। মহামায়ার এই অপূর্ব্ব মায়ার মহিমা যে মূর্ত্তিতে প্রকাশ হয় সেই মূর্ত্তিকে কপালিনী মূর্ত্তি বলে। শাস্ত্রে মহামায়ার শক্তি অপর সকল শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া এবং তাঁহার মায়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলিয়া তাঁহাকে কপালিনী বলা হইয়াছে। পদ্ম হস্তে থাকিলে পদ্মধারিণীর যেমন শোভা বৃদ্ধি হয় এবং তাঁহার বিলাস ও ঐশ্বর্য্য স্থচনা করে সেইরূপ এই জগৎপ্রপঞ্চ মহামায়া ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া, তাঁহার অপূর্ব্ব মহিমা প্রকাশিত হইতেছে। পদ্মধারিণী নারী যেমন ইচ্ছামত লীলাকমল হস্তে ঘুরাইতে ঘুরাইতে মনের আনন্দ প্রকাশ করেন, মা চণ্ডীও সেইরূপ এই বিরাট মায়ার খেলা খেলিতে খেলিতে লীলার আনন্দ উপভোগ করেন। এই স্বষ্টি স্থিতি, লয়রূপ মায়ার যে খেলা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এই অপূর্ব্ব মায়ার খেলা মহামায়াই খেলিতেছেন। তিনিই এই মায়ার খেলার চালক, ধারক ও সংহারক। তিনি এই খেলা এত ভালবাসেন যে এক মূহুর্ত্তও এই খেলা তিনি বন্ধ করিয়া রাখেন না। সেই জন্য শাস্ত্রে তাঁর কপালিনী মূর্ত্তির ধ্যানে বলা হইয়াছে যে তিনি প্রপঞ্চরূপ পদ্মহস্ত ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ভাগ্যবান সাধক মায়ের এই কপালিনী মূর্ত্তি ধ্যানে উপলব্ধি করিতে পারেন। লীলাময়ী জগজ্জননী লীলার বিলাস ও বৈভব দেখাইবার জন্য সত্ত্ব-রজ-তম এই তিন গুণের খেলায় বিশ্ববাসীকে মজাইয়া ও মাতাইয়া রাখিয়াছেন। মায়ের এই কল্যাণময়ী কপালিনীমূর্ত্তির জয় হউক।

দুর্গা।—"দুঃখেন অষ্টাঙ্গযোগ-সর্ব্বকর্ম্মোপাসনা রূপেন ক্লেশেন গম্যতে প্রাপ্যতে সা দুর্গা।"

"তাং দুর্গাং দুর্গমাং দেবীমিতি দেব্যথর্ব্ব-শিরসঃ।"

যাঁহাকে অনেক কষ্টকর তপস্যা করিয়া পাওয়া যায় তিনিই দুর্গা। যাঁহার অপেক্ষা দুর্লভ বস্তু জগতে আর কিছু নাই, যাঁহাকে লাভ করিতে হইলে জগতের সমস্ত প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির উপর হইতে আসক্তি তুলিয়া লইয়া সমস্ত প্রাণ মন তাঁহাতে সমর্পণ করিতে হয়; যিনি অতি দুর্গম তত্ত্বস্বরূপ; যিনি সাধারণ জীবের পক্ষে বাক্য এবং মনের অতীত; উপাসনার নানা প্রকারের কষ্ট, হৃদয়ের প্রবল ব্যাকুলতা এবং তাহাতে সমস্ত নির্ভরতা ব্যতীত যাঁহাকে পাওয়া যায় না, তিনিই দুর্গাদেবী! মহামায়াকে দর্শন করিতে হইলে সাধককে অনেক প্রকারের কষ্ট সহ্য করিতে হয়। সেইজন্য মায়ের একটী নাম দুর্গা। যোগী অষ্টাঙ্গ যোগের ক্লেশ সহ্য করে এই আত্মারূপিনী মায়ের দর্শনের জন্য। পার্থিব জগতে যে বস্তু যত মূল্যবান এবংদুর্লভ, সেই বস্তু লাভ করিতে হইলে তত বেশী কষ্ট জীবকে সহ্য করিতে হয়। কোটী কোটী জীবের মধ্যে ভাগ্যবান লক্ষ্মীবান জীবের ঘরে সুবর্ণরূপ ধন থাকে। আবার তাহাদের মধ্যে যাহারা সমধিক ভাগ্যবান্ তাহাদের ঘরে সুবর্ণ অপেক্ষাও মূল্যবান হীরক, রত্ন, মণি-মাণিক্যাদি থাকে এবং তাহারা সেই সকল বহুমূল্য দ্রব্য সঞ্চয় করিতে বহু ক্লেশ করিয়া থাকে। কিন্তু এ সকল পার্থিব রত্নাদি হইতে শ্রেষ্ঠ ও অবিনশ্বর রত্ন এই চণ্ডিকাদেবী। ইনিই জগতের রাষ্ট্রী এবং পার্থিব ও অপার্থিব ধনের অধীশ্বরী। পার্থিব রত্ন যদ্যপি বহু আয়াস ও ক্লেশ ব্যতিরেকে লাভ করা না যায়, অপার্থিব রত্ন-শ্রেষ্ঠ এই মহামায়াকে জীব লাভ করিতে হইলে কত ক্লেশকর তপস্যার অনুষ্ঠান তাহাকে করিতে হয়, ইহা সহজেই অনুমেয়। বিনা ক্লেশে বস্তু লাভ হয় না। সেই জন্য ব্রহ্মময়ী মাকে লাভ করিতে হইলে জগৎ-ভোগ বিষয়ে পূর্ণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, বহুকাল ধরিয়া, সাধনার পথে, কষ্টকর তপস্যা করিতে হয়।

বেদ সেইজন্য ব্রহ্ম-লাভের পথকে দুর্গম পথ বলিয়াছেন।

কঠোপনিষদ্ বলেন ঃ—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥"

অর্থাৎ অত্যন্ত তীক্ষ্ণধারযুক্ত ক্ষুরের উপর দিয়া গমন করা যেমন দুঃসাধ্য, সেইরূপ জীবের পক্ষে ব্রহ্ম লাভ করাও অত্যন্ত দুঃসাধ্য, এই কথা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ বলেন।

এই চণ্ডিকাদেবীর নাম দুর্গাদেবী হইবার একটী প্রাচীন ইতিহাস আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভবিষ্যৎ অবতার গ্রহণের মধ্যে উল্লিখিত আছে যে এক সময়ে তিনি দুর্গম নামে মহাসুরকে বিনাশ করিবেন। দুর্গম অসুরকে বধ করিবার জন্য চণ্ডিকা দেবীর নাম দুর্গাদেবী হইবে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে দুর্গানামের উক্ত ইতিহাস কথা আছে, যথা ঃ—

"তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥" ৪৬

অর্থাৎ সেই সময়ে দুর্গম নামক এক মহাসুরকে আমি বিনাশ করিব। সেই জন্য লোকে আমার দুর্গাদেবী এই বিখ্যাত নাম রাখিবে।

দেবী চণ্ডিকার স্বরূপ জীবের বুদ্ধির অতীত। তিনি দুর্জ্ঞেয়া ও **অগম্যস্বরূপা** বলিয়া তাঁহার একটী নাম দুর্গা।

দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা ।৪।১০ শ্রীশ্রীচণ্ডী।

তিনি জীবের দুর্গতি হরণ করেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তগণ দুর্গতি-হারিনী দুর্গা বলিয়া স্তব করেন। বিপদকালে দুর্গানাম স্মরণ করিলে

আপদ বিপদ সমস্ত কাটিয়া যায়। দুর্গানামের একটী অপূর্ব্ব ক্ষমতা আছে যে, বিপন্ন হইয়া দুর্গানাম জপ করিলে জীবের বিপদ দূরে যায় এবং যখন জীবের বিপদ থাকে না, তখন জীব সুস্থ থাকে, তখনও যদি সুস্থাবস্থায় কেহ দুর্গানাম জপ করে, নামের গুণে তাহার সুবুদ্ধির উদয় হয়।

"দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষ জন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতামতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিনী কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥ ৪।১৬

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

অর্থাৎ, হে দুর্গে! তোমাকে সঙ্কটে স্মরণ করিলে সকল প্রাণীরই সর্ব্বপ্রকারের ভয় তুমি দূর করিয়া থাক। আবার সুস্থ অবস্থায় জীব তোমাকে স্মরণ করিলে তাহাকে তুমি সৎ বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাক। হে দারিদ্র্যহারিনি! হে দুঃখহারিনি! হে ভয়হারিনি! সকলের উপকারের জন্য করুণায়ভরাচিত্ত তোমার ব্যতীত আর কাহার আছে? এই দুর্গামূর্ত্তির ধ্যান নানা প্রকারের আছে। দুর্গাদেবী মহিষাসুর বধ করিবার জন্য প্রথমে অষ্টভূজা হইয়াছিলেন, পরে ভক্ত দেবগণের জন্য দশভূজা, অষ্টাদশভূজা এবং শেষে সহস্রভুজা হইয়াছিলেন। দুর্গাদেবীর এই সমস্ত মূর্ত্তি কয়টীরই পূজা বহুকাল হইতে ভক্তগণ করিয়া আসিতেছেন। অষ্টভূজা দুর্গামূর্ত্তি বিন্ধ্যাচল নিবাসিনী বিন্ধ্যবাসিনী দেবীমূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। দশভূজা দুর্গামূর্ত্তি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অকাল বোধনের সময় শরৎকালে

অর্চ্চনা করিয়াছিলেন এবং তদবধি "শরৎকালে মহাপূজার" মূর্ত্তি এই শারদীয়া দশভূজা দুর্গাদেবী। এই দুর্গামূর্ত্তির পূজা করিয়া প্রতিমার সম্মুখে শুদ্ধ ভাবে ও ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠের ব্যবস্থা আছে। দুর্গামূর্ত্তির সম্মুখে দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিলে চণ্ডিকা দেবী প্রসন্না হন ও উপাসক অভীষ্ট ফল লাভ করে।

আর্য্য ঋষিগণ দুর্গানামের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রভাতকালে উচ্চারণ করিবার জন্য এই শ্লোক রচনা করিয়াছেন ঃ—

"প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা-দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।"

অর্থাৎ, প্রভাতকালে যে জীব প্রতিদিন দুর্গা, দুর্গা নাম উচ্চারণ ও দুর্গা দেবীকে স্মরণ করে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেমন দূরে চলিয়া যায় তাহারও সেই প্রকার দুর্গা নামের গুণে আপদ বিপদ দূরে যায়।

দুর্গা, দুর্গপারা এবং সারা এই তিনটি পরমাত্মার **যৌগিক** নাম।

"দুর্গা দেবীম্ ইত্যাদি শ্রুতেঃ। দুর্ বা দূর্ প্রাণদেবতা। ইঁহার অর্থাৎ এই প্রাণদেবতার প্রসাদে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়। এই জন্য দুর বা প্রাণ দেবতার দ্বারা লভ্য বলিয়া পরমাত্মার নাম দুর্গা।

"সা বা এষা দেবতা দুর্গাম্ দূরং হস্যা মৃত্যুর্দূরং ইবা অস্মানমৃত্যুর্ভবতি"তি শ্রুতেঃ।

দুর্গা, ব্রহ্মময়ী ভগবতীর একটি নাম এবং তিনি সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিনী।

"দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ"। ৫।৬৫

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"রাত্রিসূক্তশ্রুতিঃ" বলিতেছেন—"তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্ দুর্গাং দেবী"মিতি।

যিনি দুর্গা, তিনিই দশমহাবিদ্যা, এবং তিনিই ব্রহ্ম।

গুপ্তার্ণবতন্ত্রে অপরাধ-ভঞ্জন স্তোত্রে আমরা দেখিতে পাই—

"ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্বমসি গিরিসুতা সুন্দরী ভৈরবী ত্বম্
ত্বং দুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসি চ ভুবনা ত্বঞ্চ লক্ষ্মীঃ শিবা ত্বম্।
ধূমা মাতঙ্গী নিত্যা ত্বমসি চ বগলা হিঙ্গুলাখ্যা ত্বমেব
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥"

অর্থাৎ, তুমি কালী, তুমি তারা, তুমি হিমালয় কন্যা, সুন্দরী, ভৈরবী তুমি, তুমি দুর্গা, ছিন্নমস্তা, ভুবনেশ্বরী, শিবা, ধূমাবতী এবং মাতঙ্গী, তুমি নিত্যা, তুমি বগলা, তুমি হিঙ্গুলা, তুমি দশমহাবিদ্যা অতএব হে বিস্তৃতাননে! হে স্বেচ্ছারূপধারিনি! হে ভয়ানকে! আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

দুর্গাদেবীর পাপনাশিনী ও আপদ নিবারিনী শক্তি আমরা পূজার মন্ত্রে দেখিতে পাই। দুর্গা দেবীর পূজায় ঋষ্যাদির ন্যাসের মন্ত্রে আমরা অতি স্পষ্ট দুর্গানামের মাহাত্ম্য দেখিতে পাই।

ঋষ্যাদিন্যাস—অস্য মন্ত্রস্য নারদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ দুরিতাপন্নিবারিনী দুর্গা দেবতা চতুর্ব্বর্গ-ফল-প্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি—নারদ ঋষয়ে নমঃ। মুখে—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—দুরিতাপন্নিবারিন্যৈ দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

তন্ত্রশাস্ত্রে দুর্গামুদ্রা নামে একপ্রকার মুদ্রার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। দুই হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া বাম মুষ্টির উপর দক্ষিণ মুষ্টি

রাখিয়া মস্তকে স্থাপন করিলে দুর্গামুদ্রা হয়। পূজাকালে এই প্রকারের মুদ্রা অবলম্বন করিলে মন্ত্রদেবতাগণ আনন্দিত হন। সকল দেবতার মুদ অর্থাৎ আনন্দ বর্দ্ধন এবং পাপ সমূহের দ্রাবন অর্থাৎ অপসারণ করে বলিয়া প্রাচীন মুনিগণ মুদ্রা এইরূপ নাম করিয়াছেন।

তন্ত্রসারে দুর্গার শতনামস্তবে আমরা দেবীর সপ্তম নাম দুর্গা দেখিতে পাই। সেই স্তবে নিখিল বলশালীর দুর্গমা বলিয়া মায়ের নাম দুর্গা হইয়াছে।

শ্রীমৎ দেবীভাগবতের নবম স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ে দুর্গাপূজাবিধির বিশের বিবরণ দেওয়া আছে। সেখানে বর্ণিত হইয়াছে যে—"যাঁহার স্মরণ মাত্রেই ঘোর বিপত্তি সকল ভয়ে পলায়ন করে, সেই দুর্গাদেবীকে ভজন না করে এমন কোন ব্যক্তি কোথাও নাই। এই অত্যন্ত অদ্ভুতা শিবা সকলের মাতা এবং সকলেরই উপাস্যা। ইনি অন্তর্য্যামিনীরূপিনী নিখিল বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দুর্গম সঙ্কট নাশ করেন বলিয়া ইনি দুর্গা নামে বিখ্যাতা। সৃষ্টিস্থিতিনাশকারিনী মূলা-প্রকৃতি-রূপা উক্ত ভগবতী দুর্গা, কি শৈব, কি বৈষ্ণব, সকলেরই সর্ব্বদা উপাসনীয়া। ভগবতী দুর্গার স্মরণ মাত্রেই জন্ম সফল হয়। চতুর্দ্দশ মনুই তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া মনুত্ব লাভ করিয়াছেন, দেবগণ তাঁহার উপাসনায় স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

বিশ্বসার তন্ত্রে দুর্গামন্ত্রের মাহাত্ম্যের কথা অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। অন্য কোন দেবতার কথা বলিব না, স্বয়ং মহেশ্বর যে আপন মস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করিয়া গঙ্গাধর হইয়াছেন, তাহা এই দুর্গামন্ত্রের প্রভাবে।

"যস্যা প্রসাদমাত্রেন ভবেৎ গঙ্গাধর স্বয়ং।"

বিশ্বসার তন্ত্র।

উক্ত বিশ্বসারতন্ত্রে শ্রীদুর্গাদেবীর ধ্যান এইরূপ আছে ঃ—

"সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যৈশ্চর্তুর্ভির্ভুজৈঃ
শঙ্খং চক্রধনুঃ শরাংশ্চ দধতীং নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতং।
আমুক্তাঙ্গদহার কঙ্কণরণৎ কাঞ্চীক্বণন্নূপুরা,
দুর্গা দুর্গতিহারিনী ভবতু মে রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা ॥"
বিশ্বসার তন্ত্র।

অর্থাৎ, সিংহোপরি উপবিষ্টা, কপালে অৰ্দ্ধচন্দ্র, মরকতমণির ন্যায় দেহ কান্তি এবং চারিহস্ত, ঐ সকল হস্তে শঙ্খ, চক্র ও ধনুর্ব্বাণ আছে, দেবী নয়নত্রয়ে শোভিতা, মুক্তাহার, বলয়, কঙ্কণ, কাঞ্চীক্বণ ও নূপুরাদি অলঙ্কারে শোভমানা। এই দেবতা সাধকের দুর্গতি হরণ করেন। ইঁহার কর্ণে রত্ন নিৰ্ম্মিত কুণ্ডল আছে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আনন্দলহরীস্তোত্রে এই দুর্গাদেবীকে মহেশ্বরের সহচরী, ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানীদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বর্ণন করিয়াছেন।

"গিরামান্দুর্দ্দেবীং দ্রুহিণগৃহিনীমাগমবিদো,
হরেঃ পত্নীং পদ্মাং হরসহচরীমদ্রিতনয়াম্।
তুরীয়া কাপি ত্বং দুরধিগমনিঃ সীমমহিমা,
মহামায়া বিশ্বং ভ্রময়সি পরং ব্রহ্মমহিষি ॥" ৯৮
আনন্দলহরী

এই দুর্গাদেবীকে অবলম্বন করিয়া দুর্গাগীতা, দুর্গাকবচ এবং

দুর্গাস্তোত্র শাস্ত্রে রচিত হইয়াছে। দুর্গাদেবীকে প্রসন্ন করিয়া অভীষ্টফল লাভ করিতে হইলে, এইগুলি পাঠ করিতে হয়।

কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের ঠিক প্রারম্ভে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে শত্রু পরাজয়ের নিমিত্ত শুচি হইয়া দুর্গাস্তোত্র কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুনও রথ হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। "নমস্তে সিদ্ধসেনানী" প্রভৃতি মন্ত্রে দুর্গাস্তোত্র আরম্ভ করিয়া "ভূতির্ভূতিমতাম্ সংখ্যে বীক্ষ্যসে সিদ্ধচারণৈঃ" পর্য্যন্ত দুর্গাস্তোত্র অর্জ্জুন পাঠ করিলে মানববৎসলা দুর্গাদেবী অর্জ্জুনের ভক্তি দেখিয়া অন্তরীক্ষে আবির্ভূতা ও গোবিন্দের অগ্রে অবস্থিতা হইয়া বলিলেন,—হে "দুর্দ্ধর্ষ নর! নারায়ণ তোমার সহায়, তুমি রণে শত্রুগণের অজেয়, তোমাকে বজ্রধারী স্বয়ং ইন্দ্রও জয় করিতে অসমর্থ!" বরদাত্রী দেবী অর্জ্জুনকে এই প্রকার বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন।

দুর্গাদেবীকেই শাস্ত্রে শ্রীশ্রীচণ্ডী বলা হইয়াছে। সংসারী জীবের দুর্গাদেবীর সহিত বিশেষ পরিচয় থাকা আবশ্যক। গৃহ হইতে যাত্রা করিবার সময় যে দুর্গানাম উচ্চারণ যাত্রার বিঘ্ন এবং অমঙ্গল নাশ করে, অতি ঘোরতর বজ্রাঘাত সহিত মুষলধারে বৃষ্টিপাতের সময় অতি সন্নিকটে ভীষণ বজ্রাঘাত হইলে আর্ত্ত জীবের ভয়-কম্পিত হৃদয়ে যে দুর্গা নাম জপ আপনিই চলিতে থাকে, ঝটিকার সময় অতি চঞ্চল নদীর তরঙ্গে যখন আরোহীগণসমেত নৌকা মগ্ন হইবার উপক্রম করে তখন যে বিপদনাশিনী দুর্গাদেবীর নাম কাতরকণ্ঠে সেই সঙ্কটকালে প্রাণরক্ষার জন্য উচ্চারিত হয়, সেই করুণাময়ী ব্রহ্মস্বরূপিনী দুর্গাদেবীর জয় হউক।

ক্ষমা—"ভক্তানামন্যেষাং বা সর্ব্বানপরাধান্ ক্ষমতে সহতে জননীত্বাৎ, সাতিশয়কারুণ্যবতী ক্ষমেত্যুচ্যতে।"

মহামায়া বিশ্বসৃষ্টি করিয়া বিশ্ববাসী জীবের জননী হইয়াছেন। মাতা যেমন সন্তানের প্রতি স্নেহবশতঃ সন্তানের ইচ্ছাকৃত সকল প্রকারের অপরাধ ক্ষমা করেন, শ্রীশ্রীচণ্ডিকাদেবীও তাঁহার শরণাগত ভক্ত সন্তানগণের এবং অভক্ত অন্যান্য আসুরিক ভাবাপন্ন সন্তানগণের সকল প্রকারের অপরাধ সহ্য করেন, ক্ষমা করেন। "ক্ষমা" শব্দের অর্থ সেই জন্য 'সাতিশয় কারুণ্যবতী'।

শুদ্ধচিত্তে ও নির্ম্মল বুদ্ধিতে ভগবানের প্রেরণা আসে। অনন্তকোটি জীবের মধ্যে অত্যন্ত অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান জীব শুদ্ধচিত্ত ও নির্ম্মলবুদ্ধিসম্পন্ন। সুতরাং অধিকাংশ জীবই ভগবানের মহিমা সম্যকরূপে বুঝিতে পারে না। ভগবানই যে জগৎ-মূর্ত্তিতে এবং চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, জল ও আকাশ প্রভৃতি মূর্ত্তিতে বিরাজিত এ রহস্য অধিকাংশ জীবই বুঝিতে পারে না। সেই জন্য অজ্ঞানতা-বশতঃ সাধারণ জীব, মহাদেবের অষ্ট-মূর্ত্তির মত, ভগবানের এই বিশ্বে প্রকটিত মূর্ত্তিসকলের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম না করিয়া বহুরূপ ও বহু নামধারী ভগবানকে উপেক্ষা ও অমান্য করে। ভগবানের বিশ্বমূর্ত্তির পূজা যথাযোগ্যভাবে তাহারা করে না! অজ্ঞানান্ধ জীব ভগবানের এই সকল ব্যক্ত মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না বলিয়া, সতত অপরাধ করিয়া ফেলে। জগৎকে ব্রহ্মরূপে না দেখিলে ব্রহ্মের পূজা করা হয় না। এই প্রকারে ব্রহ্মকে নিয়ত উপেক্ষা করিয়া অজ্ঞানী জীব কত যে অপরাধ করে তাহার সংখ্যা করা যায় না। **জড় বস্তুতে চৈতন্য দর্শন করিলে এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়।** জড় বস্তুর আধারে চিৎরূপিনী মহামায়া সংসার-খেলা

খেলিতেছেন ইহা দেখিতে শিখিলে আর এই প্রকারের অপরাধ করা হয় না। বিশ্বজগৎ জুড়িয়া এই যে অজ্ঞানান্ধ সাধারণ জীব সকল ভগবানকে ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং অনিচ্ছাপূর্ব্বক উপেক্ষা করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে যে সব দৈব অপরাধ করিতেছে, সেই সকল অপরাধের হিসাব করিয়া যদি বিশ্ববাসীকে দণ্ড লইতে হইত তাহা হইলে কোন জীবেরই আর অস্তিত্ব থাকিত না। এই সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত সংসার একটী প্রকাণ্ড নরকে পরিণত হইত। কিন্তু বিশ্বজননীর অপার করুণায় এবং জীবের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহবশতঃ তিনি সকলের এই সমস্ত ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত অপরাধ সহ্য করেন। সন্তানগণের এই দারুণ কোটী কোটী অপরাধের ফলেও মহামায়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের দণ্ড বিধান করেন না। যে চণ্ডিকাদেবী এই প্রকারের সহনশীলা তিনি করুণাময়ী না হইলে সন্তানগণের এত অপরাধ সহ্য করিতে পারিতেন না। ভক্তগণও অপরাধী। কিন্তু তাহাদের অপরাধ অনিচ্ছাকৃত। ভক্তগণ মহামায়াকে ভালবাসেন, মহামায়ার কৃপা পাইবার জন্য তাঁহার আরাধনা করেন, মহামায়ার দর্শনে মনুষ্যজন্ম সফল হইবে এই ধারণায় সাধনায় লাগিয়া থাকেন, কিন্তু সেই শরণাগত ভক্তগণও দেবীর মহিমার স্বরূপ সম্যক্ প্রকারে জানে না বলিয়াই সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপিনীর যথাযোগ্য পূজা ও সম্মান করিতে পারেন না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পরমাত্মাকে লাভ করা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সতত অপরাধী অবস্থায় থাকি। **ভাবগ্রাহিণী মা** আমাদের, ভক্তগণের সেই অনিচ্ছাকৃত অপরাধসকল গ্রহণ করেন না। পার্থিব মাতা যখন স্নেহবশতঃ আপন দুষ্ট পুত্রের দোষ দেখে না তখন বিশ্ব-জগতের অপার্থিব মাতা সেই চণ্ডিকাদেবী কিরূপে আপন

দুষ্ট সন্তানগণের অপরাধ গ্রহণ করিবেন? কাজেই তাঁহাকে সন্তানের সমস্ত অপরাধ ও অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। পার্থিব মাতার হৃদয়ে কতটুকু স্নেহের ভাণ্ডার আছে? কতটুকু করুণা লইয়া পার্থিব জননী সন্তানকে লালন পালন করেন? মহামায়ার অপার স্নেহ এবং সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত করুণার রাশি, অনন্তকোটী ধারায় এই বিশ্বজগতে বর্ষিত হইয়া সেই ধারার ক্ষুদ্র এক একটী কণা আমাদের পার্থিব মাতার হৃদয়ে আসিয়া পতিত হয়। তাহার ফলে মাতার হৃদয়ে স্নেহ ও করুণা জাগে। যদি ক্ষুদ্র এক কণা স্নেহ ও করুণার ফলে পার্থিব মাতা কুপুত্রকেও ত্যাগ করিতে না পারেন, তবে অনন্তকরুণাময়ী মহামায়া, আমরা কুপুত্র হইলেও আমাদের সকল অপরাধ কেমন করিয়া সহ্য না করিয়া থাকিতে পারেন? জীবের অপরাধ ধরিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মমত বিচার করিলে তাহার অতি গুরুতর দণ্ড বিচারপতি ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু মহামায়া শুধু ন্যায় ও ধর্ম্ম ধরিয়া জীবের অপরাধ সকলের বিচার করেন না। করুণায়ভরা চিত্ত লইয়া তিনি এই বিচার করেন বলিয়া, জীবের বহু অপরাধ তিনি মার্জ্জনা করেন। পার্থিব রাজার বিচারে করুণার এত প্রভাব দেখা যায় না। সেখানে ন্যায়মত বিচার হয়। কিন্তু আমাদের বিচারক যখন শ্রীশ্রীচণ্ডিকাদেবী এবং যখন তিনি আমাদের জননী, সেইজন্য জননী স্নেহে মুগ্ধ হইয়া ও জীবের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা জানিয়া সন্তানগণের বহু অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন। অপরাধ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে মহামায়া তদ্দণ্ডেই অপরাধী জীবকে ক্ষমা করেন। আর যে অভক্ত জীব শত শত অপরাধ করিয়াও মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে না, তাহাদেরও জননী বলিয়া তিনি তাহাদের

মার্জ্জনা করেন। সেই জন্য ভগবান শঙ্করাচার্য্য মহামায়ার স্তবে বলিয়াছেন—

"কুপুত্র জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি।"

সন্তান কর্ম্মদোষে বহু অপরাধে অপরাধী হইয়া 'কুপুত্র' হইলেও, জগজ্জননী, স্নেহময়ী মাতার কার্য্য না করিয়া 'কুমাতার' ন্যায় সন্তানের অপরাধ কখনই গ্রহণ করিতে পারেন না। মা নিত্য স্নেহময়ী, করুণাময়ী ও কল্যাণময়ী।

শিবা—চিৎরূপিনী।

"চিন্মাত্রাশ্রয়মায়ায়া শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমাঃ।
অনুপ্রবিষ্টা যা সংবিন্নির্বিকল্পা স্বয়ম্প্রভা॥
সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিনী।
সা শিবা পরমা দেবী শিবাভিন্না শিবঙ্করী॥"

ইতি সূতসংহিতোক্তিঃ।

আত্মা চিৎবস্তু। আত্মা ব্যতীত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই জড়। ব্রহ্মও চিৎবস্তু। ব্রহ্মস্বরূপিনী ব্রহ্মশক্তি মহামায়া, তিনিও চিৎবস্তু। **আমার আত্মাই আমার চিন্ময়ী মা।**

"আত্মা এবাসি মাতঃ।" গুপ্তার্ণবতন্ত্র।

মা আমার ব্রহ্মময়ী বলিয়া সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপিনী। তিনি জ্ঞানরূপিনী বলিয়া মহামায়ার একটী নাম **শিবা**। চিন্ময় আত্মার ধর্ম্মই এই যে, জড়ের সংস্পর্শে আসিলে জড় বস্তুও চিৎ-স্বরূপ আত্মার সঙ্গগুণে চিৎবস্তুর মত অনুভূত হয়। জগৎটা জড়

ও অনিত্য। কিন্তু চিৎস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু নিত্য। জড়জগতের আধাররূপে সচ্চিদানন্দময়ী মহামায়া থাকেন বলিয়া অনিত্য জগৎকে নিত্য বলিয়া বোধ হয়। যে জ্ঞানের দ্বারা জীব সংসারে আসক্তির বন্ধন ছেদন করিয়া মুক্ত হয়, সেই জ্ঞানের পূর্ণমূর্ত্তি এই দেবী চণ্ডিকা। তিনিই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যরূপিনী।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে" ॥ ৫।১৩

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ" ! ৫।৩৪

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

শিব সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। সুতরাং শিবা, সচ্চিদানন্দময়ী ব্রহ্মশক্তি। সেই জন্য মায়ের একটী নাম শিবমোহিনী, শিবানী বা শিবা।

শিব অর্থে মঙ্গল। সুতরাং শিবা অর্থে মঙ্গলময়ী। মায়ের অপেক্ষা সন্তানের কল্যাণকামনা করে এমন আর কোন ব্যক্তি জগতে আছে? শত অপরাধে অপরাধী সন্তানদেরও তিনি নিয়ত কল্যাণ করিতেছেন। মায়ের স্বভাবই এই প্রকারে সন্তানের কল্যাণ করা। মায়ের কল্যাণকরী শক্তি এতই বিচিত্র যে, মায়ের নামের গুণে জীবের অমঙ্গল দূরে যায় এবং মঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই জন্য মাকে কল্যাণময়ী, সর্ব্বমঙ্গলা, শিবা এই সমস্ত নামে ডাকা হয়।

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে! শিবে! সর্ব্বার্থসাধিকে।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

ধাত্রী—সর্ব্বপ্রপঞ্চ-ধারণ-কর্ত্রী।

মহামায়া ব্রহ্মশক্তি নানা মূর্ত্তিতে সমস্ত দেবতা মানব প্রাণী ও জড় বস্তু সাজিয়া সকলকে ধারণ করিয়া আছেন। দেবী-সূক্তের প্রথম মন্ত্রে পরমাত্মার এই ধারণশক্তির কথা আছে। তিনিই সমস্ত ধরিয়া আছেন।

"ওঁ অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরা—ইত্যাদি।

দেবীসূক্ত।

আমি (পরমাত্মা) রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ এবং বিশ্বদেবগণের স্বরূপে বিচরণ করি, আমি মিত্রাবরণ নামক দেবতাদ্বয় এবং ইন্দ্রাগ্নি নামক দেবতাদ্বয় এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করিয়া আছি।

মা সৎরূপে সমস্ত সৃষ্টি ধারণ করিয়া আছেন। তিনি সমস্ত সৃষ্টির আধার-স্বরূপা।

"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেন যতঃ স্থিতাহসি।" ১১।১। শ্রীশ্রীচণ্ডী।

মা! তুমিই একমাত্র জগতের আশ্রয়, যেহেতু তুমি পৃথিবীরূপে অবস্থিতা।

মা সৃষ্টি ধরিয়া না থাকিলে, সৃষ্টি এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। মা আমাদের সকলকে ধরিয়া আছেন বলিয়া আমরা জীবিত আছি এবং জগতে চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমাদের জন্ম দিয়াছেন বলিয়া তিনি **বিশ্বজননী** হইয়াছেন! আবার জন্মের পর আমাদের পোষণ ও পালন করিতেছেন বলিয়া তিনি **ধাত্রী** হইয়াছেন। আমাদের জাগ্রত অবস্থায় তিনি আমাদের ধরিয়া আছেন। সেইজন্য আমরা

সংসার-খেলা খেলিতে পারি। আমাদের স্বপ্নাবস্থায়ও তিনি ধাত্রীরূপে আমাদের কত বিপদ হইতে রক্ষা করেন। প্রতিদিন নিদ্রার সময়ে তিনি আমাদের ধরিয়া থাকেন বলিয়া, আমরা নিদ্রাভঙ্গে আবার জাগিতে পারি, নিদ্রিত হইয়া একেবারে মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি না। নিদ্রার সময় কে আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে দেহ ও মনকে রক্ষা করেন? মা আমাদের সকল অবস্থায় ও সকল সময় ধাত্রী সাজিয়া আছেন। **আমরা মায়ের নিকট চিরকালই শিশু**। সেইজন্য আমাদের চিরকালের জন্য তিনি ধাত্রী সাজেন। সমস্ত সৃষ্টবস্তুকে রক্ষা করিবার জন্য ও স্থিতি করিবার জন্য, মহামায়া সমস্ত ধরিয়া থাকেন বলিয়া, মা চণ্ডীর একটী নাম ধাত্রী বা জগদ্ধাত্রী।

"এবং স্তুতা সুরৈর্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ।
অর্চ্চিতা **জগতাং ধাত্রী** তথা গন্ধানুলেপনৈঃ॥"
৪।২৯ শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"বিশ্বেশ্বরীং **জগদ্ধাত্রীং** স্থিতি-সংহার-কারিনীম্।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ॥" ১।৭১
শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ **ধাত্র্যৈ** নমো নমঃ।"
৫।১০ শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"বিশ্বাত্মিকা **ধারয়সীতি বিশ্বম্**।" ১১।৩৩ শ্রীশ্রীচণ্ডী।

শ্রুতি বলেন—"**এষ সেতুর্বিধরণে**।"

সমস্ত সৃষ্টির আধার স্বরূপা মহামায়ার এই ধাত্রীমূর্ত্তির জয় হউক। তাঁহাকে নমস্কার।

স্বাহা—দেব-পোষিনী।

দেবতারা অগ্নিমুখে আহার করেন। হোমের সময় যে দেবতার নাম করিয়া 'স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে যাহা কিছু আহুতি দেওয়া হয়, **'স্বাহা মন্ত্রের বলে** সেই দেবতা সেই আহুতি আহার করিতে সমর্থ হন। 'স্বাহা' মন্ত্রযুক্ত না করিয়া যাহা কিছু অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় তাহা দেবতার ভোগে লাগে না, তাহা দেবতা গ্রহণ করেন না। 'স্বাহা' মন্ত্রযুক্ত অগ্নিতে প্রদত্ত হবিঃ দেবতারা আহার করেন এবং তাহাতে দেবতারা পুষ্টিলাভ করেন।

অগ্নি দেবতার স্ত্রীর নাম স্বাহা। স্বাহা অগ্নির শক্তি। সর্ব্বশক্তিময়ী মহামায়ার অগ্নির শক্তিরূপে প্রকাশের নাম স্বাহা। মা স্বাহারূপিনী। স্বাহা মন্ত্রশক্তিতে যখন দেবতারা অগ্নিমুখে হবিঃ আহার করিয়া পুষ্ট হন, তখন স্বাহা দেবীমূর্ত্তিই দেবগণের পোষণকারিনী বা পুষ্টিবিধায়িনী।

'স্বাহা' দেবগণকে হবিঃ দান করিবার মন্ত্র। "স্বাহা দেবহবির্দানে" অমরকোষ।

মহামায়া স্বাহারূপিনী—একথা ভগবান ব্রহ্মা যোগমায়ার স্তবের আদিতে বলিয়াছেন।

ব্রহ্মোবাচ।

"ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারস্বরাত্মিকা"।

১।৭৩। শ্রীশ্রীচণ্ডী।

যজ্ঞে 'স্বাহা' মন্ত্রযুক্ত হবিঃ দেবতাদের উদ্দেশ্যে হোমের অগ্নিতে দেওয়া হইলে দেবতারা বিধিপূর্ব্বক প্রদত্ত উক্ত হবিঃ গ্রহণ করেন, এবং পুষ্টিলাভ করিয়া সন্তুষ্ট হন। দেবতারা হবিদান গ্রহণ করিয়া ভূলোকের উপকার করিবার জন্য মেঘের জলরাশি দান করেন। বৃষ্টির

ফলে জমি শস্যশালিনী হয়। অন্ন হইতে আবার প্রাণিগণের পুষ্টি ও জন্ম হয়। শ্রীগীতায় দেবতা ও মানবের পরস্পর সংবর্দ্ধনার কথা আছে :—

"দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমাবপ্স্যথ ॥"

৩।১১ গীতা

"অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃকর্ম্মসমুদ্ভবঃ।"

৩।১৪ গীতা।

পরাশর বলিয়াছেন :—

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতি সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা।"

অগ্নিতে বিধিপূর্ব্বক (অর্থাৎ স্বাহা মন্ত্রযুক্ত করিয়া) হবিঃ দান করিলে, সেই আহুতি সম্যক্ প্রকারে সূর্য্য লোকে যায়। সূর্য্য হইতে বৃষ্টি জন্মে। বৃষ্টির ফলে অন্ন জন্মে। অন্ন হইতে শুক্র শোণিত মিশ্রণের ফলে প্রজা (বা জীব) জন্মে।

দেবগণ স্বর্গলোকবাসী হইয়াও ভূলোক প্রদত্ত হবিঃ কিরূপে আহার করিতে পারেন? কাহার শক্তিতে হোমের আহুতি ভূলোক হইতে দেবলোকের দেবতাদের নিকট পৌঁছায়? কি শক্তিবলে দেবগণ মানবের হবিদান গ্রহণ করিতে পারেন? স্বাহা-মন্ত্র-শক্তির বলেই দেবগণ ভূলোকের হবিঃ আহার করিতে পারেন। "স্বাহা" মন্ত্রের এত

আশ্চর্য্য শক্তি কোথা হইতে আসিল? সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা মহামায়া স্বাহারূপিনী বলিয়া স্বাহা মন্ত্রের এত শক্তি। 'স্বাহা' মন্ত্র দ্বারা ভূলোকের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। দেবতাগণ হবি আহার করিয়া প্রত্যুপকার করিবার জন্য বৃষ্টির ব্যবস্থা করেন। দেবগণ হবি আহার করিতে না পাইলে, অনাবৃষ্টি করেন, মানবের ক্ষতি করেন। মা স্বাহা মন্ত্র-রূপিনী।

"যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি।

৪।৮ শ্রীশ্রীচণ্ডী

অর্থাৎ, হে দেবি! সমস্ত দেবগণ সর্ব্ববিধ যজ্ঞে যাঁহার উচ্চারণে তৃপ্তিলাভ করেন—**তুমিই সেই স্বাহা মন্ত্র**।

দেবপোষিনী স্বাহা-মন্ত্র-রূপিনী মহামায়াকে নমস্কার।

স্বধা—পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে কোন কিছু দান করিবার মন্ত্র।

'স্বধা' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তিল, জল পিণ্ড প্রভৃতি যাহা কিছু অর্পণ করা যায় সে সমস্ত দ্রব্য পিতৃগণ গ্রহণ করেন ও তাহার ফলে তুষ্ট হন। সুতরাং স্বধা পিতৃপোষিনী।

পিতৃদেয় অন্নকেও স্বধা বলে।

"স্বধা বৈ পিতৃণামন্নম্' শ্রুতি।

ভগবান্ ব্রহ্মা মধুকৈটভবধের জন্য যোগমায়ার স্তবে তাঁহাকে স্বধারূপিনী বলিয়াছেন ঃ—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা— ১।৭৩ শ্রীশ্রীচণ্ডী।

স্বাহাঽসি বৈ **পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-**
রুচ্চার্য্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ ॥" ৪।৮
শ্রীশ্রীচণ্ডী।

অর্থাৎ—পিতৃগণের তৃপ্তি হেতু বলিয়া লোকে তোমাকেই হে দেবি! **স্বধা মন্ত্ররূপে** উচ্চারণ করিয়া থাকে।

দেবযজ্ঞের মন্ত্র যেমন স্বাহা, **পিতৃযজ্ঞের মন্ত্র সেইরূপ স্বধা**। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে এই স্বাহা স্বধা মন্ত্রের প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

ভূলোকে 'স্বধা' মন্ত্রযুক্ত দ্রব্য ভুবলোকের পিতৃগণ-উদ্দেশে অর্পিত হইলে, পিতৃগণ সেই সমস্ত দ্রব্য যথাবিধি পাইয়া থাকেন। স্বধা মন্ত্রের শক্তিতে পিতৃগণের পক্ষে ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করা সম্ভব হয়। মা চণ্ডী স্বধামন্ত্ররূপিনী হইয়া পিতৃগণের আহার যোগাইয়া পিতৃগণকে পোষণ ও তোষণ করেন। স্বধা মন্ত্র ভূলোকের সহিত ভুবলোকের সম্বন্ধ স্থাপন করে। মহামায়ার এই অদ্ভুত স্বধামূর্ত্তিকে নমস্কার।

নমোঽস্তুতে—তোমাকে নমস্কার।

মহামায়া! তোমার এত আশ্চর্য্য গুণ, এত অপূর্ব্ব মহিমা, এত অদ্ভুত করুণা, যে, তোমার পরিচর্য্যা করিবার ইচ্ছা হইলেও আমরা তোমার কাছে যাইতে পারি না, তোমাকে লাভ করিতে পারি না। তুমি দুর্গম তত্ত্ব।

মা চণ্ডি! তুমিই ব্রহ্ম। তোমাকে আমার বিষয়-মলিন মন ধ্যান করিয়া পায় না, তুমি বাক্য ও মনের অতীত, নিত্য বস্তু। "যতো বাচঃ নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ' শ্রুতি। তুমি অচিন্ত্যরূপিনী। যখন গুরুমুখে ও শাস্ত্রবচনে শুনিতে পাই—মহামায়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব ও

ব্রহ্মস্বরূপিনী এবং মহামায়াকে দর্শন করিলে ত্রিতাপের জ্বালা নিবারিত হয়, তখন মনে প্রবল সাধ হয় যে, দেবী চণ্ডিকাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাঁহার পূজা, সেবা ও পরিচর্য্যা করিয়া জীবন ধন্য করিব। কিন্তু বদ্ধ জীব আমি, আর, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব তুমি দেবী চণ্ডিকা! আমার সামর্থ্য নাই যে, আমার আশানুরূপ পরিচর্য্যার দ্বারা আমি জগন্মাতাকে সন্তুষ্ট করিব। মাকে যদি আমি ধ্যানে উপলব্ধি করিতে না পারিলাম, তবে আমি সেবা দ্বারা কেমন করিয়া তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিতে পারিব? আমার হৃদয়-মন্দিরে যদি আমি কখনও মাকে ধ্যান-ধারণায় আনিতে না পারি, যদি আমার দেহমন্দিরে আত্মারূপিনী মায়ের চিন্ময় বিগ্রহ আমি দেখিতে না পাইলাম, তবে আমি মাকে মনে করিয়া কাহার সেবা করিয়া আপন প্রাণ শীতল করিব? আমার দেহমন্দিরে মা চিন্ময়ীরূপে বিরাজ করিতেছেন; অথচ আমি সেই মায়ের কোন পূজা, কিম্বা কোন সেবা করি না; সেই মায়ের কোন মহিমা গান কখন করি না; সেই মাকে নিত্যারূপে কখন অনুভব করিতে পারি না। যখন মায়ের কোন সেবার অধিকারী হইতে আমার সামর্থ্য হইল না, তখন তাঁহাকে উদ্দেশে প্রণাম করা ছাড়া আমার আর কোন পথ নাই, কোন গতি নাই, কোন উপায় নাই। মা চণ্ডি! তোমার যথাযোগ্য পূজা বা সেবা করিবার শক্তি আমার নাই। তোমার তত্ত্ব বুঝিবার বুদ্ধি আমার নাই; শুধু তোমার 'জয়ন্তী', 'মঙ্গলা', 'কালী', 'ভদ্রকালী', 'কপালিনী', 'দুর্গা', 'শিবা', 'ক্ষমা', 'ধাত্রী', 'স্বাহা', 'স্বধা'—নামগুলি উচ্চারণ করিয়া তোমাকে বার বার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম যেন করিতে পারি! মা! আমাদের এই উদ্দেশ্যে-কৃত প্রণাম গ্রহণ কর। আমাদের প্রতি প্রসন্না হও। আমাদের কল্যাণ হউক!

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারিযুগে সমানভাবে স্নেহশীলা ও করুণাময়ী-রূপে বর্ত্তমানা নিত্যা মা! তোমার অতি প্রিয়ভক্ত মার্কণ্ডেয় ঋষির উপদেশমত যেন তাঁহার স্বরে স্বর মিলাইয়া তোমার উক্ত প্রসিদ্ধ প্রণাম-মন্ত্র বলিতে পারি ও তোমাকে যথার্থ প্রণাম করিতেছি—ইহা অনুভব করিতে পারি। মা চণ্ডি! প্রণত সন্তানদের প্রতি প্রসন্না হও মা! তোমাকে বার বার নমস্কার।

মন্ত্র।

মধুকৈটভবিধ্বংসি বিধাতৃ-বরদে নমঃ।
রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।

মধু ও কৈটভ নামে দুইটী অসুরের ধ্বংস-কারিনি (দেবি!) ও বিধাতা ব্রহ্মাকে বরদায়িনি! (মা!) তোমাকে নমস্কার। (হে ভগবতি! মহামায়া!) আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশঃ দাও এবং আমার শত্রুসকল নাশ কর।

ব্যাখ্যা।

এই অর্গলা-স্তোত্রের এই মন্ত্র হইতে প্রত্যেক মন্ত্রেরই দুই ভাগ আছে। প্রথম ভাগে মহামায়ার অতি মহতী শক্তির কথা বলিয়া, **ব্রহ্মশক্তি কত বড়** ও কিরূপ বিরাট ও অচিন্ত্য, তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। মন্ত্রের শেষার্দ্ধ ভাগে সর্ব্বশক্তিময়ী ভগবতীর নিকট **ভক্তের বিনীত ও কাতর প্রার্থনার কথা** প্রকাশ করা হইয়াছে। "মধুকৈটভবিধ্বংসি" ও "বিধাতৃ বরদে" কথার দ্বারা মহামায়ার মহিমা

ও পরাক্রমের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে। "রূপং দেহি" প্রভৃতি কথাগুলির দ্বারা চারিটী প্রধান প্রার্থনার বিষয় প্রকাশ করা হইয়াছে।

জীব অপূর্ণ, নিত্য নানা অভাবগ্রস্ত। ব্রহ্মশক্তি বা মহামায়া নিত্য পূর্ণ ও বিশ্বজগতের ধন, জন, জ্ঞান, মান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সম্পদের একমাত্র অধীশ্বরী। জীব তাহার সকল প্রকার অভাবের পরিপূরণ করিবার জন্য এই জগদীশ্বরীর আরাধনা করে। মহামায়ার ভাণ্ডার সদা পূর্ণ ও অফুরন্ত। ভক্ত সেই জন্য তাঁহার সেই বিশ্বব্যাপী বিচিত্র ভাণ্ডার হইতে 'রূপ', 'জয়', 'যশঃ' ও 'শত্রুনাশ' প্রার্থনা করিতেছেন। যে ভক্ত ভাগ্যবান্, তিনিই জানিতে পারেন যে ভগবতীর ভাণ্ডার হইতেই জীবের জন্য ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি পার্থিব ভোগের বস্তুসকল মহামায়ার ইচ্ছায় পৃথিবীতে আগমন করে। সুতরাং ভক্ত তাহার ভোগের সাধন জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্ত বস্তুই প্রার্থনা দ্বারা মহামায়ার নিকট হইতে লাভ করেন। মা ইচ্ছা না করিলে কেহ কিছুই ভোগ করিতে পায় না। মা প্রসন্না না হইলে কেহই জগতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে না। ভক্ত সেই জন্য এই অর্গলাস্তোত্রের দ্বারা তাহার **পার্থিব ও অপার্থিব সকল প্রকার অভাবের কথা প্রার্থনার দ্বারা মাকে জানাইয়া ইষ্টসিদ্ধির জন্য মহামায়ার কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন।**

মা ভক্তের সমস্ত কামনা পূর্ণ করিতে পারেন, এই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অর্গলা-স্তোত্রের মন্ত্রগুলির প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিময়ী মার নিকট প্রার্থনা না করিলে জীব সুখ ও শান্তি ভোগের অধিকারী হইতে পারে না,—এই তত্ত্ব এই অপূর্ব্ব স্তোত্রে নিহিত রহিয়াছে। প্রার্থনা দ্বারা জীব সকল সম্পদের অধিকারী হয়। সকাম আরাধনা সাধনার প্রথম স্তর; সকাম হইতে নিষ্কাম সাধনা আইসে।

নিষ্কাম সাধনাই মোক্ষ লাভের কারণ। সকাম সাধনা হইতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিন বর্গ ফল লাভ হয়। নিষ্কাম সাধনা হইতে মোক্ষ লাভ হয়। 'দেহি', 'দেহি', করিয়া চাহিতে শিখাইবার জন্য এই স্তোত্র। **চাওয়ার মধ্যেই পাওয়া আছে। চাহিতে জানিলে পাওয়া যায়। প্রার্থনার সার্থকতা আছে**—এ কথা সকল ধর্ম্মেই সমস্বরে ঘোষণা করে। প্রার্থনায় অহঙ্কার ও অভিমান স্থান পায় না। ভগবান কর্ত্তা আর জীব তাঁহার দাস, অনুগত সন্তান, এই ভাবটা প্রার্থনায় ফুটিয়া উঠে। সুতরাং প্রার্থনায় নিজেকে অকর্ত্তা বোধ হইবার সুযোগ থাকায় প্রার্থনা আমাদের প্রকৃত বন্ধু ও গুরুর কার্য্য করে। জগৎ ও সমস্ত প্রাণী ঈশ্বরের সৃষ্টি। সুতরাং সকল পার্থিব ভোগের বস্তু তাঁহারই সৃষ্ট বলিয়া, তিনি সকলের স্বামী ও অধীশ্বর। জীব যখন জগতে ধন, মান প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-ভোগের বস্তু লইয়া যাঁহার জিনিষ তাঁহাকে না জানাইয়া, তাঁহার নিকট হইতে না চাহিয়া, ভোগ করিতে থাকে, তখন সেই জীবের কার্য্যটী চোরের কার্য্যের মত হয়। সেই জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিবার প্রারম্ভে জীবকে মাতৃমুখী বা পরমাত্মাভিমুখী হইতে উপদেশ করা হইতেছে। জগতের লোকের নিকট হইতে কোন বস্তু ভিক্ষা না করিয়া রাজ-রাজেশ্বরীর দরবারে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া মায়ের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সকল অভাব পূর্ণ করিবার জন্য ভক্তকে এই অর্গলা-স্তোত্র শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। মানুষ মানুষের কতটুকু উপকার করিতে পারে? কতটুকু অভাব পূর্ণ করিতে পারে? বিশ্বজননী ছাড়া আর কেহই ভক্তের আশা মিটাইয়া অভাব পূর্ণ করিতে পারে না। সেই জন্য মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য ভক্ত অর্গলা-স্তোত্র পাঠ করিয়া মহামায়ার কাছে সকল অভাবের কথা জানাইয়া জুড়াইয়া যাইবেন। মাকে সকল

অভিযোগ, সকল আব্দার, সন্তানের মত জানাইতে হইবে। সেই জন্য এই প্রার্থনা—দেবীপূজার এই আয়োজন।

মধুকৈটভবিধ্বংসি—প্রলয়কালে জগৎ সমুদ্রাকার হইলে প্রভু লীলাময় ভগবান বিষ্ণু পালনকার্য্য না থাকায় যখন অনন্তশয্যা আশ্রয় করিয়া যোগনিদ্রায় নিরত ছিলেন তখন ভয়ঙ্কর বিখ্যাত মধু ও কৈটভ নামে অসুরদ্বয় বিষ্ণুকর্ণের মল হইতে জন্মিয়া ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বিষ্ণুর নাভিপদ্মস্থিত সেই প্রভু প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই ভয়ঙ্কর অসুরদ্বয়কে দেখিয়া এবং জনার্দ্দনকে নিদ্রিত দেখিয়া একাগ্রহৃদয়ে হরির জাগরণের নিমিত্ত বিষ্ণুর নয়নস্থিত বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী স্থিতি-সংহারকারিনী অতুলনীয়া তেজপুঞ্জস্বরূপ বিষ্ণুর নিদ্রারূপা সেই ভগবতী যৌগনিদ্রাকে স্তব করিলেন।

"যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জ্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ॥ ১।৬৭
তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ।
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্‌ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ॥ ১।৬৮
স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।
দৃষ্টা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দ্দনম্॥ ১।৬৯
তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ।
বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াম্॥ ১।৭০
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিনীম্।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ॥ ১।৭১

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

ব্রহ্মা ভগবতীর অনেক মহিমার কথা স্তবেতে বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "হে দেবি! সেই তুমি এইরূপ অনির্ব্বচনীয়া অতএব আপন মাহাত্ম্যে পরিতুষ্ট হইয়া এই দুর্দ্দান্ত মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়কে মোহিত কর। আর জগৎস্বামী বিষ্ণুকে শীঘ্র জাগ্রত কর; এবং এই মহা অসুরদ্বয়ের বিনাশের জন্য ভগবান্ বিষ্ণুর মতি বা প্রবৃত্তি দান কর।"

"সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দ্দেবি সংস্তুতা।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ॥ ১।৮৫
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু॥ ১।৮৬
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ" ॥ ১।৮৭
শ্রীশ্রীচণ্ডী।

ভগবান ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে সেই তমোগুণময়ী নিদ্রারূপা দেবী বিষ্ণুর জাগরণের জন্য এবং মধুকৈটভের নিধনের জন্য বিষ্ণুর নেত্র, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষঃদেশ হইতে বাহির হইয়া অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার দৃষ্টিপথে অবস্থিতি করিলেন।

"এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্রবেধসা।
বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ॥ ১।৮৯
নেত্রাস্যনাসিকাবাহু-হৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ।
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ" ॥ ১।৯০
শ্রীশ্রীচণ্ডী।

ভগবান নারায়ণকে উপলক্ষ করিয়া মহামায়া মধুকৈটভ

বধ করিয়াছিলেন। মধুকৈটভ-বধের মূল কারণ মহামায়া এবং নিমিত্ত বা উপলক্ষ কারণ ভগবান বিষ্ণু। ব্রহ্মা তাঁহার স্তবের শেষে ভগবতীর নিকট তিনটী প্রার্থনা করিয়াছিলেন :—

(১) দেবি! মধু ও কৈটভকে মোহপ্রাপ্ত করাও।

(২) জগৎস্বামী বিষ্ণুকে শীঘ্র জাগ্রত কর।

(৩) মধু ও কৈটভ অসুর দুইটীর বিনাশের জন্য ভগবান বিষ্ণুর মতি দান কর।

ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবতী এই তিনটী প্রার্থনাই তাঁহার পূরণ করিয়াছিলেন। **ব্রহ্মা বুঝিয়াছিলেন** যে মহামায়ার কৃপা না হইলে নারায়ণ জাগ্রত হইবেন না এবং মধুকৈটভের মোহবশতঃ বুদ্ধিবিকার ঘটিবে না এবং সর্ব্বোপরি বিষ্ণুর আপন অঙ্গ হইতে জাত সন্তান স্থানীয় মধুকৈটভ অসুরকে বধ করিবার প্রবৃত্তি কখনই হইবে না। সুতরাং মধুকৈটভকে ধ্বংস করিয়া বিপন্ন ও শরণাগত ভগবান ব্রহ্মাকে মধুকৈটভের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার মুলে মহামায়া রহিয়াছেন। **তিনিই ব্রহ্মার কাতর প্রার্থনায় মধুকৈটভ-বধের ইচ্ছা করিলেন** ও তাঁহার ইচ্ছায় মধুকৈটভ বধ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার হাতে না হইয়া ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা সাধিত হইল। ভগবান ব্রহ্মা যেভাবে মধুকৈটভের বধ কামনা করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন মহামায়া ঠিক সেই ভাবেই অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণুকে মধুকৈটভের সঙ্গে যুদ্ধ করাইয়া মধুকৈটভ বধ করিয়া ভক্ত ব্রহ্মার মনের সাধ পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য মহামায়ার একটী নাম মধুকৈটভবিধ্বংসি।

শ্রীশ্রীগীতায় ঠিক এই ভাবের কথা আছে :—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"

অর্থাৎ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন," হে অর্জ্জুন! যাহারা আমাকে যেভাবে ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি সেইভাবেই ভজনা করি।

শ্রীশ্রীগীতা। ৪।১১

এখন, সাধন-রাজ্যে মধু ও কৈটভ শব্দের অর্থ বিচার করা যাউক। **'মধু'** শব্দের অর্থ **'আনন্দ'** বা অহং—বোধরূপ আনন্দ। **'কৈটভ'** শব্দের অর্থ **'বহুত্ব'** বা বহু ভাব—ইচ্ছা বা বহুত্বের বীজ-স্বরূপ সঞ্চিত কর্ম্মবীজসমূহ। নির্ম্মল ব্যাপক চিদাকাশকে 'বিষ্ণুকর্ণ' বলা হইয়াছে। সুতরাং 'বিষ্ণুকর্ণমল' শব্দে সেই চিদাকাশের আবরণস্বরূপ উক্ত দুইটী সংস্কারকে বলা হইয়াছে। এই দুইটী ভীষণ সংস্কার সাধকের সিদ্ধির বিরোধী, সেইজন্য তাহাদের ঘোর অসুর বলা হইয়াছে। মহামায়া আমাদের কর্ম্মের বীজ স্বরূপ মূল সংস্কার বা মধু কৈটভ বধ করেন বলিয়া মায়ের একটী নাম 'মধুকৈটভবিধ্বংসী'। মধুকৈটভ-বধ ব্যাপারকে **ব্রহ্ম-গ্রন্থি-ভেদ** বলে। ব্রহ্মা বা মন যে গ্রন্থিতে আবদ্ধ সেই বহুভাবমূলক আদি-সংস্কাররূপ প্রথম গ্রন্থির উচ্ছেদ করিয়া সাধকের মুক্তি বিধান করেন বলিয়া মাকে 'মধুকৈটভ-বিধ্বংসী' বলা হইয়াছে।

মধুকৈটভ—জীবের কর্ম্মের বীজ। এই বীজ ধ্বংস হইলেই **ব্রহ্ম**-গ্রন্থি-ভেদ হয়। মধুকৈটভ বধকে সাধনা রাজ্যে **সত্য-প্রতিষ্ঠা** রূপেই গ্রহণ করা যায়। সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপা মহামায়া। সেইজন্য মধুকৈটভবধ বা সৎ বা সত্যের প্রতিষ্ঠাই বা দেবীর অস্তিত্বের উপলব্ধিই—সাধনার প্রথম স্তর। মহিষাসুরবধ বা চিৎ বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা—দ্বিতীয় স্তর। **শুম্ভ** বধ বা আনন্দ-প্রতিষ্ঠা বা নিত্য মুক্তভাব—সাধনার শেষ স্তর। **সৎ** ও **চিৎ** বিষয়ে প্রতিষ্ঠা হইলে **আনন্দ**-প্রতিষ্ঠা সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে।

'মধু' ও 'কৈটভ' শব্দের দ্বারা **রাগ** বা অনুরাগ ও **বিদ্বেষকেও** বুঝায়। **রাগ ও দ্বেষই জীবের বন্ধনের কারণ**। এই রাগ ও দ্বেষ নষ্ট হইলেই বাসনার ক্ষয় হয় ও জীবের মুক্তি হয়। শ্রীশ্রীগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই রাগ ও দ্বেষের কথা বহুভাবে বলিয়াছেন। রাগ-দ্বেষ বিমুক্ত হইলেই জীব শান্তির অধিকারী হয়। সাধনার দ্বারা ইষ্ট-দেবতার কৃপায় এই মধুকৈটভবধ সাধন করাই কৈবল্য লাভের কারণ।

যে মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয়কে স্বয়ং ব্রহ্মা ভয় করেন, যে মধু ও কৈটভ সাক্ষাৎ নারায়ণের অঙ্গ অর্থাৎ কর্ণমূল হইতে জন্ম লইবার সৌভাগ্য পাইয়াছে, যে মধু ও কৈটভের সঙ্গে স্বয়ং বিষ্ণুকে বহুকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল এবং যাহাদের যুদ্ধে পরাস্ত করিতে বিষ্ণুও অসমর্থ হইয়াছিলেন, এবং যাহারা মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কৌশলে বঞ্চিত হইয়া স্বেচ্ছায় হত হইয়াছিল, সেই মধু ও কৈটভ অতি দুর্দ্দান্ত অসুর এবং তাহারা পরাক্রমে একমাত্র মহামায়া ছাড়া আর কোন দেবতার কাছে কম নহে। সেই বিখ্যাত মধুকৈটভবধ করায় মহামায়ার সামর্থ্য ও পরাক্রম প্রকাশিত হইতেছে।

বিধাতৃ-বরদেঃ—বিধাতা বা ব্রহ্মাকে বরদান করেন বলিয়া মহামায়ার একটী নাম বিধাতৃ-বরদে।

ব্রহ্মা নিজেই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সৃষ্ট দেবতা, মানব, দানব প্রভৃতিকে ইচ্ছানুরূপ বর দান করেন। ব্রহ্মা অনেক প্রাণীর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাহাদের অনেক বড় বড় বর দিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে মহামায়া বর দিয়াছিলেন বলিয়া ব্রহ্মার প্রার্থনামত মধু-কৈটভ বধ হইয়াছিল। ব্রহ্মাকে বর দিবার সামর্থ্য থাকায় মহামায়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তির কথা ঘোষিত হইতেছে। যে মহামায়া বরদান করিয়া ভগবান

ব্রহ্মার মনের বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন, যিনি এত শক্তিময়ী, তাঁহাকে আশ্রয় করিলে তিনি প্রসন্না হইয়া আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের মনের সমস্ত বাসনা অবলীলাক্রমে পূর্ণ করিতে পারেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উপাস্য দেবতারূপিনি! মা! তোমায় নমস্কার। আমার নমস্কার গ্রহণ কর মা! ব্রহ্মার ন্যায় শরণাগত আমাকে বরদান করিয়া আমার মধ্যে রাগ-দ্বেষরূপী ঘোর মধুকৈটভ অসুরদ্বয়কে বধ করিয়া ব্রহ্মার ন্যায় আমার সকল সংস্কারের অত্যাচারের ভয় হইতে আমায় নির্ভয় করিয়া দাও মা!

রূপং দেহি—

মা! তোমার নিকট চাহিব না তো সন্তানের প্রার্থনা শুনিবার তুমি ছাড়া আর কে আছে মা!

সাধনার সর্ব্বনিম্নস্তরের সাধক হইতে সর্ব্বোচ্চস্তরের সাধক পর্য্যন্ত অধিকারী ভেদে, এই প্রার্থনাগুলির অর্থ বিভিন্ন প্রকার হইবে। যে সাধক যেরূপ অনুভব করিবেন, তিনি সেইরূপ অর্থ গ্রহণ করিবেন।

(১) রূপ—দেহের রূপ বা শোভা বা কান্তি—

মা! আমায় সুন্দর দেহের কান্তি দাও। রোগে দেহের রূপ নষ্ট করে। অতএব মা! রোগ-শূন্য দেহ দাও; আমার স্বাস্থ্য অটুট রাখ। আমার দেহের লাবণ্য, তোমার আরাধনার ফলে, স্নিগ্ধ মধুর জ্যোতিতে আমার অঙ্গে ফুটিয়া উঠুক। আমার দেহে সেই রূপ ছড়াইয়া দাও মা! যে রূপ দেখিলেই তাপিত জীবের চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে ও প্রাণ শান্তিতে ভরিয়া যাইবে। আমার দেহ দেখিলে যেন সকলের মনে ভগবৎ-কথা জাগিয়া উঠে ও তাহার ফলে তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়! আমার দেহে দেব-দেহের ন্যায় সাত্বিক তেজ আশ্রয়

করুক। অবিরত পুণ্য কর্ম্ম করিলে, সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বর চিন্তা করিলে, ভাবে ভগবানের আশ্রিত হইয়া জীবন যাপন করিলে, অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য জগতে ধর্ম্মভাব প্রচার করিলে, সত্ত্বগুণের বিকাশ হইলে, জীবের দেহে যেমন একটা শান্তি মধুর দিব্য কান্তি ফুটিয়া উঠে, মা! আমার দেহে সেই দিব্য রূপ ফুটাইয়া দাও। আমি যেন নীরোগ শরীরে তোমার আরাধনা করিতে পারি! মা! আমার স্থূল বুদ্ধি! সেই জন্য আমি আমার দেহের রূপ চাহিতেছি। মা! প্রার্থনা পূর্ণ কর মা!

(২) **রূপ**—তোমার রূপ। দেহি—দেখিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও। মা! তোমার রূপটী কেমনভাবে জগৎ ভরিয়া আছে, আমায় সেই রূপটি একবার কৃপা করিয়া দেখাও। মা! আমায় বুঝাইয়া দাও যে তুমিই জগতের সকল মূর্ত্তি ধরিয়া আছ। বাহিরের জগতে যখন কোন সুন্দর রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হই, আমায় তখন বুঝিয়ে দাও মা! যে আমার মন তোমারই রূপে মজিয়াছে। সুরূপ ও কুরূপ, দুইই তোমারই। তুমিই সমস্ত নরনারী, নদী পর্ব্বত, মেঘ বিদ্যুৎ, আকাশ সাগর প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্ত্তিতে সাজিয়াছ,—এই সত্য ব্যাপারটী আমায় দেখিয়ে দাও, আমায় বুঝিয়ে দাও! মা! মা!

(৩) **রূপ**—তোমার রূপ-জ্ঞান। দেহি—অভাব পূর্ণ কর।

মা। তোমার রূপ-জ্ঞানের যে অভাব বোধ আমার মধ্যে আছে, সেই অভাব বোধটী মা! আমার! পূর্ণ কর্।

তোমার রূপ কেমন জানি না। জগৎ দেখিয়া তোমাকে দেখা হয় না! তুমি যে-রূপ-সাগর, ইহা আমার জানা নাই। জগতের রূপ—নর-নারীর মূর্ত্তি আমি যে চক্ষে জন্মাবধি দেখিয়া আসিতেছি, আমার সেই সংস্কারে দুষ্ট আমার চক্ষু জগৎ-ভরা তোমার রূপ দেখিয়াও দেখিতে

পায় না। তোমার রূপের সম্বন্ধে কোন ধারণা আমার সংস্কারে নাই। যে জ্ঞানটীর আমার অভাব আছে, তোমার রূপ-জ্ঞানের সেই অভাব বোধটী তুমি পূর্ণ কর মা!

(8) **রূপ**—আমার মনের রূপ।

মা! আমার আর নশ্বর স্থূল দেহের রূপ আমি চাহি না। আমার মনের বা সূক্ষ্ম দেহের রূপ দাও। দেহের শোভা যেমন বসন ভূষণ, **মনেরও শোভা সেইরূপ সরলতা, পবিত্রতা ও উদারতা**. মা! আমায় মনের রূপ-স্বরূপ সরলতা, পবিত্রতা, ও উদারতা দাও। আমার মনকে বালকের ন্যায় সরল, ঋষির ন্যায় পবিত্র ও নির্লিপ্ত, আকাশের ন্যায় উদার কর মা!

রূপ—তোমার স্বরূপ বা পরমাত্মবস্তু।

মা! পরমাত্মাই একমাত্র নিরূপনীয় বস্তু, এবং তাহাই তোমার **স্বরূপ**। আমায় কৃপা করিয়া সেই পরমাত্ম বস্তুকে বুঝিয়ে দাও জানিয়ে দাও ও দেখিয়ে দাও। **জগতে** সমস্ত রূপের অন্তরালে যে অধিষ্ঠান চৈতন্য আছেন এবং প্রতি জীবের **অন্তরে** আত্মারূপী যে চৈতন্য আছেন, মা! আমায় তোমার সেই স্বরূপটী দেখিয়ে দাও। যে তুমি **স্বরূপে নির্গুণ, বিশ্বরূপে সগুণ, ব্যষ্টিরূপে আত্মা ও যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের প্রয়োজনে অবতার**—তোমার সেই বিচিত্র ও দৈবস্বরূপিনী রূপ আমায় বুঝিয়ে দাও মা! আমার জীবাত্মাকে তোমার পরমাত্মার স্বরূপে আবরণ করিয়া আমায় তোমার পরমাত্মস্বরূপে স্থিতি কর। মা! আমার **আমিকে** তোমার **তুমির-স্বরূপ** দেখাইয়া আমাকে তুমিময় করিয়া দাও মা! আমার 'অহং' জ্ঞান ভুলাইয়া দিয়া তোমার স্বরূপের জ্ঞান **তত্ত্বমসি,** আমার মধ্যে জাগাইয়া দাও। আমার বহুত্বের জ্ঞান, সৃষ্টিবৈচিত্র্যের নানাত্ব যেন

আমার হৃদয় হইতে চলিয়া যায় এবং তাহার স্থলে এক অদ্বৈত তত্ত্ব যেন জাগিয়া উঠে। মা! আমায় তোমার স্বরূপে বিশ্রাম করিতে দাও মা! আমার প্রাণকে তোমার স্বরূপের দর্শনে পরম শান্তিতে ও পূর্ণানন্দরস-সমুদ্রে ডুবাইয়া দাও মা! মহামায়া!

জয়ং দেহি—মা! আমায় জয় দাও। সংসারে সকল কর্ম্মে যেন জয়লাভ করিতে পারি, এই আমার প্রার্থনা। জগতে যে সমস্ত পুণ্যজনক পরোপকাররূপ কর্ম্ম করিতে আমি উদ্যোগী হইব, মা! সেই সকল কর্ম্ম যেন ঠিকভাবে আমি করিতে পারি; আমার সকল কর্ম্ম যেন আপনার প্রসাদে জয়যুক্ত হয়। জগতে নিজের প্রতিষ্ঠা ও অভ্যুদয়ের জন্য এবং সংসারে সকলের প্রতি কর্ত্তব্য হিসাবে যে সকল কর্ম্মে আমি নিযুক্ত হইব, মা! আমার সেই সকল কর্ম্ম সফল ও জয়যুক্ত কর। আমার কোন কর্ম্ম যেন বিফল না হয় মা! আদর্শ গৃহীর মত যেন আমার কর্ম্মক্ষেত্রে কখন পরাজয় না হয় মা! যেন আমার সর্ব্বত্র জয়লাভ হয় মা! এই ব্যবস্থা কর দেবি!

সাধকের প্রার্থনা অন্যরূপ। সাধক বহির্জগতে অভ্যুদয় বা জয়লাভ-কামনায় মহামায়ার আরাধনা করিবে না। অন্তর্জগতে জয়লাভ তাহার প্রার্থনার বিষয়। সেইজন্য সাধক যখন 'জয়ং দেহি' শব্দে মার নিকট প্রার্থনা করে, তখন সে মায়ের কাছে এই চায় যে, আমার ইন্দ্রিয়সকল ও আমার মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার প্রভৃতি দমন ও সংযম চেষ্টায় যেন আমি জয়ী হইতে পারি। সাধক চিত্তশুদ্ধি সাধনায় জয়ী হইতে চায়। মনকে বশীভূত করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াও সাধক দেখে যে মনকে আয়ত্তে আনা যায় না। তখন সে মনকে জয় করিবার জন্য দৈবী সাহায্য চায়। তাই সাধক নিজের পুরুষকারের শক্তি ব্যর্থ দেখিয়া মায়ের কাছে প্রার্থনা করে যে, মা আমি নিজের চেষ্টায় অনেকদিন

অনেক কিছু সাধনা করিয়া দেখিয়াছি—যে মনকে জয় করিতে পারি নাই। ইন্দ্রিয়-জয়ী হইতে পারি নাই; অথচ মনকে বশীভূত না করিতে পারিলে সাধনার চরম ফল, আত্মদর্শনলাভ সম্ভব নহে; সেই জন্য চিত্ত-জয়ের সকল চেষ্টায় যেন জয়ী হইতে পারি মা! আমি জগতজয়ী হইতে চাই না, আমি আমার মনকে জয় করিতে চাহি। মা! আমার মনকে যেন আমি জয় করিতে পারি মা! আমার অন্তর্জগতে আমার জয় বিধান কর মা! তুমি প্রসন্ন না হইলে ও তোমার অনুগ্রহ না পাইলে আমি কখনই জয়লাভ করিতে পারিব না। মা! আমার প্রার্থিত জয় দাও মা! তবেই আমার জীবন সার্থক হইবে মা! আমার ইন্দ্রিয়ের ও মনের দাস হইয়াই যদি জীবন কাটাই, তবে এই জীবনের দাম কি? মা! আমায় মন-জয়ী কর মা!'

সাধক আরও উচ্চস্তরে উঠিয়া প্রার্থনা করে মা! আমায় জয় দাও—পরমাত্মার স্বরূপিনী! জয়রূপিনী মা! আমায় তোমার করিয়া লও মা! তুমিই আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হও মা!

'জয়ত্যনেন পরমাত্মনঃ স্বরূপমিতি জয়েন বেদস্মৃতিরাশি স্ততো জয়মুদীরয়েৎ ইত্যত্র প্রসিদ্ধস্তং দেহি।"

বেদ স্মৃতি প্রভৃতি সৎ শাস্ত্রকে 'জয়' বলে। সেইজন্য 'জয়' উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে বা শাস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া দেবতাগণকে প্রণাম করিতে হয়। সেই জয় বা শাস্ত্রই মহামায়া। তিনিই জয়স্বরূপা। যে বেদ তাঁহার নিশ্বাস হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, সেই বেদ ব্রহ্মেরই রূপ। আবার **"বিদ্যা সমস্তাঃ তব দেবি ভেদাঃ"** —চৌষট্টিকলা-বিদ্যারূপিনী মা! শাস্ত্ররূপিনী ও শাস্ত্রজ্ঞানরূপিনী বলিয়া ব্রহ্মময়ীকে জয়স্বরূপ বলা হইয়াছে। মা! জয় দাও। শাস্ত্রজ্ঞান দাও। শাস্ত্ররূপিনি তুমি মা! আমার হও। আমি যেন ইচ্ছা মাত্রেই

তোমাকে অন্তরে ও বাহিরে দেখিতে পাই।—ভক্তেরই ভগবান। মা! তুমিও আমার ভক্তিতে আমার নিকট প্রকট হও মা!

সাধক আরও প্রার্থনা করে যে, মা! তুমি সত্য-স্বরূপিনী। আমায় জয় বা সত্য দাও। সত্যই যেন আমার অবলম্বন হয়। সত্যতেই যেন আমার স্থিতি হয়। ঋত ও সত্য আমায় দাও মা! 'জয়' শব্দের অর্থ 'সত্য'। বেদ বলেন—

"**সত্যমেব জয়তে** নানৃতম্।"

সত্যই জয়যুক্ত হয় মিথ্যার জয় হয় না।

যশো দেহি—আমায় যশঃ দাও মা! "সহ নৌ যশঃ" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান—সম্পাদন জন্য যশঃ দাও। তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী বলিয়া যে যশ, সেই যশঃ আমায় দাও মা!

এ জগতে যতদিন বাঁচিব ততদিন আমায় এমন পুণ্য কর্ম্মসকল করিবার অবসর ও সুযোগ দাও মা! যাহাতে আমার সৎকর্ম্মের যশঃ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। আমার এই দেহ দ্বারা কখন যেন পাপকার্য্য-অনুষ্ঠান না হয়। আমি এমন পুণ্যাত্মা বলিয়া যেন গণ্য হই যাহাতে আমায় লোকে আদর্শ মনুষ্য বলিয়া সম্মান করে। সমাজে লোকনিন্দিত কর্ম্ম অথবা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কর্ম্ম কখনও জীবনে না করি আমায় এমন শক্তি দাও মা। আমার জীবন এত পবিত্র হউক এবং আমার কীর্ত্তিসকল এত উজ্জ্বল হউক যাহাতে কোন মন্দ কর্ম্মের দ্বারা আমার অকীর্ত্তি ও অযশঃ প্রচার হইবার পূর্ব্বেই যেন আমার মৃত্যু হয়। যশস্বী জীবনের কি মূল্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

"সম্ভাবিতস্য-চাকীর্ত্তি মরণাততিরিচ্যতে"

বিষাদগ্রস্ত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্মপালন করিতে বা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়া বলিতেছেন যে মহাবীর

অর্জ্জুনের মত সম্ভাবিত বা মানী ব্যক্তির যুদ্ধকর্ম্ম হইতে বিরত হইলে জগতে অর্জ্জুনের যে অকীর্ত্তি বা অযশঃ বা নিন্দা প্রচারিত হইবে তাহা যশস্বী অর্জ্জুনের পক্ষে ভীষণ মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষা ক্লেশকর হইবে।

যশকে শাস্ত্রে শুভ্রবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার কারণ যশঃ নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মত অথবা দুগ্ধের মত শুভ্রবর্ণ। মনুষ্যজীবনে প্রচুর যশঃলাভ করা যাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে সেই ভাগ্যবান্। মহাভারতের নলরাজার চরিত্র অথবা যুধিষ্ঠিরের চরিত্র এত সুন্দর ও সুমহান, তাঁহাদের কীর্ত্তি ও যশঃ এত প্রবলভাবে মানবচিত্তকে আকর্ষণ করে যে তাঁহাদের যশের দ্বারা সমুদ্ভাসিত পুণ্যময় নাম সমাজে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মময় ও পুণ্যময় জীবন যাপনে তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া, প্রভাতে তাঁহাদের নাম করিলে আমাদের মত লোকের দিন ভাল যাইবে; সেই জন্য ধর্ম্মাচার্য্যগণ নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে এই শ্লোক পাঠ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন যথা "পুণ্যশ্লোকঃ নলো রাজা পুণ্যশ্লোকঃ যুধিষ্ঠিরঃ"।

মা, আমায় এমন সমস্ত পুণ্যকর্ম্ম করাও যাহাতে আমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে জীবের মুক্তি লাভ হয় এ কথা সনাতন সত্য কথা জানিয়া আমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার বাসনা হইয়াছে। এই বয়সে বা জীবনের এই মুহূর্ত্তে যেরূপ সাধন ভজন করিলে বা ঈশ্বরচিন্তায় সময় কাটাইলে আমার তত্ত্বজ্ঞান লাভের সুবিধা হইতে পারে, আমার বুদ্ধিকে সেইরূপ ভাবে তুমি চালিত করো মা। ভক্তশ্রেষ্ঠ হওয়ার যে যশঃ সেই যশঃ আমায় দাও মা। ভক্তবীর তুলসীদাস বা বা বিল্বমঙ্গল, সাধক রামপ্রসাদ বা রামকৃষ্ণ পরমহংস, ইঁহাদের যে অক্ষয় যশঃ জগতে প্রচার হইয়াছে সেইরূপ যশে আমায় যশস্বী করো মা। আমি এরূপভাবে মা, তোমার তত্ত্ব যেন ধারণা করিতে পারি

যাহাতে আমার তপস্যা ও পবিত্র চরিত্র দেখিয়া 'আমি মহামায়ার সন্তান' এই কথা বা এই যশঃ এই লোকে প্রচারিত হয়।

মা আমি তোমার সন্তান বা অমৃতের পুত্র—এই যশঃ দাও মা! আমায় এমন যশঃ দাও যাহাতে মৃত্যুর পর যখন আমি তোমার কৃপায় সর্ব্বোচ্চ গতি লাভ করিবার জন্য ভূঃ ভূর্বঃ স্বঃ প্রভৃতি ভেদ করিতে করিতে উচ্চ, উচ্চতর লোকে গমন করিব তখন যেন শুনি সেই সেই উচ্চলোকবাসীগণ আমার দিব্য বিমানে এই অপূর্ব্ব উচ্চ গতি লক্ষ্য করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যেন বলে যে "এই আত্মা মরজগতে কিছুকাল বাস করিয়া ধর্ম্মের প্রভাবে অমরত্ব লাভ করিয়া যথোপযুক্ত লোকে যাইতেছে; ধন্য ইহার জীবন। সার্থক ইহার মনুষ্যজন্ম।" মা আমার এমন যশঃ দাও যেন তাহা দিগন্তব্যাপী হয়, যেন তাহা ত্রিলোকব্যাপী হয়, যেন তাহা সর্ব্বলোকব্যাপী হয়।

দ্বিষো জহি

মা! আমার শত্রুসকল নাশ করো। সংসারে আমার কার্য্যের হন্তারক যে সব বহিঃশত্রু তাহাদের বিনাশ করো মা। আমি আপন শক্তিপ্রভাবে বহিঃশত্রু সকলকে সম্যক্‌রূপে জয় করিতে পারিতেছি না সেই জন্য মহামায়া, তোমার শক্তি ভিক্ষা করিতেছি, সত্যযুগে দেবতাদের আরাধনায় সন্তুষ্টা হইয়া যেমন তুমি দেবশত্রু মহিষাসুরকে ও শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করিয়াছিলে, আজ আমার কাতর প্রার্থনায় মা, তুমি প্রসন্না হইয়া আমার মঙ্গলের জন্য আমার সংসারের বাহিরের শত্রুসকলকে চূর্ণ করো মা! আমার বাহিরের শত্রুর অত্যাচারে আমি যেমন পীড়িত হইয়াছি আমার অন্তঃশত্রুসকলও অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুসকল বা আমার দুষ্ট প্রবৃত্তিসকল আমাকে তেমনি

প্রতিজন্মে সারাজীবন ধরিয়া পীড়িত লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত করিতেছে। সেই সকল চক্ষুর অগোচর কাম-ক্রোধাদি অন্তঃশত্রুসকলকে তুমি মা কৃপা করিয়া আমার হইয়া নাশ না করিলে আর আমার উপায় নাই। আমার এই শত্রুসকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমি প্রতিমুহূর্ত্তে পরাজিত হইয়া আসিতেছি। মা, তাহারা আমাকে আমার দেবত্ব বা স্বর্গলোক হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, আমায় আনন্দলোক হইতে তাহারা নিরানন্দলোকে দূর করিয়া দিয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি আমার এই প্রবল শত্রুসকলকে পরাজিত করিতে পারিব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মা আমি, মা আনন্দময়ী, তোমার সন্তান হইয়াও মনুষ্যজীবনে দেবত্ব লাভ করিতে পারিব না। সেই জন্য আমার কাতর প্রার্থনা, মা তুমি কৃপা করিয়া আমায় রিপুজয়ী বা ইন্দ্রিয়জয়ী কর।

ইন্দ্রিয়ের রাজা মন। (ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি); যদি আমি মনকে জয় করিতে পারি, তাহা হইলে আমার বিশ্বজগতে কোন শত্রু থাকে না অথবা কোন ভয়ের কারণও থাকে না। মা! আমি বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছি, নানাপ্রকারের শত্রু আমায় চারিদিক হইতে ঘেরিয়াছে। আমার নিজের চেষ্টায়, আমি এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার হইতে পারিতেছি না। আমার জন্মজন্মান্তরের দুষ্টসংস্কার আমায় নানা প্রকার বিভীষিকা দেখাইতেছে। শরণাগতবৎসলে মা! এই তোমার আসিবার সময় হইয়াছে! তুমি তোমার আশ্রিত সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য একবার এস মা, কল্যাণময়ি! 'মা ভৈঃ' শব্দে তোমার আর্ত্ত সন্তানকে অভয় দিয়া সাধনার অন্তরায়-স্বরূপ আমার প্রবল শত্রুসকলকে চূর্ণ কর মা!

মহিষাসুরনির্নাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ—

হে মহিষাসুরনাশিনি ও ভক্তগণের সুখদায়িনি তোমাকে নমস্কার। মা! আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশঃ দাও এবং আমার শত্রু সকল বিনাশ কর।

আলোচনা ঃ—

মহিষাসুর এত প্রবল প্রতাপান্বিত ছিল যে তাহার সহিত যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবতারা সকলে মিলিত হইয়াও জয়ী হইতে পারেন নাই, পরন্তু, মহিষাসুর দেবতাদের স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং ইন্দ্র হইয়াছিল। যে মহিষাসুর দেবতাজয়ী হইয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহাকে যিনি বধ করিয়াছিলেন, তিনি কত শক্তিশালিনী! দেবীর মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য অমরবিজয়ী মহিষাসুরবধ-কর্ত্রী বলিয়া তাঁহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে। মহামায়া দুর্গাদেবীই মহিষাসুরকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আর কোন দেবতাই উক্ত কার্য্য করিতে পারেন নাই। যে মহিষাসুরবধ-কার্য্য দেবতাদের পক্ষেও এক প্রকার অসম্ভব কার্য্য, সেই অসম্ভব কার্য্য বা মহিষাসুরবধ-কার্য্য, মহামায়ার কৃত বলিয়া, মায়ের মহিমার শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে। এত বড় যে মহামায়া তিনি আবার ভক্তগণের সুখদায়িনী। ভক্ত দেবতাদের সুখ ও শান্তি দিবার জন্য তিনি দেবতাদের শত্রু মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। সুতরাং মায়ের মহিষাসুর বধের উদ্দেশ্য মাতৃ-আশ্রিত ভক্ত দেবতাগণের নিরানন্দ প্রাণে আনন্দ ও শান্তি দান করা।

যে মা শক্তিতে সুরাসুরগণমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, এবং যিনি ভক্তগণের অভীষ্টপূরণকারিণী, সেই শক্তিময়ী ও করুণাময়ী মহামায়াকে নমস্কার।

ধূম্রনেত্রবধে দেবি ! ধর্ম্মকামার্থদায়িনি ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৫ ॥

হে ধূম্রলোচন নামক অসুর-বধ-কারিনি ! হে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনা পূরণ-কারিনি ! আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশঃ দাও, আমার শত্রু সকল চূর্ণ কর ।

আলোচনা ঃ—

ধূম্রলোচন নামক অসুরের আকার ভীষণ। তাহার চোখের দিকে তাকাইলেই প্রাণ ভয়ে শুকাইয়া যায়। যে ধূম্রবর্ণ চক্ষুযুক্ত ভীষণ অসুর দেবতাদের পর্য্যন্ত ভয়ের কারণ ছিল, সেই প্রবল অসুরকে মহামায়া কটাক্ষমাত্রে ভস্ম করিয়াছিলেন। মা আমার "ভীষণং ভীষণানাম্" সকল ভয়ের কারণ অপেক্ষাও ভীষণ। ধূম্রলোচন-অসুর-ভস্ম মায়ের একটী মহিমা।

ধর্ম্মকামার্থদায়িনী—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটী জীবের পুরুষার্থ; তাহার মধ্যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—ভোগের মধ্যে গণ্য। জীব ভোগ ও মোক্ষ দুই-ই চায়। কিন্তু সংসারবদ্ধ জীব ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটী বস্তুর জন্য লালায়িত। এই ভোগ ও মোক্ষ সমকালে দান করেন বলিয়া মায়ের একটী নাম ভোগমোক্ষৈকদাত্রী। সুতরাং জীবকে ভোগ দান করেন বলিয়া মহামায়ার মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে ধর্ম্ম, কাম ও অর্থদায়িনী বলা হইয়াছে।

'ধর্ম্ম' অর্থে 'ধর্ম্মভাব' বা 'ধর্ম্মপ্রবৃত্তি'।
'কাম' অর্থে 'কামনা'।
'অর্থ' অর্থে 'ঐশ্বর্য্য' বা 'প্রয়োজন-সিদ্ধি'।

"অহম্ রাষ্ট্রী **সংগমনী বসূনাম্"** (দেবীসূক্ত)

আমি (পরমাত্মা) সকলের ঈশ্বরী। আমিই ধনার্থীকে **ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি** করাই।

রক্তবীজবধে দেবি ! চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৬ ॥

হে রক্তবীজবধকারিনি ! হে চণ্ড ও মুণ্ড অসুরদ্বয় বিনাশ-কারিনি ! মা ! আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশঃ দাও, (আমার) শত্রু সকল বিনাশ কর।

আলোচনা ঃ—

রক্তবীজবধে দেবি !—হে দেবি ! মহামায়া ! তুমি রক্তবীজের মত প্রায়-অবধ্য মহাশক্তিশালী অসুরের বধকর্ত্রী ! **"রক্তং বীজং কারণং** যস্য সঃ রক্তবীজঃ"। এই রক্তবীজ অসুর এমন ভয়ানক যে ইহার শরীর হইতে এক বিন্দু রক্ত পৃথিবীতে পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে রক্তবীজের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও পরাক্রমশালী একটী অসুর উৎপন্ন হয়। সুতরাং **রক্তবীজের রক্ত জড় নহে পরন্তু চৈতন্যময়** এবং যত বিন্দু সেই রক্ত পৃথিবী স্পর্শ করিবে, ততগুলি সংখ্যায় আসল রক্তবীজের মত বলবান রক্তবীজ অসুর উৎপন্ন হইবে। **"রক্তমেব বীজং** যস্য সঃ রক্তবীজ" ইতি যৌগিক সংজ্ঞা।

"যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্রক্তবিন্দবঃ।
তাবন্তঃ পুরুষাঃ জাতাস্তদ্বীর্য্যবলবিক্রমাঃ ॥"

শ্রীশ্রীচণ্ডী ॥ ৮।৪৩।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর অষ্টম অধ্যায়ে রক্তবীজবধপর্ব্বে এই রক্তবীজের বধ যে দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহার বর্ণনা আছে। রক্তবীজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে যখন বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, কৌমারী, বারাহী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি মাতৃশক্তিগণ রক্তবীজকে চক্র, গদা প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল, তখন রক্তবীজের শরীর হইতে যে রক্তসমূহ ভূমিতে পতিত হইল, সেই সমস্ত রক্ত হইতে শত শত অসুর উৎপন্ন হইতে লাগিল। সেই রক্তবীজ অসুরের রক্তসম্ভূত দৈত্যগণে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইল। ইহাতে দেবগণ অতিশয় ভীত হইলেন। দেবী চণ্ডিকা দেবগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া সত্বরা হইয়া মা কালীকে বলিলেন,—"হে চামুণ্ডে! তোমার বদন বিস্তার কর। আমার অস্ত্রাঘাত হইতে জাত রক্তবিন্দুসকল এবং রক্তবিন্দুসম্ভূত অসুরসকল তুমি বেগে মুখের মধ্যে গ্রহণ কর। রক্তবীজের রক্তবিন্দুসম্ভূত অসুরসমূহ ভক্ষণ করিতে করিতে রণে বিচরণ কর, তাহা হইলে দৈত্য রক্তবীজের রক্তক্ষয় হইলে সে বিনষ্ট হইবে। তুমি এইপ্রকারে ভক্ষণ করিতে থাকিলে আর কেহ উৎসাহিত অথবা উৎপন্ন হইবে না।" দেবী কৌষিকী কালিকা দেবীকে এই প্রকার বলিয়া সেই রক্তবীজ মহাসুরকে শূলবিদ্ধ করিলেন, কালীও রক্তবীজের শোণিত মুখের দ্বারা পান করিতে লাগিলেন। রক্তবীজ আহত হওয়ায় তদীয় দেহের যে প্রদেশ হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল, চামুণ্ডা সেই স্থানেই তাহা পান করিতে লাগিলেন। রক্তবীজের রক্ত হইতে কালীর মুখমধ্যে যে সমস্ত অসুর উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগকেও কালী ভক্ষণ করিলেন এবং রক্তবীজেরও রক্ত পান করিতে লাগিলেন। অনন্তর চামুণ্ডা এইরূপে শোণিত পান করিলে দেবী কৌশিকী শূল, বজ্র, বাণ, অগ্নি এবং ঋষ্টি অস্ত্র দ্বারা রক্তবীজকে নিহত করিলেন।

মহাসুর রক্তবীজ শস্ত্রসমূহের দ্বারা আহত হইলে রক্তশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল। দেবগণ রক্তবীজকে নিপতিত দেখিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, মাতৃগণও রক্তপানে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এই রক্তবীজবধবিষয়ক মহামায়ার চরিত—মাহাত্ম্য অতি বিচিত্র।

"বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্ ভবতা মম।
দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং **রক্তবীজবধাশ্রিতম্** ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৯।১

সুতরাং যে রক্তবীজ অসুরকে কোনও দেবতা বধ করিতে পারেন নাই, সেই অপূর্ব্ব শক্তিশালী মহাসুরকে মহামায়া অতি অপূর্ব্ব উপায়ে বধ করিয়া নিজের অপূর্ব্ব মহিমা প্রচার করিয়াছেন।

মহামায়া যখন বিন্দু বিন্দু রক্ত পান করিয়া রক্তময় প্রাণস্বরূপ রক্তবীজ অসুরকে নিঃশেষে রক্তশূন্য করিয়া বধ করিয়াছিলেন, তখন সাধক যদি কাতরভাবে প্রার্থনা করে, তবে মহামায়া এখনও এত দীর্ঘ যুগের পরও রক্তবীজের মত, আমাদের শত শত কামনাকে সমূলে বিনাশ করিয়া আমাদের বাসনার নিঃশেষে ক্ষয় সাধন করিয়া আমাদের সংস্কারের আধার আমাদের অশুদ্ধ মনের নাশ করেন। ইহাই মায়ের রক্তবীজ-বধ-লীলা! এই লীলা সাধকের হৃদয়ে নিত্য হইতেছে। ভাগ্যবান যিনি তিনিই কেবল সেই নিত্য লীলা দেখিতে পান।

চণ্ডমুণ্ড-বিনাশিনি—চণ্ডমুণ্ড অসুরদ্বয়-বধ-কারিনি! মহামায়া! তুমি করালবদনা কালী মূর্ত্তিতে অতি ভীষণ চণ্ড ও মুণ্ড অসুরদ্বয়কে বধ করিয়া জগতে 'চামুণ্ডা' নামে খ্যাত হইয়াছ। মা! তুমি কল্যাণী চণ্ডিকাদেবী। কোপে তোমার সুন্দর বদন মণ্ডল, তোমারই ইচ্ছায় রক্তবর্ণ না হইয়া কাল বর্ণের হইয়াছিল এবং তোমার স্নিগ্ধ মূর্ত্তির ললাট-

ফলক হইতে চণ্ডমুণ্ড বধের জন্য ভীষণা কালী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। "কোপে চ কালী।" মা! তুমি যদি চণ্ডমুণ্ড বধ করিবার জন্য কালী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত না হইতে তাহা হইলে আমরা তোমার সন্তান তোমার সর্ব্বমঙ্গলা চামুণ্ডা মূর্ত্তির সংবাদ জানিতে পারিতাম না। সুতরাং চণ্ডমুণ্ড বধ করিয়া তোমার কালী মূর্ত্তির মহিমা প্রচারিত হইল। তুমিই তোমার কালী মূর্ত্তির নাম 'চামুণ্ডা' দিয়েছিলে মা!

"যস্মাচ্চণ্ড মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি॥"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৭।২৭।

জীবের হৃদয়ে চণ্ড ও মুণ্ড অসুরদের মত দুরন্ত পাপময় প্রবৃত্তি সকল আছে। প্রবৃত্তি ভোগের দ্বারা বরাবরই জীবকে ইন্দ্রিয়ের দাস করিয়া রাখে। আমাদের নিবৃত্তির পথে না যাইলে শান্তি নাই, উদ্ধার নাই, মুক্তি নাই। প্রবৃত্তির দলকে কেমন করিয়া দমন করিয়া নিবৃত্তির পথে যাইব? আমাদের শক্তিতে কুলাইবে না। সেইজন্য মহামায়াকে ডাকিতে হইবে। মা! কালি! তুমি বহুকাল পূর্ব্বে যেমন করিয়া একবার দেবতাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য চণ্ডমুণ্ড বধ করিয়াছিলে, মা! আমার দুষ্ট প্রবৃত্তিদের মা! তুমি কৃপা করিয়া একবার আজ আমার কল্যাণের জন্য, মা কল্যাণি! বধ করিয়া আমায় প্রবৃত্তির দাস হইতে মুক্ত করিয়া তোমার দাস করিয়া নিবৃত্তির পথে আমায় চালাইয়া দাও মা!

নিশুম্ভ-শুম্ভ-নির্নাশি ত্রৈলোক্য-শুভদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ৭

হে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয়নাশিনি! হে ত্রিলোকের শুভ দায়িনি! মা! আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশঃ দাও, (আমার) শত্রু সকল বিনাশ কর।

নিশুম্ভ-শুম্ভ-নির্নাশি!—শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই ভ্রাতা অসুর এত বলশালী হইয়াছিল যে তাহারা পৃথিবীর রাজা হইয়া শেষে স্বর্গের আধিপত্যও ইন্দ্রের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল এবং সমস্ত দেবতাদের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বর্গের ইন্দ্র হইয়া বসিয়াছিল। যে শুম্ভ-নিশুম্ভকে স্বর্গের দেবতা সকল মিলিত হইয়া পরাজিত করিতে পারে নাই, পরন্তু যে অসুরপতির নিকট দেবতাগণ লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইয়াছিল, সেই শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করিয়া মহামায়া দেখাইলেন যে, তিনি সকল দেবতা-ও অসুর অপেক্ষা শক্তিতে বড়। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করিয়া মা কত বড় কাজ করিলেন? স্বর্গ হইতে বিতাড়িত দেবতাগণকে আবার তাহাদের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং বিশ্ববাসীকে দেখাইলেন যে **তিনি একাই আছেন আর কেহ নাই**; নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি সকল **মহামায়ারই বিভূতি** বা অংশ।

যুদ্ধক্ষেত্রে শুম্ভাসুরকে দেবী বলিয়াছিলেন—

"একৈবাহম্ জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।"

"একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপিনী আমিই আছি। আমার দ্বিতীয় কোথায়? এ জগতে আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি বা তত্ত্ব বা সত্ত্বা নাই।" মা যে শুধু অদ্বৈততত্ত্বের কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে শুম্ভাসুরকে দেখাইয়া তত্ত্বটী বুঝাইয়া দিলেন। মা শুম্ভকে বলিলেন যে, "তুমি দেখ, তোমার সম্মুখেই, আমার এই মাতৃগণরূপী ব্রহ্মাণী মাহেশ্বরী বৈষ্ণবী প্রভৃতি বিভূতি সকল, আমার এই অঙ্গেই লীন

হইতেছে। আমা হইতেই এই সব দেবীদের উৎপত্তি আবার আমাতেই ইহাদের লয়।" এই কথা বলিতে বলিতেই মহামায়ার ইচ্ছায়, মাতৃগণ মহামায়ার অঙ্গে লীন হইয়া গেল। শুম্ভ দেখিল যুদ্ধক্ষেত্রে তখন আর কেহ নাই, মা একা দাঁড়াইয়া আছেন। তিনিই একমাত্র সত্তা। তাঁর সমান আর দ্বিতীয় কোন দেবতা নাই। বেদের অদ্বৈত তত্ত্ব, শুম্ভ-বধের পূর্ব্বে, মহামায়া জ্বলন্তভাবে সপ্রমাণ করিলেন। **এই কৃপা মায়ের অপূর্ব্ব চণ্ডী-লীলা।**

ত্রৈলোক্য-শুভদে—স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল বা ভূঃ ভুবঃ স্বঃ তিন লোকের মঙ্গলদায়িনী মা মহামায়া। স্বর্গলোকের মঙ্গল মা মহামায়া অনেকবার করিয়াছেন। যখন যখন দানবেরা প্রবল হইয়া স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিয়া দেবগণকে পরাজিত ও বিপন্ন করিয়াছে, যখন যখন স্বর্গে অসুরগণ আধিপত্য করিয়া দেবগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে, তখন তখন মহামায়া আশ্রিত দেবগণকে রক্ষা করিবার জন্য দেবগণের কাতর প্রার্থনায়, অবতার লীলায় 'দুর্গা' ও 'কালী' প্রভৃতি মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া দেবশত্রুগণকে চূর্ণ করিয়া দেবগণের কার্য্য সিদ্ধ করেন। শান্তিময় ও আনন্দময় স্বর্গরাজ্যে অসুরগণ যখনই কোন বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে, স্বর্গরাজ্যের কল্যাণের জন্য, মহামায়া অসুরদলন করেন। সেইজন্য মহামায়া তাঁহার প্রিয় স্বর্গরাজ্যের ও দেবগণের শুভদায়িনী।

আবার 'স্বাহা' মন্ত্ররূপিনী মা ব্রহ্মশক্তি হোমের অগ্নিতে প্রদত্ত হবি বা আহুতি, দেবগণকে মন্ত্রশক্তি বলে পৌঁছাইয়া তাহাদের পুষ্টি ও তুষ্টি বিধান করেন। 'স্বাহা' অগ্নির শক্তি। স্বাহা মন্ত্রের বলে অগ্নিমুখে দেবগণ হবি আহার করেন। 'স্বাহা' মন্ত্র মহামায়ারই শক্তি। সুতরাং স্বাহা-মন্ত্র-স্বরূপিনী মহামায়া স্বর্গের দেবতাগণকে পুষ্টি দিয়া তাহাদের অশেষ কল্যাণ করেন।

স্বর্গের কত মঙ্গল যে মা করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না !

একবার দেবতাগণের অহঙ্কাররূপ পাপ হইয়াছিল। দেবগণ অসুরগণকে পরাজিত করিয়া এক সময় স্বর্গে বিজয়-উল্লাস করিতেছিল। ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তির অহঙ্কার করিতেছিলেন। ভগবান দেবগণের এই অজ্ঞানতাজনিত গর্ব্ব দেখিয়া তাহাদের দোষ সংশোধন করিবার জন্য, আকাশে এক জ্যোতির্ম্ময় দিব্য পুরুষ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। সমস্ত দেবগণ সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিকে দেখিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সেই পুরুষের বিষয় জানিবার জন্য অগ্নিদেবতাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। অগ্নি তাঁহার কাছে গিয়া বলিলেন,—"হে দেব। আপনি কে?" ভগবান উত্তর করিলেন,—"আমি যে হই, পরে বলিব; আগে তুমি বল, তুমি কে? এবং তোমার শক্তিই বা কি?" অগ্নি বলিলেন,—"আমার নাম অগ্নি। আমি সমস্ত বস্তু দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারি বলিয়া আমার একটী নাম সর্ব্বভুক্। আমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারি। আমার শক্তি অসামান্য।" তখন সেই যক্ষরূপী পুরুষটী বলিলেন,—"অগ্নি, তোমার এত শক্তি! আচ্ছা, আমি একগাছি তৃণ তোমার সম্মুখে রাখিতেছি, তুমি এই তৃণ গাছটীকে দগ্ধ কর দেখি?" অগ্নি তাঁহার সমস্ত দাহিকা শক্তি সেই তৃণগাছটীতে প্রয়োগ করিলেন, তথাপি, সেই তৃণটী দগ্ধ হইল না। তখন অগ্নি লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সেই পুরুষের সংবাদ আর আনা হইল না। ইন্দ্র তখন বায়ুকে পাঠাইলেন। বায়ুও সেই পুরুষের কাছে, অগ্নির, মত, লাঞ্ছিত হইলেন। ভগবানের সম্মুখে, অগ্নি ও বায়ু তাহাদের আপন আপন শক্তি দেখাইতে গিয়া বুঝিলেন যে তাঁহাদের শক্তি

তাহাদের নিজস্ব নহে সেইজন্য সর্ব্বসময় ফলদায়িনী হয় না। যখন অগ্নির পর বায়ুও নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন ইন্দ্র নিজেই সেই পুরুষের সংবাদ জানিবার জন্য আকাশে সেই পুরুষের নিকট আসিতে লাগিল। ইন্দ্র যখন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন দেখিল সেই পুরুষ অন্তর্হিত হইয়াছে। ইন্দ্র তখন হতবুদ্ধি হইয়া মহামায়াকে স্মরণ করিলেন। দেবী মহামায়া হৈমবতী মূর্ত্তিতে ইন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন—"ইন্দ্র! তুমি যে পুরুষের সংবাদ জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ, আমি তোমাকে সেই পুরুষেরই সংবাদ দিবার জন্য আসিয়াছি। সেই পুরুষটীই ব্রহ্ম। আমি তাঁহার শক্তি। ব্রহ্ম ও আমি মহামায়া অভিন্ন। আমি না জানাইয়া দিলে সেই পরম পুরুষের তত্ত্ব কেহই জানিতে পারে না। তোমরা অসুর যুদ্ধে জয়ী হইয়া আনন্দ করিতে করিতে অনেক প্রকারের আপন আপন শক্তির স্পর্দ্ধা করিতেছিলে। ভগবানই আসল কর্ত্তা, তোমরা সৃষ্টপ্রাণী সকলেই যে নিমিত্ত মাত্র, এই সনাতন সত্য কথা তোমরা ভুলিয়া গিয়াছিলে। তোমাদের শিক্ষা দিবার জন্য তিনি ছদ্মবেশে যক্ষের মূর্ত্তি ধরিয়া অগ্নি ও বায়ু দেবতাদের অহঙ্কার চূর্ণ করিলেন। তুমি নিজের অহঙ্কার করিও না। সমস্ত কর্ম্মেরই কর্ত্তা তিনি—একথা যেন আর ভুলিয়া যাইও না। তোমাদের তিনি এত ভালবাসেন যে তোমাদের জ্ঞান দিবার জন্য তিনি এই লীলা করিয়া গেলেন।" ইন্দ্রের দিব্যজ্ঞান জন্মিল।

এই কথা কেনোপনিষদ গ্রন্থে আছে।

এই রকম আরও কতবার কত ভাবে যে ভগবান স্বর্গরাজ্যের মঙ্গল করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আবার মর্ত্তের মঙ্গল তিনি ত সব সময় করিতেছেন। আমরা তাঁহার কল্যাণময় হস্ত হইতে কত যে উপকার পাইতেছি তাহা

এক মুখে বলা যায় না। কত সাধক যে কতভাবে মায়ের করুণা পাইয়া জীবনে ধন্য হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করে? আমাদের পৃথিবীর যখন যখন বিপদ হয়, তখন তখন মা আসেন। মন্দিরে মন্দিরে মায়ের যে পূজা-আরাধনা হয়, ইহার কারণ কি? উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়; মাকে মঙ্গলময়ী বলিয়া আমাদের জানা আছে। মাকে ভক্তি ও বিশ্বাসে প্রসন্না করিতে পারিলেই—আমাদের মঙ্গল হয়। মহামায়া আমাদের যে মঙ্গল করিতে পারেন, তাহা শুনিলে সত্যই হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠে। বারবার জন্ম মৃত্যু হওয়ার অপেক্ষা অমঙ্গল আর নাই; কারণ ইহা মহা দুঃখের। মা যদি আরাধনায় তুষ্ট হন, তবে তিনি আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ করেন, তিনি বরদান করেন। আমাদের প্রার্থনামত তিনি আমাদের ভোগ ও মোক্ষ দান করেন বলিয়া তাঁহাকে ভোগমোক্ষৈকদাত্রী বলা হইয়াছে। মুক্তি পাওয়ার অপেক্ষা মঙ্গল আর কিছুই নাই। জগতবাসীর পুনর্জন্ম-নিবারণরূপ মহা মঙ্গল তিনি দান করেন। এই দেবী এমন কল্যাণময়ী!

"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাম্ ভবতি মুক্তয়ে।" শ্রীশ্রীচণ্ডী।

স্বর্গ ও মর্ত্তলোকের মঙ্গলবিধান করিয়াই তিনি ক্ষান্ত নহেন। 'ভুব' লোকেরও মঙ্গল তিনি করেন। তিনি 'স্বধা' মন্ত্ররূপে প্রকাশিত হইয়া পিতৃলোকের পিণ্ড-তর্পণাদি ভূলোক হইতে ভুবলোকে বহন করিয়া ভুবলোকবাসী পিতৃগণকে তুষ্টিদান করেন।

মন্ত্র।

বন্দিতাঙ্ঘ্রিযুগে দেবি সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনি॥
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ৮॥

হে ব্রহ্মাদিদেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত পদযুগ, হে সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী মা! রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, (আমার) শত্রু সকল বিনাশ কর।

আলোচনা।

মহামায়া! তোমার পাদপদ্ম ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবগণ পূজা করেন। অন্যান্য ক্ষুদ্র দেবতাদের কথা আর কি বলিব? তোমার পাদপদ্ম যিনি বন্দনা করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তিনিই ধন্য হইয়াছেন।

দুর্গামূর্ত্তিতে তোমার আবির্ভাবের সময় সমস্ত দেবতাগণের শরীর হইতে নির্গত তেজের সমষ্টিরূপে যখন্ তুমি প্রকট হইয়াছিলে মা! তখন তোমার শরীরের যে যে অঙ্গ যে যে দেবতার তেজে নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই সেই অঙ্গ সেই সেই দেবতার বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। ব্রহ্মার তেজে মা! তোমার সেই দুর্গা মূর্ত্তির পাদ-পদ্ম দুখানি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ব্রহ্মার বর্ণ রক্তবর্ণ, সেইজন্য মা! ব্রহ্মার তেজে নির্ম্মিত তোমার পা দুখানি রক্তবর্ণ হইল।

"ব্রহ্মনঃ তেজসা পাদৌ।" শ্রীশ্রীচণ্ডী ২।১৬ ॥

সৃষ্টিকর্ত্তা, আদি কবি, লোক-পিতামহ, ব্রহ্মা, মা! তোমার চরণে স্থান লইল। সর্ব্বক্ষণ তোমার পাদপদ্মে থাকিয়া ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব সার্থক লইল। কি উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা তোমার দিব্য অঙ্গের চরণে স্থান হইল। অহরহ তোমায় প্রাণ ভরিয়া বন্দনা করিবে বলিয়া মা! ব্রহ্মা তোমার পাদপদ্ম দুখানি বুকে করিয়া রহিল। ব্রহ্মার তেজ ব্রহ্মময়ীর চরণ হইতে স্ফুরিত হইতে লাগিল।

আর একবার ব্রহ্মা, মধু-কৈটভ নামক অসুরদ্বয়ের ভয়ে ভীত হইয়া নারায়ণের যোগমায়ারূপিনী মা! তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছিল। ব্রহ্মার কাতর স্তবে মা! তুমি প্রসন্না হইয়া ব্রহ্মার অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছিলে। মা! ব্রহ্মা তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া পুরাণে অমর হইয়া গিয়াছে।

বিষ্ণুও তোমার বন্দনা করে। কৃষ্ণ তোমার স্তব করিয়াছিলেন। দেবীভাগবতে কৃষ্ণের স্তবের কথা আছে।

"কৃষ্ণেন সংস্তুতে দেবি।" অর্গলাস্তুতিঃ—শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥"
শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১।৮৪।

ব্রহ্মা যোগমায়া-স্তবে বলিতেছেন—

"মা! যখন তুমি জগৎব্যাপক বিষ্ণুকে, জগৎ-স্রষ্টা আমাকে (ব্রহ্মাকে) ও জগৎসংহারক ঈশানকে (মহেশ্বরকে) শরীর-গ্রহণ করাইয়াছ, তখন অপর কোন্ ব্যক্তি তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে?"

মা! তোমার প্রভাব চিন্তার অতীত। যে বিষ্ণু জগৎ সৃষ্টি, পালন ও প্রলয় করেন, যিনি জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন, সেই বিষ্ণুকেও তুমি যখন নিদ্রাভিভূত করিয়া রাখিয়াছ, তখন তুমি সকল দেবতার পূজনীয়।

"সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ।" শ্রীশ্রীচণ্ডী ১।৮৩।

মা! তুমি জগতের প্রভু বিষ্ণুর চালক। অতএব তাঁহা কর্ত্তৃক বন্দিত।

"প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ ॥
শ্রীশ্রীচণ্ডী ১৮৬।৮৭

মা! জগৎস্বামী বিষ্ণুকে শীঘ্র জাগ্রত কর এবং মধু-কৈটভ নামক এই মহা অসুরদ্বয়ের বিনাশের জন্য ভগবান বিষ্ণুর মতি দান কর।

যোগ-মায়াকে ব্রহ্মা কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন,—মা! তুমি বিষ্ণুর নিদ্রারূপিনী হইয়া বিষ্ণুকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া দিয়াছ, তুমি কৃপা করিয়া বিষ্ণুকে ছাড়, **তুমি না ছাড়িলে বিষ্ণু জাগিবেন না**। শুধু বিষ্ণুকে জাগাইলেই হইবে না মা! আমি (ব্রহ্মা) মধু-কৈটভের ভয়ে ভীত। আমায় 'নির্ভয় করিবার জন্য মা! ভগবান্ **বিষ্ণুর মধু-কৈটভ-বধের প্রবৃত্তি** দাও মা!

যোগমায়া ব্রহ্মার স্তবে প্রসন্না হইয়াছিলেন ও ব্রহ্মাকে অভীষ্ট বর দিলেন এবং বিষ্ণুকে ত্যাগ করিলেন। জগৎপতি জনার্দ্দিন নিদ্রারূপা **মহামায়াকর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া** একার্ণবস্থিত অনন্তশয্যা হইতে উত্থান করিলেন।

"উত্তস্থৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ।
একার্ণবেঽহিশয়নাৎ ততঃ স দদৃশে চ তৌ ॥"
শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১।৯১।

মহামায়া কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া যখন বিষ্ণু ক্রিয়াশীল হইলেন, তখন মহামায়া বিষ্ণুর পূজ্যা। যদি মহামায়া বিষ্ণুকে নিদ্রাচ্ছন্ন করিতে পারেন; আবার ইচ্ছামাত্রেই বিষ্ণুকে নিদ্রামুক্ত করিতে

পারেন; যদি বিষ্ণুর হৃদয়ে মহামায়া মধু-কৈটভ বধের প্রবৃত্তি জাগাইতে পারেন; তবে সেই মহামায়ার শক্তি কত বিচিত্র! এমন মায়ের পাদপদ্ম কে না বন্দনা করিবে?

মহেশ্বর মায়ের পদতলে। শিব মায়ের পাদপদ্ম বুকে ধারণ করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার বন্দনা করিতেছেন।

"হিমাচল-সুতা-নাথ সংস্তুতে পরমেশ্বরি!"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। অর্গলাস্তুতিঃ।

মহামায়া সমস্ত দেব ও মহর্ষিগণের পূজনীয়া।

"তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৪র্থ অধ্যায়।৩

ভগবান অনন্ত দেব (অর্থাৎ বিষ্ণু) ব্রহ্মা এবং হর ও যাঁহার অনুপম প্রভাব ও বলের বর্ণনা করিতে অসমর্থ, তিনিই মহামায়া—আমাদের জগন্মাতা—করুণাময়ী মা!

"যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী।৪।৪

মানবত-সামান্য, বিষ্ণু ও শিব পর্য্যন্তও, মহামায়ার তত্ত্ব জানেন না।

"ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।" ৪।৭

মহামায়াকে বন্দনা করিয়া দেবগণ বহুবার মায়ের প্রসন্নতা ও বর লাভ করিয়াছেন।

"দেব্যুবাচ—

ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে যদস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্
দদাম্যহমতিপ্রীত্যা **স্তবৈরেভিঃ সুপূজিতা** ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী ।৪।৩২

মধুকেটভ-বধের পূর্ব্বে ও মহিষাসুর বধের পর, অভীষ্ট লাভ হেতু দেবগণ মহামায়াকে স্তব বা বন্দনা করিয়াছেন। দেবগণবন্দিত মা আমাদের !

"**স্তুতা সুরৈঃ** পূর্ব্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ ।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী ।৫। ৮১

আরও আশ্চর্য্য এই যে, দেবরাজ ইন্দ্র **প্রতিদিন** এই মহামায়ার পূজা করেন।

"তথা সুরেন্দ্রেন দিনেষু সেবিতা ।" ৫।৮১

মহামায়া ! জগত-পালিনী শক্তি, বা সৃষ্টির কারণ-শক্তি, বা জগত-মোহিনী শক্তি, বা মুক্তি-দায়িনী শক্তি—সকলই তুমি। সুতরাং তুমি বিশ্বপূজ্যা।

"ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাহসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতু ॥ শ্রীশ্রীচণ্ডী ।১১।৫

মহামায়া ব্রহ্মাদি বিশ্বের ঈশ্বরদিগেরও বন্দনীয়া। মা! তোমার বন্দনার ফল এত অদ্ভুত যে, যে সকল ব্যক্তি তোমার প্রতি ভক্তিতে তোমার পাদপদ্মে অবনত হন, তাঁহারা বিশ্বের আশ্রয়দাতা হন।

বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি,
বিশ্বাশ্রয়া যে **ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ** ॥ শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৩৩

এখন দেখা যাক্, মানুষে এই মহামায়ার বন্দনা করিলে কি ফল-লাভ হয়।

সদ্‌গুরুরূপী মেধস্ মুনি মোহাচ্ছন্ন রাজ্যভ্রষ্ট সুরথ রাজাকে দেবী-মাহাত্ম্য শুনাইবার পর বলিতেছেন,—"হে মহারাজ! ব্রহ্মাণ্ড মোহন-কারিনী সেই পরমেশ্বরী মহামায়ারই শরণাপন্ন হও। তিনিই আরাধিতা হইলে মনুষ্যগণকে প্রার্থিত ভোগ, স্বর্গ এবং মুক্তি প্রদান করেন।"

তামুপৈহি মহারাজ **শরণং** পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥
শ্রীশ্রীচণ্ডী।১৩।৫

জগৎগুরু, তন্ত্রবক্তা, মহাদেব-কৃত কীলক-স্তবে চণ্ডীর বন্দনার ফল শঙ্কর নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যে মহামায়ার বন্দনা করিলে সংসারী লোকের মায়ের কৃপায়, ঐশ্বর্য্য সৌভাগ্য, আরোগ্য, শত্রু-নাশ ও মৃত্যুর পর পরম মোক্ষ লাভ হয়, সেই করুণাময়ী দেবীকে হতভাগ্য মানব কেন স্তব দ্বারা বা চণ্ডীপাঠ দ্বারা, প্রসন্না করিয়া, মানব জন্ম সার্থক করে না?

"ঐশ্বর্য্যং তৎ প্রসাদেন সৌভাগ্যারোগ্যমেব চ।
শত্রুহানিঃ পরো মোক্ষঃ স্তূয়তে সা ন কিং জনৈঃ॥
শ্রীশ্রীচণ্ডী। কীলক স্তব।১৪

মন্ত্র।

অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্ব্বশত্রুবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥৯

হে মহামায়া! তোমার রূপ ও চরিত্র আমাদের চিন্তার অতীত! হে (ভক্তগণের) সর্ব্ব প্রকারের শত্রু-বিনাশ কারিনি! মা! (আমায়) রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, (আমার) শত্রু সকল বিনাশ কর।

আলোচনা।

অচিন্ত্য-রূপ-চরিতে—মা! তোমার রূপ প্রকৃতই এরূপ বিচিত্র যে আমরা ধারণায় পর্য্যন্তও আনিতে পারি না। বিশ্বমাঝে যত রূপ আছে, সমস্তই মা তোমারই রূপ! মা! তুমিই বিশ্বমূর্ত্তি। সমস্ত জগৎ দেবীময়। সেইজন্য বিশ্বরূপা তুমি মা! মহামায়া! তোমাকে জগৎ-রূপে ভাবিতে পারি না বলিয়া বিশ্বরূপিনী তোমাকে প্রণাম।

সর্ব্বরূপময়ী দেবী সর্ব্বং দেবীময়ং জগৎ।
অতোঽহং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীম্॥
শ্রীশ্রীচণ্ডী। (মূর্ত্তিরহস্য)

মা! তুমি যে দুর্গা ও কালী মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়াছিলে, তোমার সেই অবতার-লীলা-মূর্ত্তিও সকলের চিন্তার অতীত। যখন তুমি দুর্গা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছিলে, তখন তোমার সেই দিব্য রূপ দেখিয়া দেবতাগণও হতবুদ্ধি হইয়াছিল। দেবতারা পূর্ব্বে এ রকম রূপ দেখে নাই। তখন তোমার সেই দুর্গা-মূর্ত্তিকে দৈত্যপতি মহিষাসুর যেভাবে দর্শন করিয়াছিল, তাহার বর্ণনা দেবীমাহাত্ম্য-গ্রন্থে আছে। নিজ কান্তি দ্বারা ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত, পদ ভরে ভূমি নত, কিরীটে আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, ধনুকের জ্যা শব্দে সমস্ত পাতাল পর্য্যন্ত বিক্ষোভিত এবং ভুজ-সহস্রের দ্বারা দিক সকল সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন—এমন দেবী দুর্গাকে মহিষাসুর দেখিতে পাইল।

"পাদাক্রান্তা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী ২।৩৭।৩৮

মহিষাসুর যে অদ্ভুত দুর্গা মূর্ত্তি দেখিল তাহা মহিষাসুরেরও চিন্তার অতীত। ঠিক এই রকম দুর্গা মূর্ত্তি পূর্ব্বে বিশ্ববাসী দেবতা বা অসুর কেহই দেখে নাই। সুতরাং তোমার দুর্গারূপ মা! সত্যই অচিন্ত্য।

আবার, তোমার কালীমূর্ত্তিও এত বিচিত্র যে বিশ্বজগতে দেবতা, অসুর, ও মানব কেহই ঠিক এই রকম কালীরূপ পূর্ব্বে কোথাও দেখে নাই। সুতরাং কালীমূর্ত্তি অভূতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব বলিয়া চিন্তারও অতীত। একদিকে ভক্ত দেবতাদের শান্তির জন্য বরাভয়-মুদ্রা-ধারণ ও সঙ্গে সঙ্গে বামদিকে অভক্ত অসুরদের ভয় দেখাইবার জন্য খড়্গ ও অসুরের রক্তাক্ত মুণ্ড-ধারণ—এ মূর্ত্তি কেহ ধারণায় আনিতে পারে না।

মা! তোমার চিত্ত করুণায়-ভরা কিন্তু অসুরযুদ্ধে তোমার নিষ্ঠুর হইয়া অসুর-দলন—বাস্তবিক এই ব্যাপারটী ধারণায় আনা যায় না।

"চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতাচ দৃষ্ট্বা"

শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।২২

মহামায়া চিন্তার অতীত বস্তু বলিয়া স্তুতিরূপ বাক্যেরও অগোচর। দেবতাগণ সেইজন্য মহিষাসুর-বধের পর দেবীকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—হে দেবি! তুমি চিন্তার অতীত; আর তোমার অসুর-ক্ষয়-কারী বীর্য্যও অপরিমিত। অধিক কি, দেবাসুরের যুদ্ধক্ষেত্রে যে অত্যদ্ভুত তোমার আচরণ, সেই সকল কি করিয়া বর্ণনা করিব?

"কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।৬

তোমার অবতার-মুর্ত্তিও যেমন জীবের চিন্তার অতীত, তোমার **স্বরূপটী** বা আসল রূপটীও সেইরূপ অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয়। তত্ত্বতঃ তোমাকে সহজে কেহ জানিতে পারে না। যে ভাগ্যবানকে তুমি তোমার স্বরূপটী দেখিয়ে দাও, সেই অনুগৃহীত ভক্ত কৃতার্থ হইয়া যায় ও ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ লাভ করে! মা! তোমার স্বরূপ আমাদের জ্ঞানে ও ধ্যানে আসে না বলিয়া আমার তোমার কাছে শক্তি চাই। তাই আমরা গায়ত্রীতে "বিদ্মহে," "ধীমহি" বলিয়া "প্রচোদয়াৎ" বলি। যখন আমরা উপাসনায় বসিয়া **"বিদ্মহে"** বলি তখন আমরা সাহস করিয়া বলি যে এস আমরা তোমার স্বরূপটী **জানি**। যখন আমরা তারপর "ধীমহি" বলি, তখন তার অর্থ এই যে, "এস আমরা তোমার স্বরূপের **ধ্যান** করি! কিন্তু যখন প্রাণে প্রাণে বুঝি যে তোমায় মা!

আমাদের জ্ঞানে ও ধ্যানে পাওয়া যায় না, তখন আমরা নিরুপায় হইয়া তোমার শরণাপন্ন হই এবং তোমার কাছে শক্তি প্রার্থনা করিয়া বলি **"প্রচোদয়াৎ"** অর্থাৎ আমাদের এই বুদ্ধিকে তোমার জ্ঞানের ও ধ্যানের পথে **প্রেরণ** কর মা! যেন তোমার কৃপায় তোমায় **স্বরূপতঃ** জানিতে পারি।

তোমার রূপ ও তোমার স্বরূপ, আমাদের চিন্তার অতীত বলিয়া আমরা মা! তোমার কৃপা চাই।

"যতঃ বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" শ্রুতিঃ।

ব্রহ্মময়ী মা! তুমি ব্রহ্মেরই মত অবাঙ্‌মানসোগোচর। বাক্য ও মন (চিন্তা) তোমাকে পাইবার চেষ্টায় যাইলে তোমায় না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে। বেদ পর্য্যন্তও তোমার স্বরূপ জানে না। তুমি সেইজন্য অচিন্ত্য-প্রভাব। তোমার চরিত্র এত অদ্ভুত যে আমরা তোমার কার্য্য দেখিয়া মা! হতবুদ্ধি হইয়া যাই। যখন দেবতারা শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচারে পীড়িত ও কাতর হইয়া হিমালয়ে গমন করিয়া মহামায়াকে স্তব করিতে লাগিলেন, তখন তুমি মা! দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া গঙ্গাস্নানের যাত্রী সাজিয়া ছদ্মবেশে দেবতাদের নিকট যাইয়া নিজেই আপন পরিচয় দিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলে—"হে দেবগণ! তোমরা এখানে কাহার স্তব করিতেছ?" এমন সময় সেই পার্ব্বতীর শরীর কোষ হইতে শিবা দেবী উৎপন্না হইয়া উত্তরে বলিলেন—"সমরে নিশুম্ভ কর্ত্তৃক পরাজিত ও শুম্ভ কর্ত্তৃক বিতাড়িত দেবগণ একত্রে মিলিত হইয়া আমারই এই স্তব করিতেছে।"

মহামায়ার এই যে শরণাগত ভক্তের প্রতি অহেতুকী করুণা, এই

যে মধুর আচরণ, এই যে বিচিত্র চরিত্র—ইহা চিন্তারও অতীত। যাহা কেহ কখন ভাবে নাই, মা! তাহাই করিয়া বিশ্ব-জগত-বাসীদের স্তম্ভিত করেন।

"নতেভ্যঃ সর্ব্বদা ভক্ত্যা চাপর্ণে দুরিতাপহে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১০

হে অপর্ণে! হে ভক্তিতে নত জনের সর্ব্বদা পাপ নাশিনি! আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, আমার শত্রু দমন কর।

অপর্ণে—অ (না) পর্ণ (পত্র)। তপস্যাকালে যাঁহার আহার করিতে গলিত পত্রও ছিল না, তিনি অপর্ণা। অথবা, অ না (ভুক্ত)—পর্ণ-পত্র। অভুক্ত হইয়াছে পর্ণ যৎকর্ত্তৃক। পার্ব্বতীর নাম অপর্ণা। মহামায়া দুর্গা যখন দক্ষযজ্ঞে সতীরূপে দেহত্যাগের পর, হিমালয়-কন্যা পার্ব্বতীরূপে লীলা করিয়াছিলেন, সেই সময় শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। অনাহারে একটী বিল্বপত্র পর্য্যন্তও আহার না করিয়া, তিনি পঞ্চতপা করিয়াছিলেন। পর্ণ অর্থাৎ বৃক্ষের পত্র পর্য্যন্তও আহার না করিবার জন্য দেবীর নাম অপর্ণা হইয়াছে। কবি কালিদাস মায়ের 'অপর্ণা' নামের ইতিহাস তাঁহার 'কুমার-সম্ভব' কাব্যে দিয়াছেন।

"স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা
পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাম্
বদন্ত্যপর্ণামিতি তাং পুরাবিদঃ ॥" (কুমার সম্ভব)

'অপর্ণা' নামে তোমায় ডাকিলে মা! তোমার পবিত্র তপস্যাদ্বারা

জ্বলন্তী অগ্নিবর্ণা মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, তাহাতে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত কলুষ দূরে যায়।

"তাং অগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং
কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।" (রাত্রিসূক্ত)

মা! অপর্ণে! যাহারা তোমার ভক্ত হইবার সৌভাগ্য পায়, তাহাদের আর পাপের ভয় থাকে না। পাপ তোমার তপস্যাময়ী মূর্ত্তির সম্মুখে থাকিতে পারে না। মহামায়া! তোমার মূর্ত্তির ত মাহাত্ম্যের কথাই নাই, তোমার নামের এমন গুণ যে তোমার নামে পাপ পলায়ন করে। ভক্ত সাধক রাম-প্রসাদ তাই গানে বলিয়াছেন—

"**কালী নামে** পাপ কোথা?
মাথা নাহি তার মাথা ব্যথা?"

ভক্তের সকল দুরিত বা পাপ তুমি অপহরণ বা দূর কর মা! দেবি! এমনি তোমার পদে নত হইয়া থাকার গুণ!

দেবগণ মহিষাসুর-মর্দ্দিনীকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—মা! উদ্ধত দৈত্যগণ প্রপীড়িত দেবগণ আমরা আজ ভক্তি-বিনম্র শরীরে আপনাকে নমস্কার করিতেছি। তোমার শরণাপন্ন হইলে মা! তৎক্ষণাৎ আমাদের সকল আপদ বিপদ বিনষ্ট হয়। যেখানে তোমার আবির্ভাব সেখানে পাপ-তাপ-আপদ-বিপদ প্রভৃতি অমঙ্গল কেমন করিয়া আসিতে পারে?"

"যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতে
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে।

যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তিনঃ
সর্ব্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ ॥"

শ্রীশ্রীচণ্ডী ।৫।৮২

স্তবদ্ভ্যো ভক্তিপূর্ব্বং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১১॥

হে চণ্ডিকে! তোমাকে ভক্তি পূর্ব্বক যাহারা স্তব করে, তুমি তাহাদের ব্যাধি নাশ কর। মা! আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, (আমার) শত্রু দমন কর।

মহামায়া! যখন তুমি চণ্ডমুণ্ড প্রভৃতি অসুরদের হেলায় নাশ করিয়াছ মা! তখন তুমি আমাদের নানাপ্রকারের ব্যাধিও হেলায় নাশ করিতে পার। স্তবে তুমি সহজে তুষ্টা হও। তুমি স্তবে তুষ্টা হইলেই আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হয়। ব্যাধি নাশ ত সামান্য ব্যাপার।

"রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১১।২৯

দেবীস্তোত্র যত রকম আছে, তাহাদের মধ্যে দেবীমাহাত্ম্যের স্তোত্রগুলি দেবীর বড় প্রিয়। সেই জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করিলে মহামায়া চণ্ডী পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। তাঁহার প্রসন্নতায় সকল ব্যাধি আপদ প্রভৃতি দূরে যায়। দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ সেই জন্য পরম স্বস্ত্যয়ন। মুমূর্ষু ব্যক্তি পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের ফলে মৃত্যুর কবল হইতে ফিরিয়া আসে—এ কথা হিন্দুজাতি আবহমানকাল বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাধিও চণ্ডীপাঠের ফলে দূরে চলিয়া যায়। গ্রহপীড়ার ফলেই হউক, বা অন্য যে কোন

কারণেই হউক, মানব বিষম ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, তাহার শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন হইতেছে এই চণ্ডীপাঠ, যাহার ফলে মহামায়া প্রসন্না হইয়া ব্যাধিনাশ করেন। মহামায়া নিজের শ্রীমুখে এই ব্যাধিনাশের কথা বলিয়াছেন—

"তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।
শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ ॥"
উপসর্গানশেষাংস্ত মহামারী সমুদ্ভবান্।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম ॥
শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১২।৭—৮

ব্যাধি স্বাস্থ্য নষ্ট করে। ব্যাধিতে স্বাস্থ্যসুখ বাধা পায়। ব্যাধিরূপ সুখের বাধা কে দূর করিতে পারে? ব্রহ্মময়ী মা চণ্ডী ব্যাধি দূর করিয়া আরোগ্য দিতে পারেন। কখন? মা তুষ্টা হইলে। কি উপায়ে মায়ের তুষ্টি সহজে করা যায়? দেবী-মাহাত্ম্যের স্তবগুলি দ্বারা। সত্য? নিশ্চয়। বিশ্বাস না হয় দেবীর শ্রীমুখের বাণী শোন—
"দেব্যুবাচ ॥ ১

"এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ।
তস্যাহহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥ ২
শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১২শ অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—(দেবীমাহাত্ম্যের) এই সকল স্তবের দ্বারা যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে নিত্য আমার স্তব করিবে, আমি তাহার সকল প্রকার বাধা নিশ্চয়ই প্রশমিত করিব।

দেবীর বাণী সত্যময়। বিশ্বাসেই ফল মিলিবে।

চণ্ডিকে সততং যুদ্ধে জয়ন্তি পাপনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥

হে চণ্ডিকে! হে যুদ্ধে সতত জয়শালিনি! হে পাপনাশিনি! মা! আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, (আমার) শত্রু-দমন কর।

মহামায়া! তুমি যতবার অবতার-লীলায় দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য দেবশত্রু অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, প্রত্যেকবারই তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছ। তুমি যুদ্ধে কখন কাহারও কর্ত্তৃক পরাজিত হও নাই। সেই জন্য তোমার নাম 'অজিতা', 'অপরাজিতা'। মা! তুমি যাহার পক্ষে যুদ্ধ করিবে, তাহার জয়, অভীষ্টলাভ ও বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা। যে ভাগ্যবান তোমার শরণাগত হইয়া সংসারে অকর্ত্তা সাজিয়া, মা! তোমাকেই আসল কর্ত্তা সাব্যস্ত করিয়া কালযাপন করে, তাহার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সকল প্রকার রিপুর দমনকার্য্য মহামায়া কৃপাপূর্ব্বক করিয়া দেন। সেই মাতৃউপাসক নির্ভয়ে জগতে বাস করে ও মাতৃ-মহিমা প্রচার করে।

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি ॥ ১৩

হে দেবি! সৌভাগ্য ও আরোগ্য দাও। পরম সুখ দাও। (আমায়) রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, (আমার) শত্রু-দমন কর।

সৌভাগ্য ও আরোগ্য—

মহামায়ার কৃপা হইলে জীবের দুর্গতি খণ্ডন হয় এবং সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ হয়। স্বয়ং মহাদেব এই কথা কীলকস্তবে বলিয়াছেন।

"ঐশ্বর্য্যং তৎপ্রসাদেন সৌভাগ্যারোগ্যমেব চ।
শত্রুহানিঃ পরো মোক্ষঃ স্তুয়তে সা ন কিং জনৈঃ ॥ ১৪

দেবীর প্রসাদে সকলই সম্ভব হয়। এই চণ্ডিকাদেবী মহামায়া ব্রহ্মময়ী বলিয়া অঘটনঘটনপটীয়সী। ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গফল-লাভ জীবের পুরুষার্থ। মায়ের প্রসাদে জীবের সকল পুরুষার্থ লাভ হয়। তবুও বুদ্ধিমান লোকে নিজের স্বার্থের জন্যও, কেন চণ্ডীর স্তব করিবে না?

পরং সুখম্—মা! সংসারের সকল সুখ, ভক্ত, তোমার কৃপাতেই পায়। তুমি ভোগ ও মোক্ষ দান কর। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিয়া, ভাগ্যবান যিনি, ইন্দ্রিয়ের সুখের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখ বা প্রকৃত স্থায়ী আনন্দ বা মুক্তি, যখন কাতরভাবে কামনা করেন, এই মহামায়া, সেই পর (বা শ্রেষ্ঠ) সুখ বা মোক্ষ, দান করিয়া তাঁহার মহিমা প্রকাশ করেন।

মহামায়া প্রসন্ন হইলে জীবের পক্ষে কি কি মঙ্গল ঘটনা ঘটে, তাহা দেবতা ও মহর্ষিগণ মায়ের স্তবে বলিয়াছেন। সৌভাগ্য, আরোগ্য ও পরম সুখপ্রাপ্তিত হয়ই, তাহা ছাড়া আরও কত কি অপূর্ব্ব অভীষ্ট বস্তু জীব লাভ করে।

"তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৪।১৫

"সর্ব্বদা বাঞ্ছিতফলদাত্রী তুমি মা! যাঁহাদের প্রতি প্রসন্না হও, তাঁহারাই দেশে পূজিত হন। তাঁহাদের ধন ও যশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। তাঁহাদেরই ধর্ম্মবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। তাঁহাদিগেরই জীবন, পুত্র, পত্নী ও ভৃত্যবর্গসহ উদ্বেগহীন হইয়া সার্থক হয়।"

মহামায়া জীবের দারিদ্র্য দূর করিয়া তাহাকে সৌভাগ্য দেন। তিনি ভিন্ন আর কাহার চিত্ত সকলের উপকারের জন্য স্নেহে আর্দ্র রহিয়াছে?

"দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিনি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥" শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৪।১৭

মা আমাদের পরমানন্দ-স্বরূপা। সেইজন্য দেবতারা মাকে স্তব করিতেছেন—

"সুখায়ৈ সততং নমঃ"। ৫।১০

বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি॥ ১৪

হে দেবি! কল্যাণ-বিধান কর, বিপুল শ্রী বা সম্পদের বিধান কর। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, (আমার) শত্রু-দমন কর।

মহামায়া জীবের অদৃষ্টরূপিনী। ইনিই আবার জীবের কর্ম্মফল-দাতা বা কর্ম্মফল বিভাগকর্ত্তা। জীবকে শুভাশুভ কর্ম্মের ফল দিবার সময় মা ব্রহ্মময়ী অবিদ্যারূপে কাহাকেও সংসারের মোহে বদ্ধ করেন। আবার কাহাকেওবা প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়াও বিদ্যারূপে তাহার কল্যাণ করেন। ভক্ত প্রার্থনা করেন,—মা! যাহাতে আমার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন হয় তুমি এমন ব্যবস্থা কর মা!

আমার কল্যাণ কোন্ পথে—আমিত জানি না মা! যে পথে যাইলে আমার প্রকৃত কল্যাণ হইবে, কল্যাণময়ী মা! আমার বুদ্ধিকে সেই পথে প্রেরণ কর। ক্ষেমঙ্করী মূর্ত্তিতে আমার পথ রক্ষা কর।

"মার্গং ক্ষেমঙ্করী রক্ষেৎ।" দেবী-কবচ।

মায়ের একটী নাম 'কল্যাণী।' তিনি জগন্মাতা বলিয়া তাঁহার সৃষ্ট জগতবাসীদের প্রতি তিনি চিরকাল কল্যাণময়ী স্নেহ-দৃষ্টি করেন। দেবতাগণ মাকে কল্যাণরূপা বলিয়া স্তব করিয়াছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর ৫ম অধ্যায়।—

"নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ **শিবায়ৈ** সততং নমঃ।
"**কল্যাণ্যৈ** প্রণতা= = =নমঃ।"
"রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি **কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে**। ১২।১৫
'বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১৫

দেবি! শত্রুনাশের বিধান কর। উৎকৃষ্ট বলের বিধান কর। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, (আমর) শত্রু-দমন কর।

মা! জীবের শান্তি যাহারা নষ্ট করে, তাহারাই জীবের শত্রু। জীবের সংসার সুখে যাহারা বিঘ্ন দেয়, জীবের মনের আনন্দ-ভোগ যাহারা নিবারণ করে, জীবের পরমাত্মাভিমুখী বা মাতৃ-অভিমুখী কল্যাণময়ী গতিপথে যাহারা অন্তরায় হয় তাহারাই জীবের শত্রু। **জীবের আপন দুষ্টসংস্কারই তাহার অতি প্রবল শত্রু**। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সকলপ্রকার শত্রুনাশ করিবার জন্য মহামায়ার কৃপা ভিক্ষা করা হইতেছে।

দ্বিষো জহি। (আমার শত্রু নাশ কর)

এই প্রার্থনা 'অর্গলা' স্তুতিতে যে অনেক বার করা হইয়াছে, তাহার কারণ, শত্রুনাশ করা ব্যাপারটা সহজ নহে, জীবের আপন ক্ষুদ্র শক্তিতে উহা হয় না, অথচ উহা এত দরকারী যে, উহা না হইলে জীবন অসহ্য হইয়া উঠে এবং সাধনমার্গে থাকিলে কামাদি রিপুর নাশ না হইলে আত্মদর্শন হয় না। সুতরাং সংসারীর পক্ষে প্রত্যক্ষ শত্রু যেমন সুখের বিঘ্নস্বরূপ, সাধকের পক্ষেও কাম-ক্রোধাদি রিপুগণও তেমনি ইষ্টলাভের পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ। মঙ্গলের বিঘ্নকারী শত্রু দূর করিবার জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা এই নূতন নহে। বহুকাল হইতে বহু ভাবে ইহা এদেশে চলিয়া আসিতেছে।

"যে ভূতাঃ **বিঘ্নকর্ত্তারঃ** তে **নশ্যন্তু** শিবাজ্ঞয়া।"

শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিরাট মহিমা—ভক্তগণের শত্রুনাশ। মহিষাসুর, রক্তবীজ, শুম্ভ-নিশুম্ভ—এই সব অসুরেরা কাহার শত্রু? মহামায়ার সৃষ্ট ইহারা মায়ের শত্রু কখনই নহে। কিন্তু মহামায়ার শরণাগত বিপন্ন দেবগণের শত্রু ইহারা এবং সেই ভক্তগণের কাতর প্রার্থনায় ভক্তের শত্রু শেষে ভগবানেরও শত্রুরূপে দাঁড়াইয়া গেল, তাই তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

আমাদের বল অল্প বলিয়া খুব বেশী বলের জন্য মহামায়ার কাছে প্রার্থনা করা হইতেছে। উৎকৃষ্ট বলের বিধান কর মা! আমরা আত্মলাভ করিতে চাই। যে বল সঞ্চয় হইলে আত্মলাভ করা যায় আমাদের সেই উৎকৃষ্ট বলের বিধান কর মা!

"ন্যায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ!"

মা! তুমি মহাবলরূপিনী ও মহা উৎসাহরূপিনী। সেইজন্য তোমার প্রীতির জন্য সাধক তোমায় প্রণাম করিয়া বলিতেছে—

"**মহাবলে** মহোৎসাহে মহা-ভয়-বিনাশিনি।"

মা! তুমি মহা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ কর, তুমি মহাঘোর পরাক্রমে, তুমি দুর্নিরীক্ষে, তুমি **শক্রদিগের ভয়-বর্দ্ধিনী**। সুতরাং তুমিই মা দুর্ব্বলের বল। তুমি আমায় আশ্রয় দাও মা। তবে আমার শক্র নাশ হইবে।

সুরাসুর-শিরোরত্ন-নিঘৃষ্টচরণাম্বুজে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষোজহি ॥১৬

মা! দেবতা ও অসুরদিগের শিরস্থিত রত্নসমূহ তোমার পাদপদ্মে স্পৃষ্ট হয়, মা! (আমায়) রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, (আমার) শক্র নাশ কর।

মহামায়া জগতবাসী সকল দেবতার পূজনীয়া। যখন ইন্দ্রাদি দেবতারা মহামায়াকে প্রণাম করে, তখন পাদ-বন্দনার সময় দেবতাদের দিব্য রত্ন মুকুট মায়ের শ্রীচরণ স্পর্শ করে। দেবতাদের মাথা জগন্মাতার পায়ে লুটাইবার সময় মাথার কিরীটস্থিত রত্ন সকল মায়ের পায়ে ঘর্ষিত হয়। দেবতাদের মস্তকস্থিত রত্নসমূহ দেবগণের মহামায়াকে প্রণাম করিবার সময়, মায়ের পায়ে ঠেকিয়া সার্থক হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেব্যাঃ স্তুতিতে এই কথা আছে। যথা ঃ—

"**বিশ্বেশবন্দ্যা** ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে **ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ**" ১১।৩৩

মা! তুমি ইন্দ্র-ব্রহ্মাদি বিশ্বেশদিগেরও বন্দনীয়া।

মা! তোমার পাদপদ্মের এমন মহিমা যে, যাঁহারা তোমার প্রতি

ভক্তিতে তোমার পদে মাথা নত করিয়া রাখেন তাঁহারা বিশ্বের আশ্রয় হন। দেবীসূক্তেও এই কথা আছে,—

"জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।"

রাবণের মত অসুর রাজদিগের মাথার রত্ন-খচিত মুকুট, মা! তোমার পাদপদ্মে লুণ্ঠিত হয়। রাবণের ভক্তিতে মহামায়া রাবণকে এত কৃপা করিতেন, যে, স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্রের নিক্ষিপ্ত বাণ রাবণের দেহ স্পর্শ করিত না। রাবণকে কোলে লইয়া মহামায়া বসিতেন। রামচন্দ্রের দিব্য শর সকল রাবণের অঙ্গে লাগিবার পূর্ব্বেই মহামায়া গ্রাস করিতেন। রামচন্দ্র যখন দেখিলেন যে, রাবণ মহামায়া কর্ত্তৃক রক্ষিত, তখন রামচন্দ্র মহামায়াকে প্রসন্ন করিবার জন্য, রাবণের অপেক্ষাও বেশী ভক্তিতে দেবীর অকাল-বোধন করিয়া দুর্গা পূজা করিলেন। ত্রিলোকের ঈশ্বর রাবণ যখন বহুমূল্য রত্ন-খচিত মুকুট মাথায় পরিয়া মহামায়ার পাদপদ্মে ভক্তিভরে প্রণাম করিত, তখন রাবণের মাথার মুকুটের রত্ন সকল দেবীর চরণ-কমল স্পর্শ করিত। সুতরাং সকল দেবতা ও শ্রেষ্ঠ অসুর মার পদে মাথা নত করিয়া আপনাদের ধন্য মনে করে।

"**প্রণতানাং** প্রসীদ ত্বং দেবি **বিশ্বার্ত্তিহারিণি**।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥
শ্রীশ্রীচণ্ডী।১১।৩৫

হে বিশ্ববাসীর আর্ত্তি বা কাতরতাদূরকারিণি! মা! তোমার চরণে প্রণত ব্যক্তিগণের প্রতি প্রসন্না হও। হে পূজনীয়ে! হে আরাধ্যে! ত্রৈলোক্যবাসী লোক সমূহের বরদায়িণী হও।

বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু।
রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি ॥ ১৭

মা! মহামায়া! আমাকে বিদ্যাযুক্ত যশযুক্ত এবং লক্ষ্মীযুক্ত কর। (আমাকে) রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, (আমার) শত্রু নাশ কর।

দেবি! সকল বেদপুরাণাদি বিদ্যা তোমারই মূর্ত্তি বিশেষ। চৌষট্টিকলা-বিদ্যারূপিণী মা! তুমি বিদ্যারূপে জীবকে কৃপা না করিলে, জীব প্রকৃত বিদ্যাবান্ হয় না। সেইজন্য প্রার্থনা,—মা! আমার অবিদ্যা দূর করিয়া পরমমুক্তির হেতুভূত যে পরাবিদ্যা, তাহাই আমায় দাও মা! যে বিদ্যায় ভূষিত হইলে, আমি সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যরূপিণী তোমার তত্ত্ব বুঝিতে পারি, আমায় সেই তত্ত্ব-জ্ঞান-সাধিকা সুন্দর বিদ্যা দাও মা! যত কিছু বিদ্যা আছে সমস্তই মা! তোমারই নানা মূর্ত্তিবিশেষ। তুমিই বিদ্যামূর্ত্তি।

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ।"
শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১১।৬

"লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১১।২২

মা! তুমিই বাক্‌দেবী সরস্বতী।

"মেধে সরস্বতী বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।"

মহামায়া! সুখদুঃখের সাধনভূত নানা বিদ্যায় যে আমাদের প্রবৃত্তি, তাহাও তোমার অধীন। তুমিই সমস্ত ঐহিক সুখ সম্পাদক ইন্দ্রজালাদি বিদ্যা'র, তর্কাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং বিবেক উৎপাদক আদিবাক্যরূপ বেদবাক্যসমূহের একমাত্র প্রবর্ত্তক। আবার তুমিই

এই মহামোহময় অতি মহান্ধকারময় মমত্বরূপ সংসারগর্ত্তে পুনঃপুনঃ জন্মদ্বারা অনন্ত জগৎ ভ্রমণ করাইতেছ। এত অপূর্ব্ব শক্তি তুমি ছাড়া আর কাহারও নাই। মা! তুমিই অবিদ্যারূপে আমাদের মায়ার বা আসক্তির বাঁধনে বাঁধিয়া সংসারকে স্থিতি করিতেছ। জীব তাই মায়ার কবলে পড়িয়া কখন সুখ পাইয়া হাসে ও কখন দুঃখ পাইয়া কাঁদে। আবার তুমি যখন প্রসন্না হও মা! তখন বিদ্যামূর্ত্তিতে এই সুদৃঢ় মায়ার বাঁধন কৃপা পূর্ব্বক খুলিয়া দিয়া বদ্ধ জীবকে মোহমুক্ত করিয়া দাও। জীব ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইয়া ধন্য হয়।

> **বিদ্যাসু** শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে
> স্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
> মমত্বগর্ত্তেঽতি মহান্ধকারে
> বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্ ॥"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১১।৩১

> "সা **বিদ্যা** পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী ॥
> সংসার-বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১।৫৭—৫৮

মহামায়া! তুমি মুক্তির হেতুভূতা ব্রহ্মজ্ঞান স্বরূপা, পরমা বিদ্যা। আমায় এই ব্রহ্মবিদ্যায় বিদ্বান কর মা! এই ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য প্রবৃত্তি দাও মা! আকাঙ্ক্ষা দাও মা! তোমার কৃপা ব্যতীত আমার এই ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের আশা নাই।

> "**মহাবিদ্যা** মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১।৭৭

মহামায়া! তুমি শব্দাত্মিকা ব্রহ্মময়ী,—তুমি শব্দব্রহ্মরূপা। উচ্চৈঃস্বরে গীত ও সুমধুর পদ—পাঠযুক্ত অথবা ওঁকারযুক্ত বলিয়া সুশ্রাব্য ও মন্ত্রময় অপৌরুষেয় সুবিমল ঋক্ যজুঃ ও সামবেদের আশ্রয় মা! তুমিই—তুমি বেদত্রয়স্বরূপা। মা! বেদজ্ঞান তোমার কৃপাসাপেক্ষ।

"শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গযজুষাং নিধান-
মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৪।১০

মা! বিদ্যাও তুমি আবার তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বুদ্ধিরূপাও তুমি।

"মেধাঽসি দেবি! বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৪।১১

মহামায়া! তুমি আমাদের তপস্যায় ও আরাধনায় পরিতুষ্টা হইলে আমাদের প্রার্থনা-অনুসারে তত্ত্বজ্ঞান ও ঋদ্ধি বা ঐশ্বর্য্য প্রদান কর মা! এই বরদায়িনী মা! তোমার স্বভাব।

"সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১২।৩৭

এত করুণাময়ী না হইলে কি জগতের মা তুমি হইতে পার?

যশস্বন্তম্—মা! আমায় যশ-যুক্ত কর। আমার জীবন এমন পুণ্যময় ও সুন্দর কর মা! যাহাতে আমার কর্ম্মের যশঃ পৃথিবীর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আমায় বিমল যশ দাও মা! তুমি যদি আমাকে তোমার অবিদ্যামূর্ত্তিদ্বারা মোহাচ্ছন্ন কর মা! তবে

মোহযুক্ত অবস্থায়, আমি দয়া, পরোপকার, তপস্যা, বিষয়ে বৈরাগ্য ও ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি, কিছুই সদ্‌গুণ লাভ করিতে পারিব না। কাজেই আমি স্বার্থপর, ভোগাসক্ত ও বদ্ধজীব হইব। বদ্ধজীবের যশোভাগ্য কোথায়? আমার যশলাভ একমাত্র তোমারই কৃপা-সাপেক্ষ। তুমি মা! যাঁহাদের প্রতি প্রসন্না হও, তাঁহারাই দেশে দেশে পূজিত হন। তোমার আশ্রিত তাঁহাদেরই ধন ও যশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

"তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গ ঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং **সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না** ॥"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৪।১৫

"**যশঃ কীর্ত্তিঞ্চ** লক্ষ্মীঞ্চ সদা রক্ষতু বৈষ্ণবী।"

শ্রীশ্রীদেবীকবচম্।

মা! তুমি বৈষ্ণবীরূপে আমার দানাদিলব্ধ যশঃ এবং শৌর্য্যাদিজাত কীর্ত্তিসকল, সর্ব্বদা রক্ষা কর মা!

আমাদের এই গ্রন্থে "যশো দেহি" কথার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মীবন্তম্—মা! আমায় লক্ষ্মীযুক্ত কর। এই জগতে যাহার অর্থ নাই, তাহার সকল কার্য্যে বড় অসুবিধা হয়। সম্পদ না না হইলে দেহ ও মন সুস্থ হয় না, কাজেই ভগবৎ-উপাসনায় মন বসে না। রাজরাজেশ্বরী মায়ের সন্তান হইয়া লক্ষ্মীছাড়া হইলে বড় দুঃখের কথা। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-ফলে ও ইহ জীবনের কর্ম্মের দোষে,

যদি আমাদের দারিদ্র্য আসিয়া পড়ে, তবে সেই সর্ব্বগ্রাসী দারিদ্র্যের হাত হইতে মা! তুমি ছাড়া আর কেহই আমাদের উদ্ধার করিতে পারে না।

"**দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিনি** কা ত্বদন্যা।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৪।১৭

মা! তুমিই শ্রী—লক্ষ্মী—বিষ্ণুর শক্তি—ঐশ্বর্য্য—সম্পত্তিরূপা। ব্রহ্মা তোমায় শ্রীরূপে দেখিয়া স্তব করিয়াছিলেন—

"**ত্বং শ্রী** ত্বমীশ্বরী..."

মহামায়া! তুমি পুণ্যবানের ঘরে স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপা।

"যা **শ্রী** স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্।" শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৪।৫

মা! তুমি মধুকৈটভারি নারায়ণের একমাত্র হৃদয়াধিবাসিনী শ্রী (লক্ষ্মী)।

"**শ্রীঃ** কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা।" শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৪।১১

মা! তুমি সকলপ্রাণিমধ্যে **লক্ষ্মীরূপে** অবস্থিতি করিতেছ।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষ্ **লক্ষ্মীরূপেন** সংস্থিতা।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৫।৫৬

"**লক্ষ্মি** লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১১।২২

যে সকল ভক্তেরা অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অথবা নবমী তিথিতে মধুকৈটভনাশ, মহিষাসুরবধ ও শুম্ভনিশুম্ভবধরূপ দেবী-মাহাত্ম্য একচিত্তে কীর্ত্তন করিবে, আর ভক্তি-সহকারে যাঁহারা শ্রবণ করিবে,

তাঁহাদের কিছুমাত্র পাপ থাকেনা, এবং পাপজন্য আপদ্ও হইবে না। তাঁহাদের **দারিদ্র্য** হইবে না এবং বন্ধু বিয়োগও ঘটিবে না।

"ভবিষ্যতি ন **দারিদ্র্যং** ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১২।৫

সম্পৎ-কালে মহামায়াই মনুষ্যদিগের গৃহে উন্নতিদায়িনী লক্ষ্মীরূপা। লক্ষ্মীর কৃপায় মানব গণ্য মান্য হয়।

"ভবকালে নৃণাংসৈব **লক্ষ্মী**র্ব্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১২।৪০

মহামায়াকে স্তব করিলে এবং **গন্ধ**পুষ্পধূপদীপ ও নৈবেদ্যাদির দ্বারা পূজা করিলে, তিনি **ধন** পুত্র এবং ধর্ম্মে শুভমতি প্রদান করিয়া থাকেন।

স্তুতা সংপূজিতা পুষ্পৈর্ধূপগন্ধাদিভিস্তথা।
দদাতি বিত্তং পুত্রাং**শ্চ** মতিং ধর্ম্মে তথা শুভাম্॥"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১২।৪১

মন্ত্র

"দেবি প্রচণ্ডদোর্দ্দণ্ড-দৈত্যদর্পনিসূদিনি!
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি"॥ ১৮

"হে প্রচণ্ড দুর্দ্দান্ত দানবদর্পচূর্ণকারিণি দেবি চণ্ডিকে! আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, (আমার) শত্রুসকল নাশ কর মা!"

ভীষণ বলশালী দানবগণের শক্তিকে দেবতারা পর্য্যন্ত দমিত

করিয়া রাখিতে পারে নাই। দানবগণের অত্যাচারে দেবগণ অনেক বার লাঞ্ছিত হইয়া স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। দৈত্যদিগের স্পর্দ্ধা এতদূর পর্য্যন্ত হইয়াছিল, যে, তাহারা ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পদ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভ দানবগণের দর্প কোন দেবতাই চূর্ণ করিতে পারে নাই। মহামায়া! মা! একমাত্র তুমিই তাহাদের মত দুর্দ্দান্ত দৈত্যদের যুদ্ধে বধ করিয়া তাহাদের দর্প চূর্ণ করিয়াছ। মহিষাসুরমর্দ্দিনি মা! তুমি কত শক্তিশালিনী মা! তোমার শক্তিতে আমায় শক্তিমান কর মা! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলশালীদেরও বলের দম্ভ চূর্ণ কর। মা! তুমি মহাশক্তিরূপিনী। তোমারই শক্তিতে দেব-দানব-মানব শক্তিমান। সেই জন্য সকলেই তোমার শক্তির নিকট অবনত। কাহারও শক্তির অহঙ্কার তুমি রাখ না মা! তুমি যে সর্ব্বত্র তোমার শক্তির খেলা দেখাইয়া সকলের শক্তির গর্ব্ব চূর্ণ কর মা। শক্তিময়ি মা!

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু **শক্তিরূপেন** সংস্থিতা।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৫।৩২—৩৪

মহামায়ার শক্তির কথা আর কি বলিব! তাঁর মাহাত্ম্য-কথারই শক্তি অদ্ভূত। এই দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ করিলে সকল দুর্দ্দান্ত-প্রকৃতি অসুরদিগের নিঃশেষে বলহানি হয়।

"দুর্বৃত্তানামশেষাণাং **বলহানিকরং** পরম্।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১২।১৯

মা! তোমার যুদ্ধবেশে সজ্জিত মূর্ত্তিতে তোমার হস্তে যে ঘণ্টা শোভা পায়, সেই ঘণ্টার এমন ভীষণ শব্দ তুমি কর যে, তাহাতে

সমুদয় জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া দৈত্যতেজসমূহকে বিনাশ করে। তোমার ঘণ্টাশব্দের যদি এতই শক্তি, তবে মা! তোমার শক্তি কত তাহা আমরা ধারণায়ও আনিতে পারি না।

"হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১১।২৭

ভয়ঙ্কর বৃত্রাসুরকে পর্য্যন্ত তুমি বধ করিয়া তোমার সর্ব্বশক্তিমত্তা তুমি প্রমাণ করিয়াছ।

"**বৃত্রপ্রাণহরে** চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোস্তুহতে।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১১।১৯

"হতদৈত্যে মহাবলে।" শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১১।২০

"সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১১।১১

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের শক্তিরূপিনি মা! হে অলঙ্ঘ্যবীর্য্যে মা! হে অনন্তবীর্য্যা মা! হে বিশ্বেশ্বরি জগতজননি! তোমার পরাক্রমের তুলনা আর কাহার সহিত হইবে মা?

"কেনোপমা ভবতু তেহস্য পরাক্রমস্য।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৪।২২

দানবগণের পক্ষে তুমি সাক্ষাৎ যম-সদৃশ। তোমার কুপিত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কেহই জীবিত থাকিতে পারে না।

"কৈর্জ্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৪।১৩

"কিঞ্চাতিবীর্য্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৪।৬

দানবদলনী মহামায়ার শক্তি এত মহতী ও বিচিত্র যে ভগবান বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও হর পর্য্যন্তও তাঁহার অনুপম প্রভাব ও বলের বর্ণনা করিতে অসমর্থ।

"যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৪।৪

মন্ত্র

"প্রচণ্ডে দৈত্যদর্পঘ্নে চণ্ডিকে প্রণতায় মে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি॥" ১৯

হে প্রচণ্ড দৈত্যদর্পহারিণি চণ্ডিকে! প্রণত আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, আমার শত্রুসকল চূর্ণ কর।

মা! তুমি প্রচণ্ড দৈত্যগণের বধ করিয়া তাহাদের দর্পচূর্ণ করিয়াছ. মা! তুমি জগতের মা, জগতের কল্যাণকারিনী। তোমার বিরাট মহিমার কথা চিন্তা করিয়া তোমার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া পড়িয়াছি। মা! আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া আমার প্রার্থিত বস্তু সকল দাও মা! মহিষাসুরমার্দ্দিনী মা, তোমার শক্তিকে কখন যেন অস্বীকার করি না মা! তুমি বড় বড় দৈত্যদের দর্প রাখ নাই—এই কথা ভাবিয়া আমার মনে যেন অহম্-কর্ত্তার ভাব বা কোন অভিমান বা অহঙ্কার না জাগিয়া উঠে:মা! সেইজন্য

আমি তোমার পদে প্রণত হইলাম। যদি আমার পূর্ব্ব জন্মের পাপ সংস্কারের ফলে তোমায় ভুলিয়া আমি অহঙ্কারী হইয়া উঠি তবে আমার বিষম বিপদ ঘটিবে। আমার উদ্ধারের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। আমি শান্তিহারা হইব। মা! আমার অজ্ঞানতা সরাইয়া দিয়া আমার বৃথা অভিমান দূর করিয়া দাও মা! তাহা হইলে আমার মাথা তোমার পদে নত হইয়া থাকিবে। তোমার সর্ব্বকর্ত্তৃত্বের কথা মনে করিয়া তোমার অভয় পাদপদ্মে প্রণত হইলাম। যদি আমার সংস্কার-বশে আবার ভুল হইয়া যায়। আবার যদি আমার মধ্যে অহঙ্কার ও অভিমান জাগিয়া উঠে। তবে করুণাময়ি মা! তুমি প্রচণ্ড শক্তিশালী আমার আসুরিক প্রবৃত্তি সকলকে ও পাপ অহম্-জ্ঞানকে, আমার নিরাশ্রয় অবস্থা দেখিয়া, আমার প্রতি কৃপা করিয়া, তুমি ধ্বংস কর মা! আমায় এমন ভাবে তুমি কৃপা কর মা! যেন তোমার পাদপদ্মে আমি চিরকাল আমার গর্ব্বিত মস্তককে লুটাইয়া রাখিতে পারি। মা! আমি তোমার পদে প্রণত! আমার সকল সাধ এইবার পূর্ণ কর মা! সর্ব্বস্বরূপে! সর্ব্বেশে! সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিতে!

মন্ত্র

চতুর্ভুজে চতুর্ব্বক্ত্র-সংস্তুতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২০

হে চতুর্ভুজ ও চতুর্মুখ-ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সংস্তুতে দেবি! হে পরমেশ্বরি! আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, আমার শত্রুসকল নাশ কর।

চতুরানন ব্রহ্মা কতবার, কতকল্পে যে তোমার স্তব করিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? লোক-পিতামহ, সৃষ্টিকর্ত্তা, আদিকবি, ভগবান ব্রহ্মা, মহামায়ার ইচ্ছাতে শরীর-ধারণ করিয়াছে। শুধু ব্রহ্মা কেন, বিভু ও মহেশ্বরও ব্রহ্মার মত মহামায়ার ইচ্ছায় শরীর ধারণ করিয়াছে। একথা ব্রহ্মা নিজে মায়ের স্তবে বলিয়াছেন। একবার মধুকৈটভ অসুরদের ভয়ে ভীত ব্রহ্মা ভগবান হরির যোগনিদ্রারূপিনী মহামায়াকে স্তব করিয়াছিলেন।

"তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ
বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াম্ ॥"
শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১।৭০

"বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিনীম্।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ ॥" ১।৭১
"বিষ্ণুঃশরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান
ভবেৎ।" ১।৮৪

"এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা।" ১।৮৯

মেধস মুনি এই দেবী-মাহাত্ম্যের বক্তা ও রাজ্যভ্রষ্ট সুরথ রাজা ও গৃহতাড়িত সমাধি বৈশ্য শ্রোতা। মধুকৈটভ-বধ-বিবরণ বলিবার পর, মেধস মুনি বলিয়াছিলেন—এই মহামায়া উক্ত প্রকারে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্তুতা হইয়া আপনিই আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। এই দেবীর বৃত্তান্ত (মহিমা) তোমাকে পুনর্ব্বার বলিতেছি, শ্রবণ কর।

"এবমেষা সমুৎপন্না **ব্রহ্মনা সংস্তুতা** স্বয়ম্ ।
প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে ॥" ১।১০৪

সৃষ্টিকর্ত্তা **ব্রহ্মা** কত বড় দেবতা ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিনটী সর্ব্বলোক পূজনীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ দেবতা ব্রহ্মার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও মহীয়সী দেবতা এই ব্রহ্মময়ী মহামায়া। সেইজন্য ব্রহ্মা বিপন্ন হইয়া এই দেবীর স্তব করিয়াছিলেন। দেবীও ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া ব্রহ্মাকে বরদান করিয়া তাহার অভীষ্ট পূর্ণ করেন। ফলে মধুকৈটভ-বধ হয় ও ব্রহ্মা নির্ভয় হয়।

মন্ত্র ।

কৃষ্ণেন সংস্তুতে দেবি শশ্বদ্ভক্ত্যা সদাম্বিকে ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২১ ॥

হে কৃষ্ণ (বিষ্ণু) কর্ত্তৃক সর্ব্বদা ভক্তিসহকারে সংস্তুতে দেবি ! অম্বিকে ! আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, আমার শত্রু নাশ কর।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক সময়ে বিপন্ন হইয়া ভগবতীর স্তব করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ দেবীভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধের ২৪, অধ্যায়ে প্রদ্যুম্ন-হরণ ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব বিষয়ে, উপাখ্যান আছে। তাহা এই যথা ঃ—শ্রীকৃষ্ণের পরম শোভনা মহিষী রুক্মিণী প্রিয়দর্শন প্রদ্যুম্ন নামক পুত্রকে প্রসব করিলে, কৃষ্ণ তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সমাপন করিলেন। তদনন্তর শম্বর নামক বলবান দানব সূতিকাগৃহ হইতে সেই শিশুপুত্রটীকে হরণ পূর্ব্বক আপন নগরীতে লইয়া গিয়া মায়াবতীর করে সমর্পণ করিল।

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ পুত্র অপহৃত হইয়াছে জানিয়া অত্যন্ত শোকাতুর হইলেন এবং ভক্তিযুক্ত মানসে ভগবতীর শরণাপন্ন হইলেন। যিনি অবলীলাক্রমে বৃত্রাসুরাদি দৈত্যগণকে নিহত করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ পরম মহৎ অক্ষর সংযুক্ত কল্যাণদায়ক সুমধুরস্বরে সেই যোগমায়ার স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

মাতর্ম্ময়াতিতপসা পরিতোষিতা ত্বং
প্রাগ্‌জন্মনি প্রচুর বস্তুভিরর্চ্চিতাসি।
ধর্ম্মাত্মজেন বদরীবনমন্তমধ্যে
কিং বিস্মৃতো জননি! মে ত্বয়ি ভক্তিভাবঃ॥ ৪৮

—ইত্যাদি।

অনুবাদ ঃ—"জননি! আমি পূর্ব্বজন্মে ধর্ম্মপুত্র হইয়া বদরীবনমধ্যে তপস্যা দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়াছি এবং নানাবিধ উপহার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছি; মাতঃ! আপনার প্রতি আমার যে ভক্তিভাব তাহা কি আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন? —ইত্যাদি

শ্রীকৃষ্ণ স্তবের শেষে বলিলেন—"মাতঃ! আমি আপনার তুষ্টিকর যজ্ঞ, ব্রত ও পূজা প্রভৃতি সমস্ত দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, আপনি আমার দুঃখ দূর করুন। জননি! যদি আমার পুত্র বাঁচিয়া থাকে তবে একবার আমাকে দেখান। মাতঃ! আপনি ব্যতিরেকে শোক সংহার করিতে আর কেহই সমর্থ নহে।

জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে দেবীর স্তব করিলে, তিনি প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন—"দেবেশ! আর শোক করিও

না। পূর্ব্বে তোমার প্রতি এক অভিশাপ ছিল সেই হেতুই শম্বর নিজ আসুরিক মায়াপ্রভাবে তোমার পুত্র হরণ করিয়াছে। অতএব তোমার পুত্রের যখন ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম হইবে, তখন সে আমার প্রসাদে শম্বর দৈত্যকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিয়া আগমন করিবে, সন্দেহ নাই।"

চণ্ডবিক্রমা দেবী চণ্ডিকা এইরূপ আশ্বাসপ্রদ বাক্য বলিয়া অন্তর্হিত হইলে ভগবান কৃষ্ণও পুত্রশোক বিসর্জ্জন দিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ একবার পুত্রকামনায় ভগবান শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের স্তবে শিব পরিতুষ্ট হইয়া বরদান করিয়াছিলেন। —"বহবস্তে-ভবিষ্যন্তি পুত্রাঃ শত্রুনিসূদন!"—"হে শত্রুঘাতন শ্রীকৃষ্ণ! তোমার বহুসংখ্যক পুত্র হইবে।" ভগবান শিব বরদান করিয়া নীরব হইলে শ্রীকৃষ্ণ গিরিজার চরণে প্রণাম করিলেন। তখন দেবী পার্ব্বতী বাসুদেবকে পুনঃ পুনঃ সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,— "হে মহাবাহো! কৃষ্ণ! হে নরশ্রেষ্ঠ! এই সংসারে তুমি সমস্ত গৃহস্থগণের আদর্শস্বরূপ হইবে, তদনন্তর শত বৎসর গত হইলে বিপ্রশাপে এবং গান্ধারীর অভিশাপে তোমার কুলক্ষয় হইবে।"

"উবাচ গিরিজা দেবী **প্রণতং মধুসূদনম্**।"

দেবীভাগবৎ। ৪।২৫।৫৮

মহামায়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব এবং সর্ব্বদেবগণপূজনীয়া। ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ এবং লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণও সেই সচ্চিদানন্দরূপিনীর উপাসনা করিয়া থাকেন।

"ব্রহ্মা বিষ্ণ্বাদয়স্তদ্বদ্‌গৌরী লক্ষ্ম্যাদয়স্তথা।
তামেব সমুপাসন্তে সচ্চিদানন্দরূপিনীম্‌॥
দেবীভাগবৎ। ৪।২৫।৭৯

ভারাক্রান্ত পৃথিবীর স্বর্গলোকে গমন হইলে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত বিষ্ণুসদনে যান। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে পৃথিবীর দুর্দ্দশার কথা জানাইলে বিষ্ণু বলেন,—"আমি নিশ্চিতই পরাধীন; কেবল আমি কেন! আমার ন্যায় তুমি ও রুদ্র এবং সমস্ত সুরোত্তমগণ সকলেই পরাধীন জানিও। হে সুরগণ! অদ্য তোমরা পরমাত্মার আদ্যাশক্তি, শিবরূপিনী শক্তিকে স্মরণ কর, তিনিই তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।"

"পরতন্ত্রোঽস্ম্যহং নূনং পদ্মযোনে! নিশাময়।
তথাত্বমপি রুদ্রশ্চ সর্ব্বে চান্যে সুরোত্তমাঃ॥
দেবীভাগবৎ। ৪।১৮।৬০

"তস্মাত্তাং পরমাং শক্তিং স্মরন্ত্যদ্য সুরাঃ শিবাম্‌।
সর্ব্বকামপ্রদাং মায়ামাদ্যাং শক্তিং পরাত্মনঃ॥
দেবীভাগবৎ। ৪।২৯।৭

ভগবান হরি এইরূপ বলিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই সনাতনী যোগমায়া ভুবনেশ্বরী দেবীকে মনে মনে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র রক্তজবার ন্যায় অরুণবর্ণা দেবী ভুবনেশ্বরী পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয় মুদ্রা ধারণপূর্ব্বক প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূতা হইলেন। তখন দেবগণ দেবীকে দর্শন করিয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

দেবতাদের স্তবে তুষ্টা হইয়া দেবী কহিলেন—"সুরগণ! এখন

তোমরা সুস্থির হইয়া গমন কর। ধরণীও সুস্থির হউক। তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, আমি অবশ্যই বসুন্ধরার ভার হরণ করিব।"

রামচন্দ্ররূপী ভগবান বিষ্ণুও রাবণবধের জন্য এই দেবীর অকাল-বোধন করিয়া বিধিমত পূজা ও আরাধনা দ্বারা দেবীকে তুষ্টা করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। মহামায়াকে ভক্তিদ্বারা বশীভূত করিতে না পারিলে, রামচন্দ্র দেবীর আশ্রিত রাবণকে বধ করিতে পারিতেন না।

একসময়ে ভগবান হরি সমস্ত দেবগণের সাহায্যে বিধিপূর্ব্বক আশ্চর্য্যকর অম্বিকাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাহার কারণ, বৈকুণ্ঠধামে বসিয়া মণিমণ্ডিত মনোহর দ্বীপ ভগবান বিষ্ণুর স্মৃতিপথে একদিন হঠাৎ উদিত হইয়াছিল। ভগবান বিষ্ণু এই মণি দ্বীপেই মহামায়ার দর্শন ও কল্যাণদায়ক মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই জন্য পূর্ব্বে যাঁহার দ্বারা তিনি স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হন, সেই পরাশক্তিকে স্মরণ করিয়া অম্বিকা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত মানস করিলেন। যখন সেই হোমকার্য্য বিধিপূর্ব্বক সম্পাদিত হইতে লাগিল, তখন মোহন ও মধুর স্বরে ভগবান বিষ্ণুকে সম্ভাষণ করিয়া এই আকাশবাণী উচ্চারিত হইল যে, "বিষ্ণো! তুমি সর্ব্বদাই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠতম হও। তুমি সমস্ত দেবগণের মধ্যে মাননীয়, পূজনীয় ও প্রভাবশালী হইবে। দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ব্রহ্মাদি সমস্ত সুরগণই তোমার অর্চ্চনা করিবেন। হে অচ্যুত! পৃথিবীতলের সকল স্থলেই যে মানবগণ তোমার প্রতি ভক্তি-সমন্বিত হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই প্রভাবসম্পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। আর তুমি সকল মানবগণের বরপ্রদ ও কামপ্রদ হইবে। বিষ্ণো! তুমিই সর্ব্ব দেবগণের শ্রেষ্ঠ। তুমিই সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর এবং সকল যজ্ঞেই মুখ্য ও যাজ্ঞিকগণের পূজনীয়

হইবে। জনগণ তোমার পূজা করিবে এবং তুমি তাহাদিগকে বরদান করিবে। হে **পুরুষোত্তম**! দেবতারা যে যে সময় অসুরগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইবে তখনই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তুমিই সকলের রক্ষাকর্ত্তা হইবে, সন্দেহ নাই। আর সমস্ত পুরাণ ও সুবিস্তৃত **অখিল বেদমধ্যে তুমিই পূজ্যতমরূপে** পরিকীর্ত্তিত হইবে। হে কেশব! ভূমিতলে যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইবে তখনই তুমি অংশে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মরক্ষা করিবে। মধুসূদন! ধরাতলে বিভাগক্রমে নানা যোনিতে তত্রত্য মহাত্মা ব্যক্তিগণের মাননীয়, সর্ব্বলোকে বিখ্যাত, সর্ব্ব অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমার অনেক অবতার হইবে। সমস্ত অবতারেই আমার অংশে উৎপন্ন সমস্ত কার্য্যসাধনী শক্তিসকল তোমার সহচারিনী হইবে। **বারাহী, নারসিংহী প্রভৃতি বিবিধ শক্তিসকল** বিবিধ আয়ুধযুক্ত ও সমস্ত আভরণে বিভূষিত হইয়া তোমার সহকারিনী হইবে, সন্দেহ নাই। হে বিষ্ণো! তুমি তাহাদের সহিত সততই মিলিত হইয়া মদ্দত্ত বলপ্রভাবে সুরকার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি কিঞ্চিমাত্রও গর্ব্বপ্রকাশ করিয়া তাহাদের অবমাননা করিবে না; সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদিগের পূজা ও সম্মান করিবে। **ভারতবর্ষে এই সর্ব্বকামপ্রদ শক্তিসকল মানবগণ কর্ত্তৃক প্রতিমাতে পূজিত হইবে**। হে দেবাধিপ! সেই শক্তিসকলের এবং তোমার কীর্ত্তি এই সপ্তদ্বীপে অধিক কি, অখিল ভুবনে বিখ্যাত হইবে, সন্দেহ নাই। হরে! অবনীমণ্ডলস্থিত মানবগণ এই কামনা করিয়া বাসনা সিদ্ধির নিমিত্ত, এই শক্তিগণের ও তোমার নিয়তই অর্চ্চনা করিবে। নানাবিধ কামনা-সমন্বিত মনুষ্যগণ ঐ অর্চ্চনায়, বিবিধ উপহারে বেদমন্ত্র ও নামজপ দ্বারা তোমাদিগের পূজা করিবে। বিষ্ণো! তুমি অমরগণের

ঈশ্বর হইবে এবং তোমার মহিমা ভূলোকে অধিক কি স্বর্গলোকেও মানবগণের অর্চ্চনার দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।”

আকাশ-সম্ভবা বাণী এইরূপ বরদান করিয়া বিরত হইলে ভগবান বিষ্ণু তাহা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। অনন্তর, সর্ব্বেশ্বর হরি, এইরূপে যথাবিধানে যজ্ঞ সমাপন করিয়া দেবগণ ও ব্রহ্মনন্দন মুনিগণকে বিদায় দিয়া গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক অনুচরগণের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

[শ্রীমদ্ দেবী ভাগবৎ ৩য় স্কন্ধ ১৩শ অধ্যায়]

আর একবার বিষ্ণু আদ্যাশক্তিকে স্তব করিয়াছিলেন। একসময়ে মধুকৈটভ-বধের পর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর দেবগণ, দেবীর প্রদত্ত দিব্য বিমানে চড়িয়া উর্দ্ধাকাশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। দেবগণ চারিদিক জলরাশিতে ব্যাপ্ত দেখিয়া সৃষ্টিকার্য্য করিতে অসমর্থতা জানাইলে দেবীর কৃপায় তাঁহারা সেই বিমানে চড়িয়া এমন এক স্থানে আসিয়া পড়িলেন যে, তথায় জলের লেশমাত্র নাই। সেইস্থান দিব্য স্বর্গরাজ্যের মত, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মেনকাদি অপ্সরাগণে তাহা সুশোভিত। সেই বিমান ক্রমশঃ বায়ুবেগে ব্রহ্মলোকে উপনীত হইল। ব্রহ্মাদি দেবগণ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, যে, তথায় আর একটী চতুর্মুখ ব্রহ্মা বিরাজ করিতেছেন। এই দ্বিতীয় ব্রহ্মাটী কে,—ইহা তাঁহারা তিনজনে স্থির করিতে পারিলেন না। এমন সময় আদ্যাশক্তির অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে সেই দিব্য বিমান মুহূর্ত্তকাল মধ্যে কৈলাস শিখরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মাদি দেবগণ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন দশটী বিশাল বাহুযুক্ত ত্রিনেত্র শার্দ্দুলচর্ম্মাম্বরধারী পঞ্চবদন একটী দ্বিতীয় চন্দ্রশেখর ভগবান শম্ভু কার্ত্তিক-গণেশকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। মাতৃগণপরিবৃত

অপর একটী শঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ব্রহ্মাদি তিনজন দেবতা হতবুদ্ধি হইলেন। এদিকে, দেখিতে দেখিতে, সেই বিমান তথা হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে বায়ুবেগে বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইল। তথায় তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে, অপর একটী পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণুমূর্ত্তি গমন করিতেছেন। অনন্তর, সেই বিমান, ক্ষণমধ্যে তথা হইতে একটী মণিময় দ্বীপে যাইয়া উপস্থিত হইল। তথায় তাঁহারা অদৃষ্টপূর্ব্ব অতি রমণীয় দেবীগণে পরিবৃতা ষটকোণাকার মন্ত্ররাজো-পরিস্থিতা ভগবতী ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি দেখিলেন। সেই মূর্ত্তির অনন্ত চক্ষুঃ, অনন্ত কর-চরণ, ও অনন্ত বদনমণ্ডল—অদ্ভুদ বিরাট রূপ। এই দেবীর তত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে ভগবান বিষ্ণু স্বীয় বিজ্ঞানজ্যোতিপ্রভাবে মনে মনে নিশ্চয় করিয়া কহিলেন,—"বেদাদিশাস্ত্রে যিনি জন্ম-মৃত্যু-বিবর্জ্জিতা পূর্ণা প্রকৃতি বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা ইনি সেই মহাবিদ্যারূপা মহামায়া; এই দেবী ভগবতীই আমাদিগের তিনজনের উৎপত্তির হেতুভূতা। ইনি মায়ারূপে অনিত্য বটেন, কিন্তু চিদানন্দ ব্রহ্মরূপে নিত্য। ইঁহাকেই আবার বেদে পরাত্মা **পরব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি** বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দেবী বিশালাক্ষী বিশ্বেশ্বরীই জগতের আদিভূতা। ইনিই সর্ব্বভূতের নিয়ন্ত্রী। মহাত্মা ঋষিরা ইঁহাকেই সর্ব্বজীবের কল্যাণরূপিনী বেদগর্ভা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অল্পভাগ্য ব্যক্তিগণই ইঁহার আরাধনায় সমর্থ হইতে পারে না। পূর্ব্বে যে আমরা ঘোরতর কঠোর তপঃক্লেশ সহ্য করিয়াছিলাম, ইহা নিশ্চয়ই তাহারই ফল জানিবে। অন্যথা, দেবী জগৎ-জননী আমাদিগকে এস্থলে আনিয়া সমাদর পূর্ব্বক নিজ-স্বরূপ দর্শন করাইবেন কেন? ইনি নিশ্চয়ই সেই মহাদেবী জগদম্বিকা, যাঁহাকে

আমি প্রলয়প্লাবিত মহার্ণব মধ্যে, **আমাকেই একটী ক্ষুদ্র বালকমূর্ত্তি করিয়া পরম আহ্লাদ সহকারে দোলাইতে, দেখিয়াছিলাম।** পূর্ব্বে যখন আমি বটপত্রে শয়ান থাকিয়া সাধারণ বালকের ন্যায়, নিজ দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ, করে ধারণপূর্ব্বক, মুখপদ্মে নিবেশিত করিয়া, উহা সংলেহন করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছিলাম, সেই সময় ইনি জননীর ন্যায় সেইরূপ বটপত্রপুটে ক্রীড়া-নিরত আমার কোমলাঙ্গ সকলকে নানাবিধস্বরে গান করিতে করিতে দোলাইয়াছিলেন। এক্ষণে, আমি ইঁহাকে দর্শনমাত্রেই জানিতে পারিয়াছি, ইনি নিশ্চয়ই সেই মহাদেবী বিশ্বকর্ত্রী জগদম্বিকা। হে ব্রহ্মন্! হে শঙ্কর! চলুন আমরা সকলেই বারংবার প্রণাম করিতে করিতে উহার নিকটে যাই, তাহা হইলে ঐ দেবী মহামায়া প্রসন্না হইয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে বর প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই। **মাতার নিকট যাইতে সন্তানের কি কখন ভয় হয়?** অতএব, চলুন, আমরা নির্ভয়ে যাইয়া **জগজ্জননীর পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া স্তব করি।**"

ভগবান **হরি এইরূপ স্তব** করিলে পর, তাঁহারা তিনজন দেবতা অবিলম্বে সেই দিব্য বিমান হইতে নামিয়া অত্যন্ত শঙ্কিতচিত্তে দ্বারদেশের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তৎকালে, দেবী ভগবতী ব্রহ্মাদি তিনজন দেবতাকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ ক্ষণমাত্রে **তাঁহাদের তিনজনকেই স্ত্রীমূর্ত্তি করিয়া ফেলিলেন।** এইরূপে তখন তাঁহারা তিনজনেই মনোরম অলঙ্কারে বিভূষিতা সুরূপা যুবতী হইয়া একেবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন; পরন্তু, সেই অবস্থাতেই দেবীর নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা সেই মহাদেবীর মণিময় পাদপীঠটীকে দেখিতে

লাগিলেন এবং আরও আশ্চর্য্য হইয়া মহাদেবী ভগবতীর চরণ-কমলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, তত্রত্য নখদর্পণ মধ্যে স্থাবর জঙ্গমময় অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেদীপ্যমানরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। বন, ভূমি, পর্ব্বত, নদ, নদী ও সাগর প্রভৃতি স্থাবর বস্তু সকল; এবং সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, যম, কুবের, প্রজাপতি ত্বষ্টা ও মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ; অধিক কি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রদেব পর্য্যন্তও লক্ষিত হইতে লাগিল। তাহার পর আবার তাঁহারা দেখিলেন, যে, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাবৃন্দ প্রভৃতি উপদেবগণ, এবং গন্ধর্ব্ব-প্রধান বিশ্বাবসু, চিত্রকেতু, চিত্রাঙ্গদ, শ্বেত, নারদ, তুম্বুরু ও হাহাহুহুও বিরাজ করিতেছেন। অপরদিকে, স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অষ্টবসু, সাধ্যগণ, সিদ্ধগণ, পিতৃগণ, অনন্তাদি নাগগণ, এবং কিন্নর, উরগ ও রাক্ষসগণ পর্য্যন্তও যথানিয়মে অবস্থিত রহিয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনের পর, তাঁহারা আরও দেখিলেন যে, ঊর্দ্ধভাগে বৈকুণ্ঠধাম, ব্রহ্মলোক ও পরম পূজনীয় কৈলাসপর্ব্বত **নিত্যরূপে** বিরাজ করিতেছে। ফলকথা এই যে, একমাত্র সেই চরণকমলস্থ নখদর্পণ মধ্যেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই দৃষ্ট হইল। এইরূপে সেই সুধাময় শিবদ্বীপে মহাদেবীর নানাবিধ লীলা-বিহারাদি দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের পূর্ণশতবর্ষকাল অতীত হইল। একদিন **ভগবান বিষ্ণু সেইরূপ যুবতীভাবে থাকিয়াই** সদানন্দময়ী মহাদেবী ভগবতী **ভুবনেশ্বরীকে স্তব** করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

[শ্রীমদ্ দেবী-ভাগবৎ। ৩য় স্কন্ধ। ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়]

মধুকৈটভবধের পর ভগবান বিষ্ণু আকাশবাণীরূপে আদ্যাশক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত, মহামন্ত্র জপ করিতেছিলেন। সেই মহামন্ত্রটী এই—"হে বটপত্রশায়ী শিশুরূপিন্ বিষ্ণো! কল্পারম্ভে যাহা অনন্ত

ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশ পায় এবং প্রলয় সময়ে যে সমস্ত অতীব সূক্ষ্মবীজরূপে প্রকৃতি-গর্ভে নিহিত থাকে, সে সমস্ত একমাত্র **আমিই** জানিবে। **আমা ব্যতীত আর চিরন্তন নিত্য দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই**। ফলতঃ, স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য **একমাত্র অদ্বৈতবস্তু আমিই জানিবে**। শ্রুত বা দৃষ্ট কি অদৃষ্টবস্তুজাত আমা হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই।" এই মন্ত্রের উচ্চারণে বিষ্ণুর জিজ্ঞাস্য নিখিল অর্থই দেবী বিষ্ণুর বোধ করাইয়া দিলেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণুকে জপ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনি সমস্ত দেবগণের ও সমস্ত জগতের ঈশ্বর হইয়া কি জপ করিতেছেন? এই বিশ্ব মধ্যে আপনা অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ বা পূজ্যতম বস্তু আছে কি? বিশেষতঃ আপনি যখন জপ্য বিষয় স্মরণ করিয়া একেবারে প্রেমে উৎফুল্ল হইতেছেন, তখন অবশ্যই ইহাতে কোন গূঢ় কারণ আছে।"

ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া ভগবান হরি বলিলেন, "প্রজাপতে! তুমি নিজেও বিজ্ঞান-সম্পন্ন; তবে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? একবার স্থিরচিত্তে স্বয়ং মনে বিচার করিয়া দেখ না কেন? **তোমাতে এবং আমাতে যে কার্য্য-কারণ-লক্ষণা শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছেন তিনি কে?** ফল কথা এই যে আমি যাঁহাকে জপ বা স্মরণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছি **তিনি সেই সর্ব্ব-মঙ্গল-স্বরূপিনী ব্রহ্মময়ী দেবী ভগবতীই জানিবে**। সেই নিত্য-স্বরূপা পরা শক্তিই ব্রহ্মবিদ্যারূপে বিশুদ্ধচিত্ত সাধকদিগের মুক্তির হেতুভূত হয়েন; আবার মূঢ় মানবগণের সংসার পাশ-বন্ধনের কারণও তিনি। **চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম আর তদাধারভূত চিৎশক্তি**

—তুই পদার্থ নহে—এক বস্তু—অভিন্ন। সেই মহাদেবী ভগবতী আকাশবাণী দ্বারা আমায় যাহা উপদেশ করিয়াছেন, উহাই **ভাগবত শাস্ত্রের বীজ স্বরূপ** জানিবে। কিন্তু দ্বাপর যুগের প্রথমে নিশ্চয়ই সেই গ্রন্থের বিস্তার হইবে।"

[শ্রীমদ্ দেবী-ভাগবৎ। ১ম স্কন্ধ। ১৫শ ও ১৬শ অধ্যায়]

আর একবার ভগবান বিষ্ণু আদ্যাশক্তি মহামায়ার স্তব করিয়াছিলেন। মধুকৈটভ-যুদ্ধে ভগবান বাসুদেব ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, পরন্তু মধুকৈটভ যুদ্ধে ক্লান্ত হইতেছে না, দেখিয়া, তিনি গভীর ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন যে, দেবী ভগবতী, মধুকৈটভদিগের—কামনা অনুসারে মৃত্যু হইবে,—এইরূপ বর প্রদান করিয়াছেন; সেইজন্য তাহারা সমরে ক্লান্ত হইতেছে না। তখন ভগবান বিষ্ণু আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—"হায়! আমি এতকাল বৃথা যুদ্ধ করিলাম। বরমদে উন্মত্ত এই দানবদ্বয় কি জন্য আপনা হইতে মৃত্যু বরণ করিবে? অতএব, এক্ষণে আমি সেই শুভ কামনা প্রদায়িনী আদ্যাশক্তি ব্রহ্মবিদ্যারই শরণাগত হই। বুঝিলাম, **তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রসন্না না হইলে কাহারও কোন মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে না।**"

ভগবান বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন, সেই যোগনিদ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মঙ্গলময়ী দেবী মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সম্মুখস্থ গগণমণ্ডলে বিরাজমানা রহিয়াছেন। তখন **ভগবান বিষ্ণু** সেই দুর্দ্দান্ত দানবদ্বয়ের বিনাশের জন্য **বদ্ধাঞ্জলি** হইয়া অভীষ্টবরদাত্রী **ভুবনেশ্বরীর স্তব** করিতে আরম্ভ করিলেন।

[শ্রীমৎ দেবী ভাগবৎ। ১ম স্কন্ধ। ৯ম অধ্যায়।]

মন্ত্র

হিমাচল-সুতা-নাথ-সংস্তুতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২২

হে হিমালয়ের কন্যার (উমার) পতি (মহাদেব) কর্ত্তৃক সংস্তুতে! হে পরমেশ্বরি! (আমায়) রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, (আমার) শত্রু সকল নাশ কর।

শক্তির সহিত যুক্ত হইলে শিব—শিব হয়েন। শক্তি—বর্জ্জিত শিব,—শব হন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রসিদ্ধ "আনন্দ—লহরী" স্তোত্রে এই শিব—শক্তি-রহস্যের কথা বলিয়াছেন।

আদ্যাশক্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের সাহায্যের জন্য, নিজ অংশ হইতে ব্রহ্মার জন্য ব্রহ্মাণী শক্তি, বিষ্ণুর জন্য বৈষ্ণবী শক্তি লক্ষ্মী, সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দান করিলেন। শিবের জন্য নিজদেহ হইতে পৃথক আর এক শক্তি সৃষ্টি করিলেন না; পরন্তু নিজেই স্বয়ং শিবের গৃহিণী হইলেন। মহাদেব এই ব্যাপার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইলেন এবং মহামায়ার তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া উন্মাদ হইয়া উদাসীন হইলেন! শিব মহামায়াকে বলিলেন,—

"কথং ত্বং জননী ভূত্বা, মম বধূরূপেন সংস্থিতা।
উক্ত্বা চোক্ত্বা ভাবয়িত্বা ভিক্ষুকোহহং নগাত্মজে ॥"

—"হে আদ্যাশক্তি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আমাকে—এই তিন জনকে প্রসব করিয়া, আমাদের জননী হইয়া, কেমন করিয়া আবার আমার বধূরূপে আমার ঘরে বিরাজ কর,—এই তত্ত্ব ভাবিতে ভাবিতে ও

এই কথা বলিতে বলিতে হে শৈলপুত্রি! আমি গৃহহীন উদাসীন ভিক্ষুক হইয়াছি।—তোমার লীলা সকলের বুদ্ধির অগম্য।”

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র,—এক সময়, আদ্যাশক্তির অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে, যুবতীরূপে, পরিণত হইয়াছিলেন ও দেবীর সঙ্গিনীগণের সহিত আনন্দে বহুকাল কাটাইয়াছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এই মহামায়াকে স্তব করিয়াছিলেন। **শিবও স্তব করিয়াছিলেন।** ভগবান বিষ্ণুর স্তব শেষ হইলে **সর্ব্বসংহারক শঙ্কর** প্রণিপাত পূর্ব্বক দেবীর সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন।

“দেবি! হরি যদি আপনার প্রভাব হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং পরে পদ্মযোনিও যদি আপনা হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন, তবে তমোগুণান্বিত হইয়া আমিও আপনার সৃষ্টপদার্থ কেন না হইব? শিবে! সৃষ্টি বিষয়ে আপনার চাতুর্য্য সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইতেছে; অতএব আমার উৎপত্তি যে আপনা হইতেই হইয়াছে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? জননি! আমরা রমণীভাব প্রাপ্ত হইয়াছি; আপনি আমাদিগকে চরণকমল-সেবনে নিয়োজিত করুন। পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনার পাদপদ্ম—বিরহিত হইলে আমরা কোথায় আর সুবিমল সুখলাভ করিতে পারিব? করুণাময়ি! যদি আপনি আমার প্রতি দয়া করেন, তবে আমাকে সেই অনন্তবীর্য্যজনক নির্ম্মল চণ্ডিকামন্ত্রের উপদেশ করুন। দেবি! আমি সেই সর্ব্বশ্রেয়স্কর অত্যুত্তম **নবাক্ষর মন্ত্র** জপ করিয়া সুখী হইতে পারিব সন্দেহ নাই।”

মহাদেব এইরূপ স্তুতি করিলে পর দেবী অম্বিকা পরিস্ফুটরূপে নবাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। মহাদেব তাহা প্রাপ্তিমাত্রে পরম আনন্দিত হইলেন এবং দেবীর চরণ যুগলে প্রণিপাত পূর্ব্বক সেই

স্থানেই অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্যকামনা—পূরণ—কারী মোক্ষপ্রদ অথচ অনায়াসে উচ্চারণীয় সেই নবাক্ষর বীজ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

[শ্রীমৎ দেবীভাগবৎ। ৩য় স্কন্ধ। ৫ম অধ্যায়।]

এই জগতের যে কোন ব্যক্তিই হউক না কেন শক্তিবিহীন হইলে কোন কার্য্যেই সামর্থ্য হয় না। অধিক আর কি বলিব যদি স্বয়ং সদাশিব সেই কুলকুণ্ডলিনীশক্তি-বর্জ্জিত হয়েন তা' হলে তিনিও শবত্ব প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়েন।

"শিবোঽপি শবতাং যাতি কুণ্ডলিন্যা বিবর্জ্জিতঃ।
শক্তিহীনস্তু যঃ কশ্চিদসমর্থঃ স্মৃতো বুধৈঃ॥"

[শ্রীমৎ দেবী ভাগবত প্রথম স্কন্ধ ৮।৩১]

আদ্যাশক্তির অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে যুবতীরূপ ও ভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যখন দেবী ভুবনেশ্বরীর স্তব করিয়াছিলেন তখন সেই করুণাময়ী দেবী প্রসন্না হইয়া ভগবান শঙ্করকে বলিয়াছিলেন—"হে হর, এই মহাকালরূপিনী মনোরমা গৌরীকে গ্রহণ কর, তুমি কৈলাসপুরী রচনা করাইয়া তাহাতে ইঁহার সহিত যথাসুখে বিহার করিতে থাক। তোমাতে তমোগুণ প্রধান রূপে এবং সত্ত্ব ও রজোগুণ গৌণ রূপে অবস্থিতি করিবে; তুমি অসুরগণের বিনাশ নিমিত্ত রজোগুণ ও তমোগুণ ধারণ পূর্ব্বক সংসারে বিচরণ করিতে থাক। হে শঙ্কর, পরম-প্রকৃতিরূপিনী আমি সৃজনাদির সময় **সগুণা,** আর সমাধি সময়ে নির্গুণা হইয়া থাকি। শম্ভো, আদি পুরুষ সনাতন পরমাত্মা কার্য্যও নহেন কারণও নহেন। এই প্রপঞ্চ সমুদয় মায়ারই কার্য্য। হে দেবগণ! এক্ষণে তোমরা আমার

কার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিমানে আরোহণ করিয়া গমন কর। সঙ্কট-স্থল উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিবামাত্রই, আমি তোমাদের দর্শন দিব। দেবগণ! তোমরা সততই আমার এবং সনাতন পরমাত্মার স্মরণ করিও। উভয়ের স্মরণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না”।

[শ্রীমদ্ দেবী ভাগবৎ। ৩।৬।]

দক্ষযজ্ঞে পিতৃগৃহে বিনা নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য সতী মহাদেবের নিকট যখন অনুমতি পাইলেন না, তখন মহামায়া শিবকে দশ-মহাবিদ্যার অপূর্ব্ব রূপ দেখাইয়াছিলেন। মহাদেব দেবীর দশমহাবিদ্যা—রূপ দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন এবং **দেবীই যে ঈশ্বরেরও ঈশ্বরী**—ইহা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া, কাতরে ও কৃতাঞ্জলিপুটে, দেবীকে স্তব করিয়াছিলেন। দেবী প্রসন্না হইয়া পুনরায় সতীরূপ ধারণ করিলেই মহাদেব দেবীকে ভয়ে দক্ষযজ্ঞে যাইতে অনুমতি দিলেন।

কালী মায়ের মূর্ত্তি দেখিলেই মায়ের পদতলে শিবের শয়ান মূর্ত্তি দেখা যায়। শিব মায়ের চরণকমল দুখানি বক্ষে ধারণ করিয়া মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। শিবের বুকে শ্যামা দেখিয়া ভক্ত রামপ্রসাদ গান গাহিয়াছেন—

“বাজবে গো মহেশের বুকে।
নেবে নাচনা ক্ষেপা মাগি॥
মরেন নাই শিব, আছেন বেঁচে,
যোগে আছেন, মহাযোগী।
বিষ খেয়ে যার হয়নি মরণ,
সে মরবে আজ কিসের কারণ;

রামপ্রসাদ বলে, **কপট মরণ**
অভয় চরণ পাবার লাগি ॥"

মহাকাল শিবের প্রার্থিত দেবদুর্ল্লভ বস্তু মা তোমার রাঙা চরণ দুখানি। তোমার মহিমা আমাদের বুঝিবার সাধ্য কোথায় মা! শিব-মোহিনি মা! শিব-বন্দিতা মা! ভগবান শঙ্করই তোমার মহিমা জানিয়া তোমার অভয়পদতলে সদাই লুটাইতেছেন। মা! শিবহৃদি-বিহারিণি শ্যামা! আমি কবে ভগবান আশুতোষের মত তোমার পাদপদ্ম দুখানিকে আমার জীবনের সার রত্ন—আমার ইহপরকালের একমাত্র কাম্যবস্তু—আমার সকল পুরুষার্থের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ—আমার একমাত্র শান্তির নিলয়—আমার পরম বিশ্রান্তি—বলিয়া আমার ধারণা হইবে? মা ব্রহ্মময়ি! জগদ্‌গুরু তন্ত্রবক্তা ভগবান মহাদেবের তোমার প্রতি ভক্তি দেখিয়া যেন আমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যায়!

মহামায়ার একটী নাম **শিবদূতী**। রক্তবীজ-বধের পূর্ব্বে সেই অপরাজিতা চণ্ডিকাশক্তি ধূম্রবর্ণ জটাশালী ঈশানকে বলিলেন,—"হে ভগবন্! আপনি শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট দূত হইয়া গমন করুন। অতিগর্ব্বিত দানবদ্বয় শুম্ভ ও নিশুম্ভকে ও অন্যান্য যে সকল দানব যুদ্ধের নিমিত্ত সেখানে উপস্থিত থাকে, তাহাদিগকে, বলিবেন, 'ইন্দ্র ত্রৈলোক্য লাভ করুন, দেবগণ পুনর্ব্বার হবিঃ ভোজন করুন, তোমরা যদি জীবন-ধারণে ইচ্ছা কর, তবে পাতালে গমন কর। আর যদি বলগর্ব্বে তোমরা যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হও, তবে আগমন কর: আমার এই শিবাগণ তোমাদিগের মাংসে তৃপ্তিলাভ করুক।' যেহেতু দেবী স্বয়ং **শিবকে দূতকর্ম্মে নিযুক্ত** করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি

(কৌষিকীর দেহোৎপন্না দেবীশক্তি) এই লোকে "শিব-দূতী" এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইলেন।

[শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৮ম অধ্যায়]

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—বিশ্বের ঈশ্বর। মহামায়া এই তিনজন **বিশ্বেশ্বরেরও বন্দনীয়া।** এই তিনজন দেবতার বিশ্বেশ্বর হইবার সৌভাগ্য কেমন করিয়া হইল? তাহার রহস্যের কথা এই যে, ইঁহারা তিনজন দেবতা তোমার প্রতি মা! ভক্তি-বিনম্র, সেইজন্য তাঁহারা বিশ্বের আশ্রয় হইয়াছেন।

"**বিশ্বেশবন্দ্যা** ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে **ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ**॥"

[শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১১।৩৩

মন্ত্র।

ইন্দ্রাণী-পতি-সদ্ভাব-পূজিতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ২৩

হে শচীপতি (ইন্দ্র) কর্ত্তৃক সদ্ভাব (ভক্তি) দ্বারা পূজিতে দেবি! হে পরমেশ্বরি! (আমায়) রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, (আমার) শত্রুসকল নাশ কর।

অপর দেবতারা মহামায়াকে বিপদকালে পূজা করে; তাহাও স্বার্থবশতঃ, অভীষ্টলাভের জন্য। কিন্তু, ইন্দ্র দেবীকে **প্রতিদিন** ভক্তিভরে পূজা করিয়া থাকে। দেবীপূজা ইন্দ্রের নিত্যকর্ম্ম। ইন্দ্রের

ইষ্টদেবী তিনি। ইষ্টপূজা যেরূপ ভক্তিভরে হওয়া উচিত, ইন্দ্র সেইরূপ ভক্তিভরে মহামায়ার নিত্য পূজা করেন।

"স্তুতা সুরৈঃ পূর্ব্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ
তথা সুরেন্দ্রেন দিনেষু সেবিতা।"

[শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৫।৮১]

ইন্দ্রের ইষ্টদেবতা—এই মহামায়া—ইন্দ্রকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন। এক সময়ে ইন্দ্র অসুরযুদ্ধে জয়ী হইয়া অহঙ্কারী হইয়া পড়ায়, ব্রহ্ম ইন্দ্রকে শিক্ষা দিবার জন্য যক্ষরূপ ধারণ করিয়া অন্তরীক্ষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র, এই অপূর্ব্ব যক্ষরূপধারী পুরুষের পরিচয় পাইবার জন্য, অগ্নি ও বায়ুদেবতাদের তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। অগ্নি ও বায়ু, নিজ নিজ শক্তির পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া, লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইন্দ্র তখন স্বয়ং সেই পুরুষের পরিচয় লইবার জন্য তথায় আসিলে, সেই পুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্র তখন দুঃখে ও লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিলেন। মহামায়া, তৎক্ষণাৎ **হৈমবতী** মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া ভক্ত ইন্দ্রকে সকল ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন। ইন্দ্র মহামায়ার কৃপায় সেই ছদ্মবেশী যক্ষকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মশক্তির কৃপাসাপেক্ষ। —এই দিব্য উপাখ্যানটী বেদে আছে।

(কেনোপনিষদ্।)

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতাগণ—নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ অবতারমূর্ত্তি—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা—যখন মহামায়ার বন্দনা করিয়া ধন্য হন, তখন ইন্দ্র দেবতা যে দেবীর পদে ভক্তিতে নত হইয়া

থাকিবে, ইহাতে আর কি আশ্চর্য্য আছে। দেবীর দয়ায় ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বজায় থাকে। সেইজন্য অসুরদের উপদ্রবে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব যাইলে, মহামায়া অবতরণ করিয়া ইন্দ্রশত্রুদের বধ করেন। দেবী নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাঽবতীর্য্যাঽহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥"
[শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১১।৫৫]

—দেবী, প্রতিশ্রুতি জানাইয়া প্রণত দেবগণকে বলিতেছেন—"এই প্রকার যখন যখন দানব-সমুত্থিত বাধা উপস্থিত হইবে, তখন তখনই আমি অবতীর্ণা হইয়া (তোমাদের) সকল শত্রু নির্ম্মূল করিব।"

মন্ত্র।

দেবী ভক্তজনোদ্দাম—দত্তানন্দোদয়েঽম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি ॥ ২৪

হে দেবি! (তোমার) ভক্তজনের যে উদ্দাম আনন্দ উদয় হয়, তাহা তোমারই দান, হে অম্বিকে! (আমায়) রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, (আমার) শত্রুসকল নাশ কর।

সচ্চিদানন্দময়ী মহামায়া। তিনি সৎরূপে, চিৎরূপে ও আনন্দরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে প্রকাশিত। মা হৃদয়ে আছেন বলিয়া আমরা আনন্দ লাভ করি। প্রসিদ্ধ গানে আছে—

আনন্দময়ী মা হ'য়ে আমায় নিরানন্দ ক'রো না।"

আনন্দরূপা তিনি যখন জীবকে কৃপা না করেন, তখনই জীব আনন্দশূন্য হয়। তাঁহার কৃপা হইলে, জীব আনন্দময় হয়, জীব প্রসন্নাত্মা হয়। গীতায় আছে—

"ব্রহ্মভূতঃ **প্রসন্নাত্মা** ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।"

ভক্তের উদ্দাম আনন্দ-উদয় মোক্ষকালে হয়। মা! তুমি মোক্ষরূপা বিদ্যামূর্ত্তি।

সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ তিনি। আনন্দ-প্রতিষ্ঠা তাঁর কৃপাসাপেক্ষ। মা! তুমি অমৃতময়, আনন্দময়, সুধাময়। ব্রহ্মার স্তবে ব্রহ্মা মহামায়াকে বলিতেছেন—"**সুধা ত্বম**ক্ষরে নিত্যে।"

সর্ব্বভাবময়ী মহামায়ার, কত ভাবে, কত প্রবৃত্তিরূপে, কত প্রকারে যে সর্ব্বক্ষণ জীবের হৃদয়ে প্রকাশ, তাহা কে বলিতে পারে? মহামায়াই জীবের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বা আত্মা। ভক্তের ভক্তি বা সাধুর শ্রদ্ধা—তিনিই। ভক্তের আনন্দও তাঁরই রূপ।

মন্ত্র।

ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিনীম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৫

হে দেবি! আমার চিত্তবৃত্তির অনুরূপ (মনের মতন) মনোরমা ভার্য্যা দাও। (আমায়) রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও (আমার) শত্রুসকল নাশ কর।

সংসারে সহধর্ম্মিণী মনের মতন ভাল হইলে, তবে সে সত্যই 'প্রিয়া' নামের যোগ্যা হয়। সংসারের শান্তি অনেকটা নির্ভর করে

গৃহিণীর উপর। মা! তুমি কৃপা করিয়া একটী মনোরমা অনুগতা ভার্য্যার ব্যবস্থা কর মা! যেন সেই ভার্য্যা আমার ধর্ম্মকার্য্যের সহায় হয়। যেন সে সত্যই তোমার বিদ্যামূর্ত্তি হয়। যেন সে তোমার অবিদ্যামূর্ত্তি না হয়। যেহেতু জগতের যাবতীয় মোহিকা স্ত্রীশক্তি সকল তোমারই মূর্ত্তিবিশেষ।

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।" [শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১১।৬]

মা! সদা উন্নতিকারিণী তুমি, যাঁহাদের প্রতি প্রসন্না হও, তাঁহাদেরই জীবন, পুত্র, পত্নী ও ভৃত্যবর্গসহ উদ্বেগহীন হইয়া সার্থক হয়। স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া নিরুদ্বিগ্ন থাকিয়া সংসার করা—তোমার কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে মা! তুমি যে লক্ষ্মীরূপিণী!

"ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না॥" (শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৪।১৫)
"যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু" (" ৪।৫)
"ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্ব্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।"
(শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১২।৪০)

দেবগণ স্তবে তুষ্টা মহামায়াকে বরদায়িনী দেখিয়া বলিলেন—"হে অমলাননে! আর মর্ত্ত্যে যে মনুষ্য আমাদের কৃত এই স্তবের দ্বারা তোমার স্তুতি করিবে, আমাদের প্রতি প্রসন্না তুমি, হে অম্বিকে! তাহার জ্ঞান, উন্নতি ও ঐশ্বর্য্যের সহিত (আপন ইচ্ছামত) ধন-স্ত্রী-পুত্রাদি সম্পদের সর্ব্বদা বৃদ্ধির হেতু হইও।"

"যশ্চ মর্ত্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্তাং স্তোষ্যত্যমলাননে।" ৪।৩৬-৩৭

সৃষ্টির আদির্ত্তে মা! তুমি ত ব্রহ্মাকে, বিষ্ণুকে ও রুদ্রকে তাহাদের মনের মতন মনোরমা ভার্য্যা দিয়াছিলে মা! তাঁহারা প্রধান দেবতা, তোমার খুব প্রিয়, তাই, না চাহিতেই ভার্য্যা পাইয়াছিল। আমি কিন্তু অতি সামান্য ব্যক্তি, তোমার একটী অযোগ্য সন্তান তাই সংসারের শান্তিদায়িনী একটী মনোরমা অনুগতা ভার্য্যা, ভয়ে ভয়ে তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি মা—ইহা ভক্তের কথা!

মন্ত্র।

তারিণি দুর্গসংসার-সাগরস্যাচলোদ্ভবে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ২৬

হে দুর্গম সংসার-সাগরের তারিণি! হে হিমগিরিকন্যে! আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, (আমার) শত্রুসকল নাশ কর।

দুর্গ=দুর্গম। অচল=পর্ব্বত (হিমালয়) উদ্ভবে=কন্যে (সম্বোধনে) মহামায়া! তুমি দুস্তর ভবসাগরে অদ্বিতীয় (একমাত্র) নৌকাস্বরূপ। তুমি ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় বা সহায় নাই।

"দুর্গাসি **দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা**।" শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৪।১১

মা! তুমি জগতকে সঙ্কট হইতে ত্রাণ কর। জগতবাসী প্রতি জীবের তুমিই একমাত্র ত্রাতা। তুমি জগতের মা।

তুমি **অবিদ্যারূপে** জীবকে সংসারে আসক্ত করিয়া মোহাচ্ছন্ন কর—বদ্ধ কর। জ্ঞানীরাও মহামায়ার বিচিত্র মায়ায় মোহপ্রাপ্ত হয়।

"তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া-প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥
"জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥" ১।৫৫

সংসারে আসক্তির ফলে, অতৃপ্ত বাসনার পূরণের জন্য, মৃত্যুর পর আমরা আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া মাতৃগর্ভে জন্ম লইয়া থাকি। এই যাতায়াত বদ্ধজীবের সকলকে করিতে হয়। আমাদের এই জন্মমৃত্যু-চক্রে ঘুরিতেই হইবে। ইহার উদ্ধার নাই, নিস্তার নাই। কিন্তু একটি মাত্র উদ্ধারের দৈবী উপায় আছে। যে মহামায়া আমাদের মায়ার বন্ধনে বাঁধিয়াছেন, তিনি যদি কৃপা করিয়া এই মমতার নিগড় খুলিয়া দেন, তবেই উদ্ধার, তবেই মুক্তি। মা! তুমি বিদ্যামূর্ত্তিতে একবার কৃপা কর মা! আমার বন্ধন মোচন করিয়া দাও। মা! তুমিই মুক্তির হেতুভূতা ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপা, **পরমা বিদ্যা** এবং তুমিই আবার সংসার-বন্ধনের হেতুভূতা **অবিদ্যারূপা** ও সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী।

"সা বিদ্যা পরমামুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী ॥
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥" ১।৫৭—৫৮

মহামায়া উপাসনাদিদ্বারা প্রসন্না হইলে মনুষ্যদিগকে মুক্তিপ্রদ বর প্রদান করেন। সুতরাং মাতৃ-আশ্রিত জীবের পক্ষে মুক্তি দুর্লভ নহে।

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥" ১।৫৬

সংসার যতই দুর্গম হউক, মমতার-শৃঙ্খল যতই কঠোর হউক,

বিধিমত নিত্য চণ্ডীপাঠকারীর মোক্ষ করায়ত্ত। মহামায়া ভক্তের ত্রাতা। তিনি জগতের ত্রাণকর্ত্রী। তারিনী—ত্রাণকর্ত্রী।

"মৃতে চ **মোক্ষ**মাপ্নুয়াৎ" (কীলকস্তব)

"নমস্তে **জগত্তারিনি** ত্রাহি দুর্গে!" (দুর্গাস্তব)

মা! তোমার প্রসন্নতাই জীবের মোক্ষের কারণ।

"তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি **ধর্ম্মবর্গঃ**।"

(শ্রীশ্রীচণ্ডী। ৪।১৫)

[ধর্ম্মবর্গ = ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও **মোক্ষ**।

ন সীদতি = ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।]

ভগবান কি করিতে পারেন? —তিনি অসম্ভব সম্ভব ও সম্ভব অসম্ভব করিতে পারেন। ভক্ত প্রহ্লাদের জীবনে জলে শিলাভাসা, অগ্নির দাহিকাশক্তিহীনতা, ও শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর স্বরে যমুনার জলের উজান বহা—প্রভৃতি ঘটনা-অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হওয়ার কথা। আর নিশ্চিত মৃত্যু স্থগিত হইয়া মার্কণ্ডেয়ের **পুনর্জন্ম** লাভ —সম্ভব ব্যাপারের অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হওয়া। ভগবানের কৃপায় কি না হইতে পারে? সকল দেশের ভক্তের জীবনে ভগবানের অনন্ত করুণার অনন্ত বিকাশ দেখা যায়। **ব্রহ্মময়ী মা, আমাদের মত বদ্ধ জীবকে মুক্ত করিয়া দিতে পারেন**— বদ্ধজীবের মুক্তিলাভ একটা অসম্ভব ব্যাপারের সম্ভব ব্যাপার হওয়া। আমাদের চেষ্টায়, আমরা সেই "মহতোমহীয়ান্ অনোর্কনীয়ান" ব্রহ্মময়ী মহামায়াকে লাভ করিতে পারি না। সসীম বস্তু কি অসীম **বস্তুকে** ধারণা করিতে পারে? কিন্তু, ভগবৎ কৃপায় এ

অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হয়। অসীম অনন্ত দয়াময় ভগবান বিগ্রহরূপে ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন, ভক্তের সঙ্গে কথা কন, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন—লীলাময় ভগবান। তিনি সব করিতে পারেন।

এখন প্রশ্ন হউক, **ভগবান কি করিতে পারেন না?** ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সব পারেন। তিনি যদি কোন একটী কাজ করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে আর 'সর্ব্বশক্তিমান' বলা চলিবে না। কিন্তু ভক্তিরাজ্যে তিনি একটী কাজ করিতে পারেন না বলিয়া খ্যাত। ভগবানের সেই কার্য্যটীই তাঁহার বৈশিষ্ট্য, তাঁহার ভগবানত্ব। **ভগবান তাঁহার আশ্রিত শরণাগত ভক্তকে কদাপি ত্যাগ করিতে পারেন না।** এই শরণাগতবৎসলা মহামায়া আমাদের জননী, আমাদের ধাত্রী, আমাদের আশ্রয়। আমরা অভীঃ বা নির্ভয়। মাকে ভুলিলেই ভয়, দুর্ব্বলতা, পাপ প্রভৃতি আমাদের আক্রমণ করে। মাকে স্মরণমাত্রেই আমরা নির্ভয় হই। আমরা যে অমৃতময়ী মায়ের সন্তান! মা আমাদের কখনই কোন সময়ে ত্যাগ করিতে পারেন না।

একজন প্রেমিক সাধকের নিকট একটী গান শুনিয়াছিলাম। সেই গানটী বড় মধুর ভাবপূর্ণ। সেই গানটী আমার মনে পড়িলে আমি বাস্তবিকই কিছুকালের জন্য নির্ভয় হই। সেই গানটী এই :—

"মা আছেন আর আমি আছি **ভাবনা কি আছে আমার।**
মায়ের আমি খাই পরি, **মা নিয়েছেন আমার ভার॥**
সংসার পাকের ঘোর বিপাকে, যখন দেখি অন্ধকার
সেই অন্ধকারে মা আমার, শুনায় "মাভৈঃ" অনিবার॥
(আমি) ভুলে থাকি তবু ডাকে, ভোলে না মা একটীবার
দয়ার আধার মা যে আমার, **আমি মার, মা আমার॥**"

মা! তুমি জীবকে নিস্তারকর, উদ্ধার কর, মুক্ত কর, তাই তুমি "**তারিনী**"। **ইষ্টরূপী** তুমি, **মন্ত্ররূপী** তুমি, **গুরুরূপী** তুমি। যিনি মনকে ত্রাণ করেন, তিনি **মন্ত্র**। যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানরূপ আলোক দেন, তিনি **গুরু**। মা তুমিই মন্ত্র ও গুরু—মূর্ত্তিতে জীবকে উদ্ধার কর। তোমার ইষ্টমূর্ত্তি তোমার মন্ত্রমূর্ত্তিতে লয় হয়, আবার তোমার মন্ত্রমূর্ত্তি, গুরুমূর্ত্তিতে লয় হয়। **ইষ্ট—মন্ত্র—গুরু—তিনই এক এবং একই (তুমি) তিন (মূর্ত্তি)**। তোমার গুরুমূর্ত্তিকে যে মানুষ ভাবে, তোমার প্রতিমা মূর্ত্তিকে বা শালগ্রাম শিলাকে যে জড় ভাবে, সে নরকে যায়।

"ভবসাগর—তারণ—কারণ হে,
রবি—নন্দন—বন্ধন—খণ্ডন হে,
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥" (গুরু স্তব)

অচলোদ্ভবে!—হে পর্ব্বতরাজ হিমালয় কন্যে—! মা! দক্ষযজ্ঞে সতীরূপে পতি নিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিবার পর যখন তুমি আবার লীলাছলে হিমালয় ও মেনকাদেবীর কন্যা পার্ব্বতীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলে, তখন তোমার সেই গৌরীরূপে লীলা চিন্তা করিলে ভক্তের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। এই গৌরী লীলায় তুমি দেব কার্য্যের জন্য দেবতাদের অনুরোধে দেব—সেনাপতি কার্ত্তিকের জন্মের কারণ বলিয়া তোমার একটী নাম **স্কন্দমাতা**। সিদ্ধিদাতা বিঘ্ন-বিনাশন গণেশকে প্রসব করিয়া তুমি **গণেশ-জননী** হইয়াছ মা! এখনও তোমার এই পবিত্র লীলা স্মরণ করিয়া আমরা দুর্গা

পূজায় "আগমনী" ও "বিজয়া" পালন করি। তোমার আগমনী—গান আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া দেয়। "যাও, যাও, গিরি! আনিতে গৌরী।"—এই গান বাঙ্গালা দেশের আকাশ—বাতাস ছাইয়া আছে।

কৈলাস পর্ব্বতে তোমার নিত্য-লীলার স্থান। বৎসরে তিন দিন তুমি মা! হিমালয়ে পিতৃগৃহে পূজা—যত্ন—আদর লইতে আস মা। সেইজন্য তিন দিন কৈলাস নিরানন্দ ও হিমালয় বা মর্ত্তলোক আনন্দে মগ্ন থাকে।

মা! ভগবান রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য তোমায় অকালে বোধন করিয়াছিল। সেইজন্য তোমার পূজা চৈত্র মাসে 'বাসন্তী' ও শরৎকালে দুর্গা বা শারদীয়া পূজা নামে প্রসিদ্ধ।

কোন কোন ভক্ত তোমার উপর অভিমান করিয়া তোমায় 'পাযাণের মেয়ে পাযাণী' বলিয়াছে। কিন্তু সে কথা সত্য নহে। চিরকল্যাণময়ী মা! তুমি চিরকরুণাময়ী, সন্তান-বৎসলা, শরণাগত পালিকা। তোমায় পাযাণী বলিলে প্রকাণ্ড মিথ্যা কথা বলা হয়। ভক্তের গানে তোমায় পাষাণ-হৃদয়া বলিয়া, ভক্ত, কত অভিমান, কত আব্দার, তোমার নিকট করিয়াছে মা! তুমি কিন্তু এত করুণাময়ী যে ভক্তের সেই সব মিথ্যা অভিমানের কথা শুনিয়া তুমি কিছুমাত্রও রাগ্ করনা বা ভক্তের প্রতি কৃপা করা বন্ধ কর না। তুমি যে জগতের মা! আমরা কুপুত্র হলেও তুমি কখন কুমাতা হওনা। যাঁর করুণায় জীব-জগৎ বাঁচিয়া আছে, যাঁর করুণার ধারা—গঙ্গা-যমুনার ধারায় ভারতবর্ষ শস্য-শ্যামলা হইয়া আছে, যাঁর করুণা সূর্য্যকিরণে, আকাশে, বাতাসে, মেঘের জলে, ভূমিতে, অগ্নিতে, তিনি কি কখন "পাষাণী" হইতে পারেন? এমন মাকে

"পাষাণী" কথা বলিলে জিহ্বা খসিয়া যাইবে। চিন্তায়ও যে "পাষাণী" বলিয়া ভাবে মাত্র, তাহার দুর্গতির শেষ নাই। মা! আমার গিরিরাণীর আদরের কন্যা! লক্ষ্মী ও সরস্বতী (সম্পদ ও বিদ্যা) কার্ত্তিক ও গণেশ (শৌর্য্য ও সিদ্ধি) সঙ্গে লইয়া সিংহবাহিনী মা আমার মানস-পটে একবার উদিত হও মা! আমার মধ্যে যে সব আসুরিক প্রবৃত্তি সকল আছে, সেই সব সাধনার বিঘ্ন-স্বরূপ রিপু সকলকে মহিষাসুরের মত মা! তুমি চূর্ণ কর। আমার ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি,—সকলগ্রন্থি তোমার কৃপায় ভেদ হউক! মা! প্রসন্না হও মা! নানা কারণে ভয়ভীত আমাকে অভয় দাও মা! তুমিই ভরসা মা!

মন্ত্র।

ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মহাস্তোত্রং পঠেন্নরঃ।
সপ্তশতীং সমারাধ্য বরমাপ্নোতি দুর্লভম্ ॥২৭

অনুবাদ।

এই অর্গলা-স্তোত্র পাঠ করিয়া কিন্তু মহাস্তোত্র (অর্থাৎ চণ্ডী) পাঠ করিতে হয়। তাহা হইলে মনুষ্য সপ্তশতী (চণ্ডী) আরাধনা করিয়া দুর্লভ বর প্রাপ্ত হইবে।

এই অর্গলাস্তুতি যে সপ্তশতী চণ্ডীর অঙ্গ, তাহা এই মন্ত্রে প্রকাশ হইয়াছে। যিনি এই অর্গলাস্তুতি পাঠ করিয়া সপ্তশতী স্তোত্র জপ করেন, বিধিমত সপ্তশতী চণ্ডী পাঠ করেন, তিনিই চণ্ডীপাঠের ফল পাইয়া বরলাভ করেন, অন্যে ফল পায় না। সেইজন্য অর্গলাস্তোত্র

পাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য। সিদ্ধি-প্রতিবন্ধক রূপ পাপ, অর্গল (খিল) সদৃশ। সেই পাপকে দূর করে বলিয়া লক্ষণাদ্বারা এই স্তোত্রকেও অর্গল—স্তুতি বলা হয়।

মহামায়ার জয় হউক। আমরা অর্গলা—স্তোত্র আলোচনা করিয়া কি তত্ত্ব লাভ করিলাম দেখা যাউক

১। মহামায়ারই সব জীব-জগৎ—আকাশ বাতাস—অনিল অনল পঞ্চভূতাদি। তিনিই নিমিত্ত কারণ।

২। মানবের প্রার্থিত কাম্য বস্তু সকল—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ মায়ের ভাণ্ডারের জিনিষ। সেইজন্য মায়ের নিকট সমস্ত প্রার্থনা করিয়া চাহিয়া লইতে হয়। মহামায়া কল্পতরু। ভক্ত এই কল্পতরুর মূলে বসিয়া অন্তরের সহিত কাতরভাবে যে বস্তু মায়ের নিকটে চাহিবে, মা তাহাই ভক্তকে দিবেন।

৩। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবগণ মহামায়ার শ্রীচরণাশ্রিত থাকিয়া জগতের পূজনীয় হইয়াছেন। ভক্তও সেই অভয়চরণ কামনা করিলে কল্যাণের পথে যাইবে।

৪। দুর্গম সংসার-সাগর হইতে উদ্ধারের (মুক্তির) একমাত্র পথ, এই করুণাময়ী সর্ব্বশক্তিময়ী মহামায়ার শ্রীচরণ আশ্রয় করা।

ওগো ভ্রান্ত জীব! তুমি কি এই সব তত্ত্ব বুঝিবে না? তুমি কি শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া তোমার আত্মার কল্যাণের পথে যাইবে না? পূজাও আরাধনা দ্বারা তুমি কি মহামায়াকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিবে না? ওগো অবিদ্যার মোহে আচ্ছন্ন জীব! তুমি এজন্মে পথ হারাইয়া পরমাত্মা হইতে দূরে—অতি দূরে—চলিয়া যাইতেছ ইহা কি এখন শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব আলোচনার ফলে বুঝিতে পারিয়াছ? তুমি কি পরমামুক্তির কারণ মায়ের মধুর বিদ্যারূপ দেখিতে চাও? তোমার কি

মোহ কাটিয়াছে ? রূপের নেশা, ধনের নেশা, যশের নেশা, প্রতিষ্ঠার নেশা, বিষয়ের নেশা—কি তোমার কাটিয়াছে ? যদি না কাটিয়া থাকে, তবে সেই সব নেশা কাটাইবার জন্য মায়ের রক্তরাঙ্গা চরণ তুখানি স্মরণ করিয়া তোমার বিষয়ে উন্মত্ত মাথাটী সেই অভয় চরণে স্থাপন কর। সকল আর্ত্তি, সকল্ দুঃখ, জুড়াইবার জন্য, কাতরস্বরে তোমার চোখের জলে মায়ের চরণ তুখানি ধোয়াইয়া একবার প্রাণভরে, মায়ের প্রসন্ন বদন লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিতে করিতে বল—

"শরণাগতদীনার্ত্ত—পরিত্রাণ—পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি ! নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

ওগো পথহারা পথিক ! তুমি সত্যের আলোকময় পথ পাইবে। ত্রিতাপে তাপিত তোমার প্রাণ জুড়াইয়া যাইবে। কুপুত্র হইয়াও তুমি করুণাময়ী মায়ের শান্তিময় কোলে বিশ্রাম লাভ করিবে।

ওগো লক্ষ্যশূন্য অশান্ত জীব ! তুমি দেখিতে পাইবে জগন্মাতার স্নেহমাখা করুণায় ভরা দৃষ্টি—তোমারই মাতৃ-বিরোধী তুর্দ্দশাময় শোচনীয় জীবনের দিকে, স্থির হইয়া তাকাইয়া আছে। সেই আনন্দময়ীর কৃপা দৃষ্টিতে তুমি সকল নেশার ঘোর কাটাইয়া উঠিবে। তুমি অমৃতময় হইবে। মায়ের মধুর বাণী—**"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"** (হে বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ ! তোমরা আমার (মায়ের) কল্যাণকরী বাণী শোন !)—তোমার হৃদয়ে বার বার ধ্বনিত হইবে। তোমার মানব-জন্ম সার্থক হইবে। ওগো ভাগ্যবান বন্ধু ! তোমার যে করুণাময়ী মাকে এখন সর্ব্বশক্তিময়ী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছ, সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহারই পাদপদ্মে আশ্রয় নাও।

"নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়"—এ ছাড়া শান্তির (মুক্তির) অন্য পথ নাই। জগন্মাতাকে আবার প্রণাম কর :—

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥

ইতি অর্গলাস্তব—ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দেবী-মাহাত্ম্যে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

ওঁ শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব-আলোচনার ফল—

শ্রীশ্রীমহামায়ার (চণ্ডিকাদেবীর) পাদপদ্মে সমর্পিত হইল—মায়ের জয় হউক! দেবী প্রসন্ন হউন!

ওঁ তৎ সৎ। ওঁ তৎ সৎ। ওঁ তৎ সৎ।

ওঁ শান্তি ওঁ॥